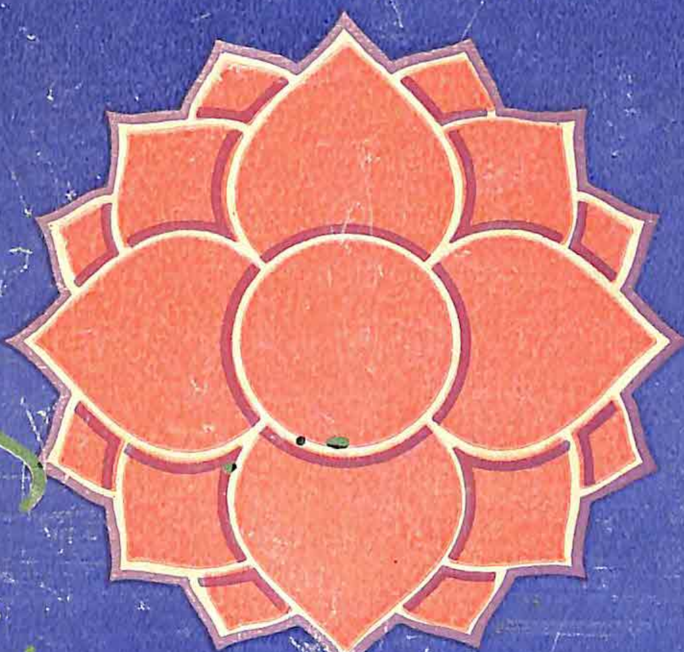
মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ



সুকুমার বসু • সুহৃদগোপাল দত্ত

অভিমত ঃ

'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত "মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ" শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধটি পাঠ করে আনন্দিত হয়েছি। শ্রীঅরবিন্দের জীবনকে নানাভাবে দেখা যায়, কিন্তু গ্রন্থকারদের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য উল্লেখযোগ্য। মূল্যবান তথ্য ও আলোকচিত্র সম্বলিত এই রচনাটি দিব্যজ্যোতিস্নাত শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও তাঁর দর্শনকে মনোজ্ঞ আলোকপাতে সুস্পষ্ট সীমায় পাঠকদের হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। রচয়িতাদের লেখার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ঘটনার সংস্থাপন এবং ভাষা। ভাবগম্ভীর বিষয়বস্তু প্রকাশের প্রয়াসে ভাষার অহেতুক জটিলতায় তাঁদের লেখনী কোথাও আড়ষ্ট হয়নি।

ডঃ শিবকুমার মিত্র,
এম্-এ, পি-এইচ-ডি (চিকাগো),
জয়েণ্ট ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ্ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং, ন্যাশনাল ইন্স্টিটিউট অফ্ এডুকেশন,
নিউ দিল্লী।

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ
সুকুমার বসু ও
সুহৃদ্‌গোপাল দত্ত
রূপা
দাম ঃ বারো টাকা

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ

আলোকতনু পুরুষোত্তম শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও সাধনা সর্বযুগের বিস্ময়। ধ্যানের অমৃত আলোকে তিনি সঞ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন বিশ্বজনের হৃদয়। তাই তিনি সর্বকালের মানুষের মনস্পতি।

শ্রীঅরবিন্দের মহিমময় জীবনের অমর ভাষ্য : 'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ'।

মনস্পতি

শ্রীঅরবিন্দ

॥ রচনা ॥

সুকুমার বসু

সুহৃদ্‌গোপাল দত্ত

॥ সম্পাদনা ॥

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা : এলাহাবাদ : বোম্বাই : দিল্লী

প্রথম সংস্করণ : এক হাজার
মাঘ, ১৩৭৯ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০১২
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-১
১২ গুক্ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই-১
৩৮৩১ পাতৌদি হাউস রোড, দিল্লী-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
গণেশ বসু

মুদ্রক :
সুকুমার মল্লিক
এ. বি. প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৬

দাম :
বারো টাকা

শ্রীঅরবিন্দের

ঘটনাবহুল বিচিত্র জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুবিতর্কিত অধ্যায়ে
যাঁরা নিঃস্ব, রিক্ত, নির্যাতিত 'অরবিন্দ ঘোষ'-কে নিঃশঙ্কচিত্তে
নির্দ্বিধায় নির্বিবাদে তাঁদের মনের সিংহাসনে
বসিয়ে অগ্রজের শ্রদ্ধা, বন্ধুর ভালবাসা
এবং নায়কের সম্মান দিয়ে
ভূষিত করেছিলেন

এবং

কোনো প্রত্যাশা না-করেই হাসিমুখে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের ভার নিয়েছিলেন—

অবিনাশ ভট্টাচার্য
অশোক নন্দী
ইন্দুভূষণ রায়
ইন্দ্র নন্দী
উপেন ব্যানার্জি
উল্লাসকর দত্ত
কুঞ্জলাল সাহা
কৃষ্ণজীবন সান্যাল
দীনদয়াল বসু
দেবব্রত বসু
ধরণী গুপ্ত
নগেন গুপ্ত
নরেন্দ্র বক্সী
নলিনী গুপ্ত
নিখিলেশ্বর মৌলিক
নিরাপদ রায়
পরেশ মৌলিক
পূর্ণ সেন
প্রভাস দেব
বারীন্দ্র ঘোষ
বালকিষণ হরিকানে
বিজয় নাগ
বিজয় ভট্টাচার্য
বিভূতি সরকার
বীরেন্দ্র ঘোষ
বীরেন্দ্র সেন
শচীন্দ্র সেন
শিশির ঘোষ
শৈলেন্দ্র বসু
সুধীর সরকার
সুনীল সেন
হেম সেন
হেমেন্দ্র ঘোষ
হেমচন্দ্র দাস
হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল

—তাঁদের নিষ্ঠাবান জীবনের এবং কর্মের সম্মানে এই গ্রন্থটি
পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে

উৎসর্গ

করা হল।

ভূমিকা

"মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ" শীর্ষক রচনাটি ধারাবাহিকভাবে 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সময়েই নিয়মিতভাবে পড়েছি। রচয়িতা দু'জনেই আমার অপরিচিত হলেও রচনাটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময়ে পুস্তকের ভূমিকা লেখার জন্যে তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারিনি। রচনাটির মাধ্যমে রচয়িতারা খুব স্পষ্টভাবে যে বক্তব্যটি ফুটিয়ে তুলেছেন তা হল—সংক্ষেপে, শ্রীঅরবিন্দের নৈর্ব্যক্তিক মহত্ত্বের প্রতি তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা। ইতিপূর্বে "শতাব্দীর প্রণাম" শীর্ষক আমার একটি রচনায় আমি এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি—তাই নতুন কিছু না লিখলেও তারই একটি সংক্ষিপ্ত রূপ ভূমিকায় দিলাম।

জন্মাবধি শ্রীঅরবিন্দ নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন—যিনি নিজের-সম্বন্ধে-চিন্তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না এবং যাঁর ভাবনা, অনুভব ও কর্ম সবসময়েই বৃহত্তর ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত ছিল—বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিত্বকে মহত্তর শুদ্ধতর মাত্রার নৈর্ব্যক্তিকতায় তিনি তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। সীমাবদ্ধ জনৈক ব্যক্তির চেতনা তাঁর কখনও ছিল না—পারিবারিক পরিচয়, স্বদেশপ্রেমী নেতা, ইত্যাদির গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ না-থেকে তিনি বিশ্বব্যাপী মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ-চিন্তায় শেষ পর্যন্ত আত্মস্থ ছিলেন। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, প্রত্যেক ব্যাপারে ও অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ

তাঁর কর্তব্য-কর্ম করে এসেছেন নিঃস্বার্থ ও আত্মবর্জিতভাবে—একান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠায় আসীন থেকে—আজন্মযোগী, মানব-দেবতার স্বভাব ও প্রকৃতিই এই। তিনি সম্পূর্ণ গীতোক্ত ভাবের কর্মযোগী ছিলেন; তিনি সর্বদাই পদক্ষেপে সীমানা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে চলেছেন, তিনি ছিলেন বিপ্লবী—এক রকমের কালাপাহাড় প্রায়, তাঁর ভিতরের চেতনার প্রবেগ চরম পরম পরিপূর্ণ সত্যটি ছাড়া কিছুতেই তৃপ্ত হত না—তাঁর উত্তরণের প্রত্যেক ধাপ তাই ঊর্ধ্বতরের দিকে হয়েছে, অন্তর্নিহিত এক ঊর্ধ্বতমের দিকে লম্ফন দিয়ে উঠবার ক্ষেত্ররূপে।

শ্রীঅরবিন্দ যে শক্তি উদ্‌ঘাটিত করে মানুষের হাতে দিয়েছেন সেই শক্তির গাঢ়তম তীব্রতা নিরেট জড়ে প্রবেশ করে তাকে রূপান্তরের পরে প্রদীপ্ত জড়ে পরিণত করে—প্রদীপ্ত স্থূল সৌরালোকে নয়, ভাস্বর পরম আত্মার জ্যোতিতে। সেই শক্তি এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করে চলেছে—আমাদের এই প্রাচীন গোলকটিকে পুনর্গঠিত ও পুনর্বিন্যস্ত করে—দারুণ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়েই যার অঙ্কে আবির্ভূত হবে সুবর্ণ যুগের পৃথিবী।

নৈর্ব্যক্তিকতা লাভের আসল পদ্ধতি হল ব্যক্তিত্বের পুনর্গঠন বা ব্যক্তির দিব্যতা অর্জন—ব্যক্তিগত ভগবানের মধ্যে নিজেকে ভগবতী করে তোলার পরে চতুর্দিকের আধার বা ক্ষেত্রটিও ভাগবত-সৌধে রূপান্তরিত করা—যা প্রমূর্ত করেছেন শ্রীঅরবিন্দ নিজের চেতনায় তথা বিশ্বচেতনায়ও। নৈর্ব্যক্তিকতা লাভের পরিণতি হল দিব্যতা লাভ—ঊর্ধ্ব থেকে পরম-ব্যক্তির, ভগবানের অবতরণ অথবা অন্তরে ভগবানের আবির্ভাব। যিনি নামিয়ে আনতে পারেন বা অন্তরে ভগবানের আবির্ভাব ঘটাবার পর যিনি সশরীরে তাকে ধারণ করেন তিনি অবতার; তিনি জ্যোতির্ময় মূর্তিতে ভাস্বর, তাঁর আধার সেই পরম সদ্‌বস্তুর আধারে পরিণত হয়, এই ভাবে পরম সদ্‌বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তিনি অভিন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন। শ্রীঅরবিন্দের চেতনার প্রভাবে সংসিদ্ধাভিমুখী বিশ্বে যে কাজটি চলেছে তার চূড়ান্ত

পরিণতিতে 'চিন্ময় পুরুষ' মানুষী লীলায় যোগ দেবে—ফলে এই পার্থিব জীবন হয়ে উঠবে দিব্য জীবন।

শ্রীঅরবিন্দের চেতনার তাৎপর্য প্রকৃতি এবং চূড়ান্ত পরিণতি সম্ভব করে তোলবার জন্যে তিনি আছেন এবং থাকবেন মনস্পতি-রূপে। সেদিক থেকে রচনাটির নামকরণ উপযুক্ত হয়েছে। লেখকদের ধন্যবাদার্হ প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রম যথাযোগ্য সমাদর পাবে—আশা করি।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী
২৯।৯।৭২

নলিনীকান্ত গুপ্ত

পুনরীক্ষণ

বর্তমান যুগে নিখিল বিশ্বে শ্রীঅরবিন্দের নাম আপন মহিমায় ঝঙ্কৃত। সেই মহিমার রূপটি কেমন? ঠিক যেমনটি ব্যক্ত হয়েছে খৃষ্টধর্মের অন্যতম ঋত্বিক শোলোমনের বাণীতে—"A good name is a precious ointment, which grows in efficacy in a decaying world with time".। প্রায় দু'বছর আগে ক্যালি-ফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর বার্নড মলেনহুয়ার প্রসঙ্গত আমাকে লিখেছিলেন—"Yes we highly adore great Indian Seers like Swami Vivekananda or Sri Aurobindo—and are proud of them as prophets of humanity. You will be glad to know that in our highly turbulent and almost unruly modern student community just—a mere utterance, incidentally, of their hallowed names creates some magical effect, indeed, in restoring instantaneous calm and unruffled serenity—of a 'pin-drop silence' category, as it were—before we could think, over an academic make-shift, to start on a lecture scheduled on a topic... ..."।

ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যরূপে আমি লক্ষ্য করেছি যে অধিকাংশের চিন্তায় যোগ-সাধনার লক্ষ্য হল 'আধি' ও 'ব্যাধি' থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া—কিন্তু বলা বাহুল্য

যে 'যোগের' উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত স্বার্থ, বৈষয়িক সমৃদ্ধি, ইত্যাদিতে কেন্দ্রীভূত নয়। শ্রীঅরবিন্দের 'পূর্ণযোগ' সম্পর্কীয় আলোচনা থেকে যোগের সম্পাদ্য কি, সে সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা করা সম্ভব। এই মহাযোগীর বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়েছে কঠোপনিষদের সেই গুহ্যতত্ত্ব—"আশ্চর্যোবক্তা কুশলোঽস্যলব্ধাশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্ঠঃ।" (২।৪)। বিভিন্ন আলাপ-আলোচনার সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মনীষী ও জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিদের মতে, শ্রীঅরবিন্দের অতিমানস (supramental) সম্পর্কীয় উপলব্ধি Nietzche-র Superman তত্ত্বটির মতই জগৎ-ব্রহ্মবাদের আলোকে দীপ্ত। উভয়ের চিন্তায় জগতের স্রষ্টারূপেই অতিমানসের পরিচয় এবং উভয়েই দিব্য-জীবন এবং দৈবীগুণসম্পন্ন মানসে রূপান্তরণ ক্রিয়ার সমর্থক। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত Para-Psychologist ডক্টর গুস্টভ স্ট্রোমবার্গ আমাকে এক পত্রে লিখেছিলেন, "We of the Western mind are too poor to delve deep into the miracle of Cosmic Mind."। তাঁরা তাই শ্রীঅরবিন্দকে এই নবযুগের এক অবতারস্বরূপে তথা সাক্ষাৎ 'মনস্পতিরূপে' ভক্তি করতেন বা করেন। তাই আজ বিশ্বের সর্বত্রই দেখি, পণ্ডিচেরীর কথা উঠলেই—বিশ্বমানব-কল্যাণ, শান্তি ও ঐক্য স্থাপনের এই ভারতীয় পীঠস্থানের প্রতি—সকলেই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করেন।

বিষ্ণুপুরাণে এই ভারতভূমি (সত্য, জ্ঞান, ধর্ম ও স্বর্গের প্রতীকরূপে কল্পিত) প্রসঙ্গে ঋষি ব্যাসদেব লিখেছিলেন—"ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যাশ্চান্তশ্চ গম্যতে"। কারণ যুগে যুগে যখন অধর্মের গ্লানি বৃদ্ধি পায় তখনই অবতাররূপী 'নারায়ণ' মানুষকে অশেষ দুঃখ হতে পরিত্রাণ করবার জন্য এই মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হন।—এই "ভারতের মহামানবের সাগরতীরে"—আশা করি, তাই কাল পরম্পরায় বিশ্ববন্দিত মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দের সাধনা-প্রদীপ্ত জীবন-দর্শনের সমূহ তপস্যা, তিতিক্ষা, সত্য ও অমৃতময় বাণীগুলি ঘরে ঘরে অক্ষয় বনস্পতিরূপে বিরাজ করে ও ফলপ্রসূ

হয়ে আমাদের সনাতন এই আর্যভূমিকে আবার তপোবনের অম্লান শুচি-স্নিগ্ধ শান্তি, স্বস্তি, নিষ্ঠা, শ্রী ও হ্রী প্রদান করবে—উদাত্ত কণ্ঠে উদ্‌গীত হবে, "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ……" এবং সেই সঙ্গে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাই এই যুগের অবতাররূপী সেই মহামানবের বন্দনা ও প্রশস্তি করবে মহাভারত মহাকাব্যের উদ্ধৃতিতে : "স দান্তঃ স মৃদুঃ শূরঃ স সত্য সংযতেন্দ্রিয়"—জয়তু, জয়তু, মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ।

তাঁর সঙ্কল্পরশ্মি বিশ্বের চিন্তানায়কদের মনে নতুন চিন্তাধারা সৃষ্টি করেছে—যার আদ্যে ও অন্তে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে জাতীয় অধ্যাত্মবাদ। তাঁর গায়ত্রীমন্ত্র—"তৎ সবিতুর্বরং রূপ জ্যোতিঃ পরস্যধীমহী"—বেদ উপনিষদের নিহিত সত্য উপলব্ধির সত্তাটিকে সম্যক্ প্রকট করেছে। মহান্ যাজ্ঞবল্ক্য সদৃশ এই মহাপুরুষ সেই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে বিংশ শতাব্দীর চণ্ডমুণ্ডসদৃশ, যান্ত্রিক-দানব স্পর্ধিত, সভ্যতাভিমানীদের সমগ্র আস্ফালনকে স্তব্ধ করে মহামুক্তির, মহাশক্তির শাশ্বত মহানন্দের অব্যর্থ অমোঘ বাণীটি নিখিল বিশ্বে নবরূপে উদ্‌গীত করেছেন : চরৈবেতি। চরৈবেতি। চরৈবেতি।

আমার ছাত্রজীবনে ১৯১৯-২০ সালে মাদ্রাজের নটেশম্ প্রকাশ সংস্থার Indian Nation Builders গ্রন্থগুলি পাঠ করেই শ্রীঅরবিন্দের মনীষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সেই আকর্ষণ পরবর্তীকালে এক আশ্চর্য শ্রদ্ধায় পরিণত হয়ে গেছে। তাই তাঁর মহিমা সম্পর্কিত রচনা "মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ" সম্পর্কে পুনরীক্ষণ লেখার অনুরোধে সানন্দে সাড়া না-দিয়ে থাকতে পারিনি। লেখকদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না হলেও আজ তাঁরা উভয়েই আমার পরম স্নেহভাজন। শ্রীবসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন অধ্যাপক এবং শ্রীদত্ত কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ এ্যাড্‌ভোকেট। লেখকদের ভাব ও ব্যঞ্জনাশক্তির প্রতিভা ও সাবলীল লিখন-ভঙ্গীতে সমগ্র রচনাটি অনবদ্য ও প্রাণবন্ত। রচনার বিষয়বস্তুগুলি ক্রমিকভাবে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় প্রণিধানের পক্ষে সহজ হয়েছে।

বিখ্যাত Alipore Bomb Trial সম্পর্কিত লুপ্তপ্রায় তথ্যগুলির ধারাবাহিক বর্ণনা বাঙলা ভাষায় প্রথম পরিবেশন করায় লেখকেরা বিশেষ প্রশংসার অধিকারী হয়েছেন। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে আশাকরি রচনাটি আগ্রহী পাঠকদের কাছে নিঃসন্দেহে সমাদৃত হবে।

মিশ্র লজ
বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি
২রা অগস্ট, ১৯৭২

ভবেশচন্দ্র চৌধুরী
প্রতিষ্ঠাতা,
বিশ্বজ্ঞানসাধক সোসাইটি।

বিঃ দ্রঃ দর্শনাচার্য ডক্টর ভবেশচন্দ্র চৌধুরী, পি-এইচ-ডি, ডি-লিট্, এফ-আর-এ-এস (লণ্ডন), ডক্টর লেট্রাস্ (বার্সিলোনা), ডক্টর অফ ডিভিনিটি (টোরোণ্টো)—দেশে ও বিদেশে একজন বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারততত্ত্ববিদরূপে পরিচিত। বিশ্বের বিভিন্ন জ্ঞানপীঠ এবং মনীষী-সংস্থা তাঁকে বিভিন্নভাবে আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত করেছেন। The Dictionary of International Biography (London) এবং The National Register of Prominent Americans And International Notables (Florida) গ্রন্থে আচার্য চৌধুরীকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-সাধকরূপে বিবৃত করা হয়েছে। তিনি কানাডার Northern-University College-এর অন্যতম আচার্য। প্যারিস থেকে ১৯৬৭ সালে আচার্য চৌধুরীকে Grand Prix De Humanitaire De France পদকে সম্মানিত করা হয়। এই জ্ঞান-তপস্বী বর্তমানে স্বীয় আশ্রমে জ্ঞান সাধনায় নিয়ত মগ্ন রয়েছেন।

সূচীপত্র

॥ আবির্ভাব ॥

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

—গীতা-১০।৪১

উনবিংশ শতাব্দীর অপরাহ্ণ : বিষয়মদমত্ত বিদেশী শক্তির কবলিত ভারতবাসীর চিন্তাধারায় অধ্যাত্মবাদের দুর্ভিক্ষ আসন্ন। দাসত্বের শৃঙ্খলে ভারতীয় ঐতিহ্যের ধ্বংস আগতপ্রায়। ভারতীয়দের চেতনায় জাতীয়তাবাদের প্রভাব বিলুপ্তির পথে। ভারতের দেবতাত্মা অসুরশক্তির কবলিত। যে দেশের সভ্যতার বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির প্রতিষ্ঠাকল্পে ; যে দেশের সকল বিদ্যার মূল পরা-বিদ্যা, সেই দেশের স্বধর্ম বিপন্ন এবং সভ্যতায় সঙ্কট প্রত্যক্ষ হওয়ায় দৈবী-শক্তি বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। ভারতের কল্যাণে, দেশের আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হোলো ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী : "অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং"। ভারতের স্বধর্ম বিপন্ন কিন্তু ভারতের পুনরভ্যুত্থান বিধিলিপি। সুতরাং দৈবী-শক্তির আবির্ভাব প্রয়োজন।

১৮৭২ সাল। ভারতের ভোরের আকাশে উদয় হোলো এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বাংলার মাটিতে দৈবী-শক্তি রূপ পরিগ্রহ করলেন। আবির্ভূত হলেন শ্রীঅরবিন্দ।

* * *

ঋষি রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র এবং কোন্নগরের প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশের প্রথিতযশা চিকিৎসক কৃষ্ণধন ঘোষের তৃতীয়পুত্র অরবিন্দ ১৮৭২ সালের ১৫ই অগস্ট (ভোরবেলা, সাড়েচার ঘটিকায়) কলিকাতায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। উষাকালে ভূমিষ্ঠ নবজাতকের মধ্যে উষার দিব্য-প্রকৃতি উত্তরকালে সুপরিস্ফুট হয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের প্রথম ছয়টি বছর কেটেছিল জননী স্বর্ণলতা দেবী এবং জন্মভূমি বাংলা মায়ের স্নেহ-যত্নে। জীবনের শুরুতে তিনি যে পারিবারিক আবহাওয়ায় লালিত-পালিত হয়েছিলেন তার উপর স্বদেশপ্রেম, জাতীয় ঐতিহ্য এবং অধ্যাত্মবাদের প্রতি শ্রদ্ধা যতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছিল, তারই প্রায় সমতুল প্রভাব ছিল স্বাধীন ইংরাজ জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির এবং প্রগতির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনের। মাতামহ ঋষি রাজনারায়ণ বসু ছিলেন জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ ও দার্শনিক, এবং পিতা কৃষ্ণধন ছিলেন ইউরোপীয় শিক্ষা, দীক্ষা, এবং সভ্যতার বিশেষ গুণ-গ্রাহী। শ্রীঅরবিন্দের পারিবারিক আবহাওয়ায় অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদ আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সহাবস্থান করতো—বিরোধী হিসাবে নয়, বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী হিসাবে। শ্রীঅরবিন্দের উত্তরকালের চিন্তায় বস্তুবাদ যেমন অবহেলিত হয়নি, যোগ্য সমাদর পেয়েছে; তেমনি অধ্যাত্মবাদ জীবনের চরম তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনিই বলেছেন, "We shall preserve the truths of material science and its real utilities in the final harmony."। (১)

পিতার একান্ত ইচ্ছার অনুগামী শ্রীঅরবিন্দ তাঁর জননী, জন্মভূমি, এবং প্রিয়জনদের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সুদূর ম্যান্‌চেস্টার শহরে ড্রুয়েট দম্পতির স্নেহনীড়ে অবস্থান করতে লাগলেন। ঐখানেই শুরু হয়েছিল তাঁর গুরুগৃহ জীবনের প্রথম পর্ব। প্রারম্ভিক পাঠে তাঁর শিক্ষার বিষয়বস্তু ছিল ল্যাটিন ভাষা অর্থাৎ পাশ্চাত্যের অন্যতম দেবভাষা। এইভাবে পাঁচটি বছর অধ্যাপক ড্রুয়েট সাহেবের তত্ত্বাবধানে ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার

সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হোলে শ্রীঅরবিন্দ লণ্ডনের বিখ্যাত সেণ্ট্ পল্স বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। ছাত্র অরবিন্দের প্রতিভার উন্মেষের অনুকূলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডক্টর ওয়াকার সাহেবের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছাত্রাবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ স্বীয় প্রতিভাবলে ইউরোপের প্রায় প্রতিটি সম্পন্ন সাহিত্যে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের পাণ্ডিত্যকে মূলধন করে শ্রীঅরবিন্দ বাস্তব-সুখান্বেষী ইউরোপবাসীদের সভ্যতা, দর্শন, ইতিহাস, মহাকাব্য এবং সংস্কৃতির সার বস্তুটির অন্বেষণে ক্রমেই নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। এই অন্বেষণের সময়ে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন কেম্ব্রিজের কিংস্ কলেজের ছাত্র। কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন কালে তিনি দুরূহ ট্রাইপস্ এবং আই. সি. এস্. পরীক্ষার জন্যে একই সঙ্গে পড়াশুনা করেছিলেন; তাছাড়া তাঁর অবসর সময় কাটতো ভারতীয় ছাত্রদের ভারতের স্বাধীনতার সম্পার্কে উদ্‌বুদ্ধ করায় এবং কাব্য রচনায়। এই সময়ে দাদাভাই নৌরজীর মধ্যপন্থী নীতির বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে 'Lotus and Dagger' নামে যে গুপ্তসমিতি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, শ্রীঅরবিন্দ তার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ছাত্রজীবনের প্রতিটি পর্যায়েই প্রতিভার দ্যুতিতে স্বীয় অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর শিক্ষকদের মতে তিনি ছিলেন দুর্লভ চরিত্র। শ্রীঅরবিন্দ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার অশ্বারোহণ-বিদ্যার যোগ্যতা-যাচাইকালে ইচ্ছাকৃতভাবে বারবার অনুপস্থিত হয়ে ঐ বিষয়ে অনুত্তীর্ণ থেকে গেলেন। কারণ, উত্তীর্ণ হলেই তাঁকে বিদেশী শাসকের দাসত্ব করতে হোতো। দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর প্রবাসে কৃচ্ছ্রসাধন এবং অধ্যয়নের পর ব্রহ্মজ্ঞান-স্নাতক শ্রীঅরবিন্দ বিধি-নির্দেশে ভারতবর্ষের পথে পাড়ি দিলেন—বরোদার মহারাজার একান্ত-সচিব হিসাবে। শ্রীঅরবিন্দ ইউরোপে গিয়েছিলেন বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর ঐশ্বর্য, সামর্থ্য এবং মনস্তত্ত্ব জানতে এবং বুঝতে। ঈপ্সিত বস্তু যে সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়েছে তা তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে অনুভব করেছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তেই ইউরোপ ত্যাগ করেছিলেন, কারণ ওখানকার মাটির প্রতি তাঁর মনের কোনো টান ছিল না। ইউরোপের প্রবাস জীবনে তিনি অক্লান্ত অনুসন্ধান করে আত্মোপলব্ধির দিশা পেয়েছিলেন। মানবজীবনের উর্ধ্বগতির চেতনা বা বহুকালের প্রচলিত গতি থেকে বিপরীতমুখী গতি (বি-প্লু-ব)* সম্বন্ধে সচেতনতা বিংশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম শ্রীঅরবিন্দের উপলব্ধিতে পরিস্ফুট হয়েছিল। এই উত্তরণের দীক্ষায় বিশ্ববাসীকে দীক্ষিত করবার উদ্দেশ্যেই শ্রীঅরবিন্দের বিধি-নির্দেশিত অবতরণ। এই বিপরীতমুখী গতিপথের যাত্রার প্রস্তুতি সমাপ্ত হয়েছিল ইউরোপের প্রবাস জীবনে। সেই অনুভূতি বা উপলব্ধি নিয়ে বরোদার মহারাজার অধীনে উপজীবিকাকে উপলক্ষ করে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত মাতৃভূমির কোলে এসে পৌঁছলেন আত্মপ্রকাশ করবার জন্য—বিংশ শতাব্দীর সর্বপ্রথম 'বিজ্ঞানময় পুরুষ'* রূপে—তৎকালীন নিমজ্জমান সনাতন জাতীয়তাবাদের পুনরভ্যুত্থান প্রকল্পের পথিকৃৎ হয়ে। শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্রগুলি সংযম, সংধারণ* এবং উর্ধ্বগতির পথ পরিক্রমার কঠোর সংগ্রাম কৌশলের ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর বাণী এবং লেখনী অতি শক্তিশালী তমোনাশক বিস্ফোরক পদার্থের সমতুল ছিল। যেগুলির মধ্যে তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠী তাঁদের শাসক জীবনের অকাল মৃত্যুর আভাস পেয়েছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর সনাতন আর্যধর্মের সংধারণ ও সংরক্ষণ যজ্ঞের মহাযাজ্ঞিকরূপে তিনি তাঁর কাজ আরম্ভ করেছিলেন লোকচক্ষুর অগোচরে, নীরবে এবং একান্ত নিজস্ব পদ্ধতিতে। কারণ, তাঁরই কথায়—

"আমরা ধর্মভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট ধর্মসঙ্কর ও ভ্রান্তিসঙ্কুল তামসিক মোহে পড়িয়া আর্য-শিক্ষা ও নীতি-হারা। আমরা আর্যজাতি হইয়া শূদ্রত্ব ও শূদ্রধর্মরূপ দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়া জগতে হেয়,

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

প্রবল-পদদলিত ও দুঃখ পরম্পরা প্রপীড়িত হইয়াছি। অতএব যদি বাঁচিতে হয়, যদি অনন্ত নরক হইতে মুক্ত হইবার লেশমাত্র অভিলাষ থাকে, জাতির রক্ষা আমাদের প্রথম কর্তব্য। জাতির রক্ষার উপায় আর্য চরিত্রের পুনর্গঠন। যাহাতে জননী জন্মভূমির ভাবীসন্তান জ্ঞানী, সত্যনিষ্ঠ, মানব-প্রেমপূর্ণ, ভ্রাতৃভাবের ভাবুক, সাহসী, শক্তিমান ও বিনীত হয়।" (২)।

এই প্রসঙ্গে তিনি যে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন তা আমরা জানতে পারি তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে লেখা একটি চিঠি থেকে—"আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে ব্রহ্ম তেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটি অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল। ···কার্য সিদ্ধি···হইবে নিশ্চয়ই।" (৩)।

ইউরোপ ত্যাগ করবার পর প্রায় বারো বছর শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় অতিবাহিত করেন। বরোদায় এক যুগ ধরে তিনি প্রাচ্য-বিদ্যা আয়ত্তে আনবার সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। এই সাধনায় তিনি ছিলেন একক এবং অতন্দ্র অধ্যয়নশীল। বরোদা-জীবনের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে এসেছিলেন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীদীনেন্দ্রনাথ রায়, বাংলাভাষা শিক্ষার শিক্ষক হিসাবে। তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দকে "ব্রহ্মচর্য-নিরত পরদুঃখকাতর আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য কিছু মনে হইত না; যেন জ্ঞান সঞ্চয়ই তাঁহার জীবনের ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কর্মকোলাহল মুখরিত সংসারে থাকিয়াও যেন তিনি কঠোর তপস্যায় মগ্ন।···কোনো রিপুকেই তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখা যাইত না।

বিস্তর সাধনা ভিন্ন মানুষ এরূপ আত্মজয়ী ও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না।...শ্রীঅরবিন্দের পাঠাগারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য, দর্শন, ও ইতিহাস বিষয়ক পুস্তকের অপূর্ব সংগ্রহগুলির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন সমাদৃত পুস্তকগুলি সুরক্ষিত ছিল।"(৪)।

মহাযোগী ভাস্করস্বামী লেলের নিকট যোগদীক্ষা গ্রহণ শ্রীঅরবিন্দের বরোদা-জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অনুমান করা যায়, বিংশ শতাব্দীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভগবদ্গীতা-ভাষ্যকার তিলকের সঙ্গেও লেলের নিগূঢ় যোগসূত্র ছিল। শ্রীঅরবিন্দের গীতার ভাষ্যেও মহামান্য তিলকের ভাবধারার আভাস সুস্পষ্ট। শ্রীঅরবিন্দ ও আচার্য তিলক এই দুই মহানায়কের বন্ধুত্বের কল্যাণেই মহারাষ্ট্রে এক অধ্যাত্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচারিত হয়েছিল। উভয়ের জীবনেই যোগদীক্ষার অব্যবহিত পরে কারাজীবন এবং কারাগারে অন্তরীণ থাকবার সময়েই কর্মযোগরহস্যের উপলব্ধি কোন এক অজ্ঞাত অথচ অমোঘ বিধানের পরিচায়ক। শ্রীঅরবিন্দ যে সময়ে পণ্ডিচেরীর অজ্ঞাতবাসে ভারতীয়-দের বেদ এবং পতঞ্জলির যোগসূত্রের দীক্ষায় দীক্ষিত করবার কাজে নিয়োজিত ছিলেন ঠিক সেই সময়েই অর্থাৎ ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে তিলক মান্দালয় জেলের নির্জন কক্ষে বসে তাঁর গীতারহস্য বা কর্মযোগ-শাস্ত্র গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। উভয়েই উভয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় আহমেদাবাদ কংগ্রেসে কোন একটি নীতি আলোচনার মাধ্যমে। এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের মুহূর্ত থেকেই উভয়ের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

বরোদায় থাকাকালীন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ভূপাল চন্দ্র বসুর কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর বিবাহ হয়। শ্রীঅরবিন্দের দাম্পত্য জীবনে তিনি পদক্ষেপ করেছিলেন কিন্তু প্রবেশ করেননি। দাম্পত্য জীবনের শুরুতেই তিনি মৃণালিনী দেবীকে তাঁর উৎসর্গীকৃত জীবনের আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন—"যাহার

ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়।…আমাকে পাগলই বুঝিবে।…পাগলকে বিবাহ করিয়াছ—সে তোমার পূর্বজন্মার্জিত কর্মদোষের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল, সে কি-রকম বন্দোবস্ত হইবে?…পাগলের উপযুক্ত পাগলী হইবার চেষ্টা করিবে।…আমার তিনটি পাগলামী আছে। প্রথম পাগলামী, …কেবল সামান্য লোকের মত খাইয়া পরিয়া যাহা সত্যি সত্যি দরকার তাহাই কিনিয়া আর সব ভগবানকে দিব, এই আমার ইচ্ছা, তুমি মত দিলেই, ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলেই আমার অভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পারে। দ্বিতীয় পাগলামী…যে কোন মতে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে হইবে। পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি।…এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিবে না, কারণ তোমার অত জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিতে কোন বাধা নাই, সেই পথে সিদ্ধি সকলের হইতে পারে।…তৃতীয় পাগলামী এই যে, অন্য লোক স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলো মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।…আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল।…কার্যসিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই।…আমার সঙ্গে এস, জগতে ভগবানের কাজ করিতে আসিয়াছি, সেই কাজ আরম্ভ করি।… ভগবানকে ধ্যান করিতে হয়…তাঁর কাছে সর্বদা এই প্রার্থনা করিতে হয়, আমি যেন স্বামীর জীবন, উদ্দেশ্য ও ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে ব্যাঘাত না করিয়া সর্বদা সহায় হই সাধনভূত হই।"(৫)।

সুদূর বরোদায় বসে শ্রীঅরবিন্দ একটি পবিত্র যজ্ঞানলের হোতা

হিসাবে বাংলার মাটিতে যজ্ঞবেদী নির্মাণের আশায় অতন্দ্র অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, বাংলার মাটিতে, জলে, হাওয়ায় স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবেই ; এবং অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বাঙালীর সংগ্রামে অগ্নিশিখা জ্বালাবার নিমিত্ত কারণ হিসাবে তাঁকেই স্ফুলিঙ্গের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। তৎকালীন স্বাধীনতাকামী তরুণদের দীক্ষা দেওয়ার সভায় রাজনারায়ণ বসু (শ্রীঅরবিন্দের দাদামহাশয়) ঋত্বিকের ভূমিকা গ্রহণ করতেন। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন ঃ "ঠনঠনিয়া অঞ্চলে যে পোড়ো বাড়ির অন্ধকার ঘরে সভা বসতো সেই ঘরে একটা টেবিলের উপর একটা মড়ার মাথা থাকতো। তার দুই চোখের গর্তে দুটি মোমবাতি জ্বলতো। সভার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর ঋত্বিক ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। স্বাধীনতাকামী তরুণদের এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য করা হোতো। ঋত্বিক লাল চেলি পরে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তাঁর সামনে একটা শপথ বাক্যের নীচে সভ্যপদ-প্রার্থীকে স্বাক্ষর করতে হোতো—বুক-চেরা রক্ত দিয়ে।"(৬)।

ভগিনী নিবেদিতার অনুরোধে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠালেন বাংলায়, গুপ্ত সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। তাঁর পরিকল্পনা ছিল ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠা করা।···নেতৃত্ব পড়ল শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীমতী সরলা দেবী ও শ্রীপ্রমথনাথ মিত্রের উপর। সহযোগী হিসাবে এগিয়ে এলেন রাজা সুবোধ মল্লিক, সর্বশ্রী শশিভূষণ রায়চৌধুরী, মন্মথ মিত্র, হীরালাল রায়, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

১৯০০ সালে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ১৯০২ সালে বারীণ ঘোষ বরোদায় গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের নিকট থেকে যে জ্বলন্ত অঙ্গার বাংলা দেশে এনেছিলেন, ১৯০৫ সালের বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর দূরভিসন্ধিমূলক প্রচেষ্টার ঘূর্ণাবর্তে সেই জ্বলন্ত অঙ্গার সংগ্রামের দাবাগ্নিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। ১৯০৫ সালের ১৫ই অক্টোবর রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পালিত হোলো রাখিবন্ধন উৎসব। দেশবাসীর

মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হোলো। ১৯০৬ সালের অগস্ট মাসে ফেডারেশন হলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। ইতিমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পাঁচ লক্ষ টাকা এবং রাজা সুবোধ মল্লিক এক লক্ষ টাকা দান করলেন—ফলে যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সংস্থার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হোলো। এই সংস্থাধীন কলেজের অধ্যক্ষরূপে শ্রীঅরবিন্দ আমন্ত্রিত হলেন। বরোদার সাধন-পীঠে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দেশ-মাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে উৎসর্গ করবার মানসে শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৬ সালে বরোদার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে জাতীয় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষরূপে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসর ধরে জন্মভূমির সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের বাহ্য যোগসূত্র খুব অল্পই ছিল কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের দেহ-মন দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে উৎসর্গীকৃত ছিল।

॥ নৈষ্কর্ম্য এবং লোকসংগ্রহ ॥

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥

গীতা—৩।২০

মানুষকে অসৎ পথ থেকে নিবৃত্ত করা এবং সৎ পথে বা স্বধর্মে প্রবৃত্ত করাই লোকসংগ্রহ। লোকসংগ্রহের অধিকার একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিই প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। নিজ কর্মের দ্বারা লোকসংগ্রহ জ্ঞানী ব্যক্তির অবশ্য করণীয়। এই কর্তব্যকর্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে করা হলে তা অধ্যাত্ম-সিদ্ধির সহায়ক হয়ে ওঠে। কর্মযোগী নিষ্কাম বুদ্ধিতে লোকসংগ্রহার্থে যা কিছু করেন তাই সমাজে আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়। সুতরাং ফললাভের আশা এবং মমতা সম্পর্কে বীতরাগ হয়ে বাসুদেবময় অধ্যাত্মবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম অর্পণ করে দৈব-নির্দিষ্ট যন্ত্ররূপে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও।

কর্মযোগ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের এই সার কথা অবলম্বন করে তৎকালীন দিগ্‌ভ্রান্ত দেশবাসীকে সংযত করবার মানসে তাদের মনে শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তাবাদের নতুন বীজ বপন করলেন। তিনি বললেন—"স্বদেশকে মা বলিয়া জান, ভক্তি কর, পূজা কর। মাকে উদ্ধার করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। সেই সংগ্রামের কলাকৌশল পাশ্চাত্যের আসুরিক পদ্ধতিতে গঠিত হইবে না, গঠিত হইবে দৈবীভাবসমৃদ্ধ ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে। তরবারি বা বন্দুকের ভরসায় আমাদের সংগ্রামের প্রস্তুতি হইবে না—আমাদের বল শারীরিক বল নয়, জ্ঞানের বল।" তিনি নির্ভীক ভাষায় ঘোষণা করলেন—"আমাদের জাতীয় আন্দোলনের একমাত্র

লক্ষ্য পূর্ণ-স্বরাজ। ভগবদ্‌বিশ্বাসী হইয়া ভয় দূর করিতে হইবে—অন্তর ও বাহিরের ভয়। জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম এই দুইয়ের উৎস ভগবান। দেশের জন্য নিষ্কাম আত্মদান অধ্যাত্ম-সিদ্ধির সহায়ক।"*

সত্যবান শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ, লক্ষ্য, মত ও পথ তাঁর অন্তর্লোকে ধ্রুবতারার মত স্থিরভাবে অবস্থান করতো বলে তাঁর জ্ঞানদীপ্ত পদক্ষেপে মধ্যপন্থার কোনো স্থান ছিল না। মতান্তরের সম্মুখীন হলে সংযতবাক্ থেকে এবং প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন না করে তিনি প্রতিপক্ষের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করে দৈব-নির্ধারিত পথে স্বীয় বিবেকের নির্দেশ মতই চলতেন। অধ্যক্ষ হিসাবে কিছুকাল কাজ করবার পর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হয়। অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি চেয়েছিলেন—সরকারী বিদ্যালয় থেকে রাজনৈতিক কারণে বহিষ্কৃত ছাত্রদেরও বিদ্যায়তনে ভর্তি করে তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদানে প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করতে। কিন্তু কয়েকজন বয়স্ক নেতা তাঁর এই নীতি অনুমোদন করলেন না। অবশেষে সাংবাদিকতাকেই তাঁর নির্ভীক, চরমপন্থী মতবাদ স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করবার উপযুক্ত উপায় স্থির করে ১৯০৬-এর শেষের দিকে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দিয়ে দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদনায় মনোনিবেশ করলেন।

সনাতন আর্যধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত, নির্ভীক শ্রীঅরবিন্দ সম্পূর্ণ স্বাধীন সাংবাদিকরূপে আত্মপ্রকাশের প্রাক্কালে বিভ্রান্ত যুব সমাজের উদ্দেশ্যে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "মহান হও দেশজননীর জন্যে, ভারতমাতাকে মহৎ করবার জন্যে, যাতে করে পৃথিবীর জাতিবর্গের মধ্যে ভারতবর্ষ উন্নত শিরে দাঁড়াতে পারে—যেমন পুরাকালে ছিল, যখন সমস্ত জগৎ জ্ঞান ভিক্ষা করত ভারতের

---

* জাতীয় কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক আয়োজিত অভিনন্দন সভায় উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃত।

কাছে।" এরপর শ্রীঅরবিন্দের অগ্নিস্রাবী লেখনীতে দীপ্ত হয়ে উঠল 'বন্দেমাতরম্'।

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি দেশবাসীর কাছে আর্য-ধর্মের সুমহান আদর্শকে তুলে ধরলেন। দেশবাসীর তৎকালীন চিন্তাধারায় (রাজনীতির সংকীর্ণতায় ভরা), যে ভ্রান্ত ও ক্ষণভঙ্গুর জাতীয়তাবাদের বিষ সংক্রামিত হয়েছিল, শ্রীঅরবিন্দের লেখনীতে প্রকাশ পেল তার প্রতিষেধক চিন্তা এবং আলোচনা। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার প্রতিটি ছত্রের মাধ্যমে তিনি আর্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের আহ্বান জানালেন এবং একই সঙ্গে সমগ্র জাতির চিন্তায় এক ঊর্ধ্বমুখী গতির ইঙ্গিত দিতে থাকলেন। পরাবিদ্যার স্নাতক শ্রীঅরবিন্দের জ্যোতির্মুখী লেখনী সমগ্র দেশবাসীর মনোজগতের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়রোধে নিযুক্ত হয়েছিল। তাঁর লেখনীর প্রতিটি ছত্রে প্রচ্ছন্ন ছিল আর্য ঋষিদের উপলব্ধ সত্য—জীবন্মুক্তি*র নির্দেশ। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন পরাধীনতা মানবজীবনের অজ্ঞতা এবং আলস্যের ফল এবং স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। তিনি চেয়েছিলেন সনাতন ভারতীয় পদ্ধতিতে দেশবাসী এগিয়ে চলুক, সব প্রতিকূলতা তুচ্ছ করে, অসুর শক্তির বিরুদ্ধে দেবভাবে সমাহিত থেকে কঠোর সংগ্রাম করে সনাতন হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। তিনি রাজনৈতিক চুক্তির মাধ্যমে মুক্তি কামনা করেননি, তিনি চেয়েছিলেন প্রতিটি ভারতবাসীকে মুক্ত পুরুষে পরিণত করতে। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে, নির্ভীক ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন—ভারতের গণজাগরণের একমাত্র লক্ষ্য 'পূর্ণ স্বরাজ'—যা সনাতন হিন্দু ধর্মের চির-কালের লক্ষ্য—যে স্বারাজ্য-সিদ্ধির * বর্ণনা এবং পথনির্দেশে ঋগ্‌বেদ উপনিষদ, গীতা, সাঙ্খ্যসূত্র, ব্রহ্মসূত্র, সূত্তনিপাত, চৈতন্যচরিতামৃত মুখর। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন ব্রহ্মবিদ্যা-স্নাতক সুতরাং তাঁর কল্পনার 'পূর্ণ স্বরাজ' বা 'স্বাধীনতা' এবং উক্ত

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

অভীষ্টলাভের উদ্দেশ্যে সংগ্রামের আহ্বানকে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত স্বরাজ বা স্বাধীনতার সঙ্গে তুলনা করলে ভুল হবে।

তিনি ছিলেন ব্রহ্মবিজ্ঞানী, তাঁর লক্ষ্য ছিল জীবদ্দশায় বিজ্ঞানময় পুরুষে রূপান্তরিত হওয়া। তাঁর পথ-পরিক্রমা ছিল উত্তরণের উদ্দেশ্যে —যার মধ্যে চিন্তা-বিপ্লবের নির্দেশ ছিল কিন্তু বিদ্রোহের চিহ্নমাত্র ছিল না। তাঁর আচরণে বিদ্রোহের উষ্ণতার পরিবর্তে সংযমের স্নিগ্ধতা ছিল। তাঁর ব্যবহারে ভিক্ষা এবং অপহরণ অবাঞ্ছিত ছিল, কারণ তিনি চেয়েছিলেন—মানুষের মধ্যে সুপ্ত ক্ষমতার প্রকাশ ঘটুক, প্রতিটি মানুষ স্বীয় মহিমায় উদ্দীপিত হয়ে স্ব-প্রতিষ্ঠ হোক। তিনি বুঝেছিলেন এটাই ভারতের স্বধর্ম, সুতরাং প্রতিটি দেশবাসী এই স্বধর্মের সংরক্ষণে ব্রতী হোক। শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য ছিল এই লুপ্ত-প্রায় পরাবিদ্যার পুনরুজ্জীবন, পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং এই অভীষ্ট সিদ্ধির পথে সমস্ত বাধা অপসারণের জন্যে নিষ্কামভাবে আমৃত্যু সংগ্রাম—প্রয়োজন হলে আত্মদান। কারণ তাঁর চিন্তায় মন্ত্রের সাধনে যদি শরীর পতন হয় তবে তা ভাবী ঊর্ধ্বগতির সহায়ক হবে, সুতরাং এই আত্মদান সর্বতোভাবে কাম্য। স্থিতধী শ্রীঅরবিন্দের দেশপ্রেমের মূল কথাই "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। যে মরদেহের আধারে আশ্রয় লাভ করে মানুষ ব্রহ্মবিজ্ঞান সাধনার সুযোগ পায় সেই মরদেহের সূচনা, রূপপরিগ্রহণ এবং সংধারণের জন্য জননী এবং জন্মভূমি উভয়েই প্রধানত দায়ী। তাই মানুষ মাত্রেই জননী এবং জন্মভূমির প্রতি শ্রদ্ধাবনত হওয়া উচিত। জননী ও জন্মভূমি বিপন্ন বা ক্লিষ্ট হলে স্বধর্ম-সাধন বা ব্রহ্মবিজ্ঞান চিন্তা পর্যুদস্ত হয়। এই জন্য মানুষ মাত্রেরই জননী এবং জন্মভূমির হিতসাধনে সচেতন থাকা সবিশেষ কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' কথাটির প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কারণ মাকে বন্দনা করবার অভিপ্রায় সর্বদেশের সর্বকালের এবং সর্বমতবাদের নিকট সমাদৃত। ব্রহ্মবিদ্যা ভারতের বহু আয়াসলব্ধ সম্পদ। এইজন্য শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন সেই আয়াসলব্ধ সম্পদের পুনরুদ্ধার—তিনি চেয়েছিলেন

প্রতিটি ভারতবাসী ব্রহ্মনিষ্ঠ হোক, তারা ব্রহ্মবিজ্ঞানের পথিকৃৎ হোক বিশ্ববাসীর নিকট, কারণ প্রতিটি ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ 'স্বরাট'—পূর্ণ স্বরাজের অধিকারী, মুক্ত পুরুষ, সম্ভোগকায়,* দৈব-নির্দেশে সকল সৃষ্টির অধীশ্বর (কেবল সৃষ্টির অধিকারে বঞ্চিত)। যদি ভারতের প্রতিটি অধিবাসী ব্রহ্মজ্ঞান প্রয়াসী হয়ে ওঠে, যদি ভারতবাসীর মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হয় তবে বিশ্বের দরবারে ভারতের স্থান কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। শ্রীঅরবিন্দ এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, লোকশিক্ষার মাধ্যমে ভারতবাসীর চেতনায় বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন যাতে "ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লভে"।

১৯০৭ সালের অগস্ট মাসে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার মধ্যে আপত্তিকর মন্তব্য থাকার জন্য শ্রীঅরবিন্দ অভিযুক্ত হলেন। প্রমাণের অভাবে শ্রীঅরবিন্দ অভিযোগের হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন—সেই সঙ্গে পেলেন দেশবাসীর আন্তরিক অভিনন্দন রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি কবিতায়—

"হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোন ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোন ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি।
"...............................—সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে। তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন? তাই উঠে বাজি

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

জয়শঙ্খ তাঁর ? তোমার দক্ষিণকরে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে বিদ্ধ করি দেশের আঁধার
ধ্রুব তারকার মতো ? জয় তব জয় !...”(৭)।

বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাটির বিরুদ্ধে শ্রীবিপিন চন্দ্র পালকে সাক্ষী মানায় তিনি আদালতে উপস্থিত হন কিন্তু এই মামলায় শপথ নিতে এবং অংশ গ্রহণ করতে বিবেকগত বাধা আছে বলে ম্যাজিস্ট্রেট্‌কে জানান। তিনি সাক্ষী দিতে অস্বীকার করায় তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার ধারায় স্বতন্ত্র মামলা আনা হয়। বিপিনচন্দ্র এই মামলায় ছ'মাসের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড বরণ করেন।

ঐ সময়েই শ্রীঅরবিন্দের উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান—“আমি চাই তোমাদের মধ্যে কয়েকজন মহান হয়ে ওঠ, কিন্তু তোমাদের নিজেদের জন্যে নয়, নিজেদের অহঙ্কার তৃপ্ত করবার জন্যে নয়। মহান হও দেশজননীর জন্যে........”—দেশের দিকে-দিগন্তে ধ্বনিত হয়ে সংগঠিত করলো নবীন জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীকে। শ্রীঅরবিন্দ শুরুতে তাঁদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লাগলো। তাঁর এই ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা প্রথম স্বীকৃতি পেল ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মেদিনীপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে। যে মেদিনীপুরে শ্রীঅরবিন্দ স্বীকৃতি পেলেন, সমাদৃত হলেন সেই মেদিনীপুর সম্মেলনেই সর্বপ্রথম তাঁর বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থীরা চক্রান্ত শুরু করলেন। কিন্তু এই চক্রান্ত তাঁর গতিকে শ্লথ করতে পারেনি। কারণ তিনি জানতেন, যাঁরা পৃথিবীতে ভাগবত শান্তি নামিয়ে আনবেন তাঁদের সকলকেই এই বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করতে হবে। প্রাচীনপন্থী নেতারা শ্রীঅরবিন্দের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন।

ঈর্ষান্বিত, স্বার্থান্বেষী, মধ্যপন্থী ভারতীয় নেতারা শ্রীঅরবিন্দের সংযত ভাবকে, বেদোজ্জ্বল আদর্শকে কক্ষচ্যুত করবার মানসে তৎপর হয়ে উঠলেন। এই তৎপরতার চরম অভিব্যক্তি ঘটলো ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সুরাট কংগ্রেসে। শুরু হোলো জ্ঞানশক্তির সঙ্গে অজ্ঞান শক্তির সংগ্রাম। কিন্তু সকল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে সত্যসুন্দর শ্রীঅরবিন্দ স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়ে গেলেন অগণিত সমর্থকদের মনে। সভায় প্রলয়কাণ্ডের প্রতিচ্ছবি, কিন্তু সভামধ্যে শ্রীঅরবিন্দের উপস্থিতি ছিল শান্ত ও সমাহিত। কারণ তিনি জানতেন, "জগতকে পুনরুদ্ধার করার গুরুত্বপূর্ণ কার্য যিনি করবেন তাঁকে কঠোর সংগ্রাম করতে হবে, কারণ তিনি যে-জগৎ ও যে-মনুষ্যজাতিকে পুনরুদ্ধার করতে এসেছেন, সে-জগৎ সে-মানুষই তাঁর শত্রু হয়ে তাঁকে বাধা দেবে। এই পৃথিবী তার নিজের অজ্ঞানতার প্রেমে বিভোর, এর অন্ধকার মুক্তি-প্রদায়ী আলোককে দূরে সরিয়ে দেয় এবং যাঁর মস্তকে রাজমুকুট পরানো উচিত তাঁকে করে ক্রুশে বিদ্ধ।"(৮)।

শ্রীঅরবিন্দের অনুভূতিতে জাতীয়তাবাদ ছিল দেবজ্যোতিস্নাত, কারণ তিনি নির্দ্বিধায় ঘোষণা করতেন, "স্বয়ং ভগবানই রয়েছেন জাতীয় জাগরণের মূলে, এমন কি এই আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব করছেন প্রচ্ছন্নভাবে।" সাধারণের কাছে তাঁর এই উক্তি রহস্যাবৃত বলে মনে হলেও, এই উক্তির মাধ্যমেই কর্মযোগী শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

এর পরে শ্রীঅরবিন্দ পরিব্রাজকের মতো দেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয়তাবাদের মন্ত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। দেশের দিকে-দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল তাঁর বাণী—জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক চাল নয়—এ একটা ধর্ম, যা বিধিদত্ত। এ ধর্ম অবিনশ্বর। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র ভগবদ্‌বিশ্বাস। পরিব্রাজক শ্রীঅরবিন্দ অবশেষে কলকাতায় ফিরে এলেন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে—বাঙালীকে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ করবেন বলে। কারণ তিনি লোক-চক্ষুর অন্তরালে গিয়ে এক বৃহত্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্কল্পে সাধনার জন্যে

অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের এই নতুন পরিকল্পনাকে রূপ দিতে মহারাষ্ট্র থেকে যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলে কলকাতায় এলেন বাঙালী যুবসমাজকে কর্মযোগের দীক্ষা দিতে।

গণজাগরণের এই সন্ধিক্ষণে শ্রীঅরবিন্দ বুঝেছিলেন যে, তাঁর বাণী দেশবাসীর মধ্যে, বিশেষত যুব সমাজের মধ্যে একটু উন্মাদনা এনেছে। এই উন্মাদনা ক্ষণস্থায়ী হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ এদের সাধনালব্ধ কোনো উপলব্ধি হয়নি। এদের উন্মাদনায় আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ না থাকলে এর পরিণাম ভয়াবহ উগ্রতা—যা তাঁর পরিকল্পনা বিরোধী। শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন ইংরাজ জাতির প্রতি ঈর্ষা বা বিদ্বেষ বশে নয়—চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের বিধিনির্দিষ্ট স্বধর্ম রক্ষার প্রয়োজনে। স্বাধীনতার তাৎপর্য ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছিলেনঃ "আর্য ঋষিগণ সম্পূর্ণ ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা এবং তৎ ফলস্বরূপ অক্ষুণ্ণ আনন্দকে স্বারাজ্য বলিতেন। রাজনীতিক স্বাধীনতা স্বারাজ্যের একমাত্র অঙ্গ—তাহার দুইদিক আছে, বাহ্যিক স্বাধীনতা ও আন্তরিক স্বাধীনতা। বিদেশীয় শাসন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি বাহ্যিক স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র আন্তরিক স্বাধীনতার চরম বিকাশ।···বিদেশীর আদেশ ও বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি, স্বগৃহে প্রজার সম্পূর্ণ আধিপত্য, ইহাই আমাদের রাজনীতিক লক্ষ্য।.. পরাধীনতার প্রধান ভিত্তি জাতির স্বধর্মনাশ ও পরধর্মসেবা, যদি পরাধীন অবস্থায় স্বধর্ম রক্ষা করিতে বা পুনরুজ্জীবিত করিতে পারি, পরাধীনতার বন্ধন আপনি খসিয়া পড়িবে, ইহা অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম। অতএব কোনো জাতি যদি নিজ দোষে পরাধীনতায় পতিত হয়, অবিকল ও পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ তাহার প্রথম উদ্দেশ্য ও রাজনীতিক আদর্শ হওয়া উচিত।...যাঁহারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে সন্তুষ্ট নন, তাঁহারা নিশ্চয় রাজদ্রোহী, রাষ্ট্রবিপ্লবকারী ও সর্ববিধ রাজনীতিক কার্যে বর্জনীয়? কিন্তু সেইরূপ আশা বা আদর্শের সহিত রাজদ্রোহের কোন সম্বন্ধ নাই।···আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ চাই···আমরা ইংরাজ জাতির প্রতি বিদ্বেষে স্বরাজ চেষ্টা করিতেছি

না, দেশ রক্ষার জন্য করিতেছি। কিন্তু আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ ভিন্ন অন্য কোন আদর্শ স্বীকার করিয়া দেশবাসীকে মিথ্যা রাজনীতি ও দেশরক্ষার ভুল মার্গ প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত নহি।" (৯)।

শ্রীঅরবিন্দ পরিকল্পিত জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার যারা ধারক ও বাহক হবে তাদের মধ্যে ব্রহ্মতেজের উন্মেষের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেই মহাযোগী লেলেকে কলকাতায় আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কারণ লোকশিক্ষা দানে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত না হলেও ক্রমশ শ্রীঅরবিন্দ পরাজ্যোতির স্পর্শলাভের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং জাতীয়তাব্রতী নতুন কর্মীদের অধ্যাত্ম দীক্ষার নির্দেশনার জন্য শ্রীঅরবিন্দের অবসর মুহূর্ত প্রায় দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। "এখানে এসে লেলে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে দেখলেন যে, ধ্যান শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র সত্তায় এমনভাবে নেমে এসেছে যে, প্রচলিত পদ্ধতিতে তাঁকে ধ্যান করতে বসতেই হয় না এবং...মানুষী কোন গুরুর প্রয়োজন আর তাঁর নেই।" (১০)। যে 'তৃতীয় পাগলামী' তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান-স্নাতক করেছিল, সেই 'পাগলামী'র অমোঘ বিধানে তিনি চেতনার উর্ধ্ব থেকে উর্ধ্বস্তরে নিরবচ্ছিন্ন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছিলেন ব্রহ্ম-সাযুজ্যের* উদ্দেশ্যে। এই অবস্থায় মঞ্চে বক্তৃতার সময়ও তিনি বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে পড়তেন। বোম্বাইয়ের ন্যাশন্যাল ইউনিয়নের অনুরোধে শ্রীঅরবিন্দ যখন 'বর্তমান সঙ্কট' সম্পর্কে বক্তৃতা করতে ওঠেন, মনে তিনি বক্তব্যের কোন হদিস পাননি ঃ চিন্তাহীন সম্পূর্ণ শূন্যতার এক অবস্থায় পৌঁছেছিল মন। তিনি স্নাতক থাকবেন কেন? তখনো তাঁর মনের গোপন গুহার দরজা খুলে তাঁর পরম কাম্য 'বাসুদেব'-কে দেখা অসম্পূর্ণ রয়েছে। অসম্পূর্ণ রয়েছে তাঁর সমস্ত সত্তাকে বিজ্ঞানময়-পুরুষে* রূপান্তরণের কাজ—যা বিবর্তনের শেষ, যা না হলে তাঁর জীবনে স্বারাজ্য-সিদ্ধি আসবে না। এই উত্তরণ, উৎক্রমণ, তাঁর জীবনের বিধিলিপি। তখনো ভাবীকাল

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

অপেক্ষায় রয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিজ্ঞানময় পুরুষকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে—সুতরাং তিনি নিঃসঙ্গ ও নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানলোকে দৈব আকর্ষণেই ক্রমশঃ প্রবেশ করছিলেন। কিন্তু আরো দ্রুতগতিতে তাঁর যাওয়া প্রয়োজন—তার জন্য চাই আরো নিরবচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ জীবন, আরও দুঃখকষ্ট যন্ত্রণা যার মধ্যে থেকেও তিনি লক্ষ্যপথে অবিচল থাকবেন, যেখানে তাঁর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের পরীক্ষা নেবেন তাঁর পরম প্রিয় 'বাসুদেব'। তিনি কায়মনোবাক্যে তাঁর পরীক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজছিলেন—তিনি জানতেন তিনি পাবেনই এবং স্বয়ং 'বাসুদেব'ই তার ব্যবস্থা করবেন এই ভরসাতেই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের লোকশিক্ষায় ইতিমধ্যে দেশের যুব শক্তির ভিতরে জাতীয়তাবাদের ভাবালুতা জেগেছে। সব কিছু না-বুঝেই তারা দলে দলে আসতে শুরু করেছে শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্নকে সফল করতে, তার কারণ একটিই—শ্রীঅরবিন্দের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতি উদ্দাম আকর্ষণ।

শ্রীঅরবিন্দের এই নিরাসক্ত অবস্থায় তাঁর পরম স্নেহাস্পদ অনুজ বারীন্দ্রকুমার নেতৃত্ব নিয়েছিলেন, কিন্তু উভয়ের উপলব্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গী আপাতদৃষ্টিতে এক মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তা ছিল না। কারণ কর্মযোগ-জীবনে তখনো বারীন্দ্রকুমারের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের বারীন্দ্রকে লেখা ১৯২০ সালের পত্রোত্তরে আভাস পাওয়া যায়—"তুমি আমাকেই তোমার যোগের ভার দিতে চাও, আমিও নিতে রাজী।......যোগ পন্থাটি কি, তা পরে লিখবো; অথবা তুমি যদি এখানে এস, তখনই সেই কথা হবে। এ বিষয়ে লেখা কথার চেয়ে মুখের কথা ভাল।...আর আমার যোগটা নিয়েছিলে, যেমন বাঙালীর সাধারণ স্বভাব—জ্ঞানের দিক থেকে তেমন নয়, যেমন ভক্তির দিকে, কর্মের দিকে। জ্ঞান কিছু হয়েছে, অনেক বাকী আছে, আর ভাবুকতার কুয়াশা dissipated হয়নি—কাটেনি। তোমরা

সাত্ত্বিকতার গণ্ডি পুরামাত্রায় কাটাতে পারনি, অহং এখনো রয়েছে ; এক কথায় তার development (বিকাশ) হয়নি। আমারও কোনো তাড়াতাড়ি নেই, আমি তোমাদের নিজের স্বভাব অনুসারে develop করতে দিচ্ছি।" (১১)।

বিবর্তন পরমপুরুষের ঈক্ষার পরিণাম। বিবর্তনের পথে নানা ধরনের বিপ্লব ঘটে ঠিকই, কিন্তু এই বিপ্লবে পরমপুরুষ উদাসীন থাকেন। সেইজন্য প্রকৃতির অনেক তাণ্ডবলীলার ভয়াবহতায় সাধারণ মানুষ ভাবে ঈশ্বর করুণাময় নন, তিনি নিষ্ঠুর, তিনি স্রষ্টা নন তিনি সংহারী। আপাতদৃষ্টিতে এরূপ মনে হলেও, এই সময়টিতে পরম পুরুষ পরম নিশ্চিন্তে, উদাসীন হয়ে একটি বৃহত্তর ও মহত্তর পরিণামের দিকে জগৎ পরিচালিত করার কাজে আত্মস্থ ও সমাহিত থাকেন। সে সময় তিনি অলস নন, আপন মনেই নিরলস চিন্তায় মগ্ন।

বিবর্তনী (spiritual evolutionist) শ্রীঅরবিন্দ এষণা করে-ছিলেন মানব মনের উর্ধ্বতম ভূমিতে মানবজাতির অবস্থান। তাঁর সেই মহান চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার কাজে তিনি ক্রমশ যেমন মগ্ন হতে থাকলেন তেমনি তাঁর অনুগামী দেশবাসী এক ক্রমবর্ধমান নিষ্ঠুর নিপীড়নে জর্জরিত হয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। এই উন্মত্ত যুবসমাজের নেতৃত্ব শ্রীঅরবিন্দ দিতে পারেননি, বিধাতার বিধানে। এঁদের দেশপ্রেম অন্ধ ছিল কিন্তু ক্লেদ-যুক্ত ছিল না। এঁরা ক্রোধে দুর্বাসার মতো ক্ষত্রতেজ নিয়ে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে বিপ্লবের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করলেন—যে বিপ্লবের নায়ক ছিলেন মহাবিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার। এঁরা জ্ঞানান্ধ ছিলেন, কিন্তু এঁদের মন ছিল ফুলের মতোই পবিত্র। তাই নির্দ্বিধায় এঁরা দেশমাতাকে মুক্ত করবার জন্যে নিজেদের নিষ্পাপ জীবনকে অর্ঘ্য দেবার ব্রত নিলেন—বারীন্দ্রের নেতৃত্বে।

এই আত্মদানকারী যুবকদের ব্যক্তিমানস বর্ণনায় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'কারাকাহিনী'-তে লিখেছেন, "এই বালকগণকে দেখিয়াই

বোধ হইত যেন অন্যকালের অন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত উদারচেতা দুর্দান্ত তেজস্বী পুরুষসকল আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেই নির্ভীক সরল চাহনি, সেই তেজপূর্ণ কথা, সেই ভাবনাময় আনন্দময় হাস্য, এই ঘোর বিপদের সময়ে সেই অক্ষুণ্ণ তেজস্বিতা, মনের প্রসন্নতা, বিমর্ষতা, ভাবনা বা সন্তাপের অভাব, সেকালের তমঃক্লিষ্ট ভারতবাসীর নহে, নূতন যুগের নূতন জাতির, নূতন কর্মস্রোতের লক্ষণ। ইঁহারা যদি হত্যাকারী হন, তবে বলিতে হয় যে, হত্যার রক্তময় ছায়া তাঁহাদের স্বভাবে পড়ে নাই, ক্রূরতা, উন্মত্ততা, পাশবিক ভাব তাঁহাদের মধ্যে আদবে ছিল না। তাঁহারা ভবিষ্যতের জন্য বা মোকদ্দমার ফলের জন্য লেশমাত্র চিন্তা না করিয়া কারাবাসের দিনগুলি বালকের আমোদে, হাস্যে, ক্রীড়ায়, পড়াশুনায়, সমালোচনায় কাটাইয়াছিলেন।" (১২)।

১৯০৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মৃণালিনী দেবীকে লিখিত শ্রীঅরবিন্দের পত্রখানি পড়লে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এই সময়ে তিনি অভিমান বা ফলাশার বুদ্ধি মনে না রেখে কেবল কর্তব্য বুদ্ধিতেই 'লোকসংগ্রহ'* শুরু করছিলেন। "যেখানে ভগবান নিয়া গিয়াছেন সেইখানেই যাইতে হইল। এইবার **আমি নিজের কাজে যাই নাই,** তাঁহারই কাজে গিয়াছিলাম...এর পরে আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে ভগবান আমাকে নিয়া যাইবেন সেইখানে পুতুলের মত যাইতে হইবে, যাহা করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে। এখন এই কথার অর্থ বোঝা তোমার পক্ষে কঠিন হইবে, তবে বলা আবশ্যক নচেৎ আমার গতিবিধি তোমার আক্ষেপ ও দুঃখের হইতে পারে।...এখন আমার আর স্বাধীনতা নাই, এর পরে তোমাকে বুঝিতে হইবে যে, আমার সব কাজ আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া ভগবানের আদেশেই হইল।"(১৩)।

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

এই সময়টিতে তাঁর সর্বপ্রথম উপলব্ধি হয়েছিল যে, তাঁর রাজসিক অহঙ্কার পূর্ণ জাগ্রত সুতরাং সত্ত্ব জ্ঞানের সাহায্যে ঐ অহঙ্কারকে নির্মূল করতে হবে। "আমি কর্ম করিতেছি, আমি বলবান...এই সকল ভাব রজঃপ্রধান, কর্মপ্রধান, প্রবৃত্তি-জনক"; এই রাজসিক অহঙ্কারের হাত থেকে মুক্তির উপায় জ্ঞান, শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিকাশ। যার ফলে মনে হবে—'আমি' নাই, সবই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের বিদ্যা-অবিদ্যাময়ী শক্তির লীলা। এতদিন তিনি 'প্রবৃত্তকর্ম'* করে চলেছিলেন কিন্তু এর দ্বারা তাঁর অভিষ্ট লাভ হবে না। তাঁকে "জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্ম বা নিবৃত্ত কর্ম" করতে হবে। তাঁর ইন্দ্রিয় নিগ্রহের প্রয়োজন; প্রয়োজন "সর্বভূতে একই আত্মা" অনুভব করা, দেখা। "সর্বঘটে নারায়ণ" এই মূল সত্য উপলব্ধি করবার চেষ্টায় তিনি উন্মুখ হয়ে উঠলেন। "বৃক্ষে, গৃহে, প্রাচীরে, মনুষ্যে, পশুতে, পক্ষীতে, ধাতুতে, মৃত্তিকায় সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম মনে মনে এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক সর্বভূতে সেই উপলব্ধি" (১৪) আরোপ করবার উপযোগী একটি যোগাশ্রম পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর পরমপ্রিয় 'বাসুদেব'-এর কাছে কাতর প্রার্থনা জানালেন। সুযোগ আর আসে না। শবরীর মত অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ। দেখতে দেখতে ১৯০৭ সালের হেমন্ত বিদায় নিলে। আগমনীর পদধ্বনি মিলিয়ে গেল শীতের অবাঞ্ছিত পদশব্দে।

বিধাতার বিচিত্র বিধানে এই সময়টিতে বাংলাদেশের মাটিতে একই সঙ্গে শুরু হয়েছিল 'আধ্যাত্মিক' ও 'রাজনীতিক' স্বাধীনতার কঠোর সংগ্রাম। একদিকে ব্রহ্মতাপস শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মচিন্তায় বিভোর, অপরদিকে ক্ষত্র-তেজোদীপ্ত বারীন্দ্রকুমারের অনুগামী বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলার অগণিত ব্রতী-যুবক পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে বিদেশী-শক্তি অপসারণের দাবিতে মুখর, স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মদান কামনায় উন্মুখ।

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

‘যোগাশ্রমের’ একটি বছর

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহ ঃ॥

—গীতা-৬।১০

“অনেক দিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলাম ; জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে, প্রভুভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কর্মে আসক্তি, অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহা পারি নাই। শেষে পরম দয়ালু সর্বমঙ্গলময় শ্রীহরি সেই সকল শত্রুকে এক কোপে নিহত করিয়া তাহার সুবিধা করিলেন, যোগাশ্রম দেখাইলেন, স্বয়ং গুরুরূপে, সখারূপে, সেই ক্ষুদ্র সাধন কুঠিরে অবস্থান করিলেন। সেই আশ্রম ইংরাজ কারাগার।…বৃটিশ গবর্নমেণ্টের কোপ-দৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পাইলাম।” (১৫)।

ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীঅরবিন্দের দ্বিজত্বে প্রয়োজন দৈব-নির্দিষ্ট ছিল। ১৮৭২ সালের ১৫ই অগস্ট ভোর বেলায় দৈব-নির্দেশে বাংলার মাটিতে যে মহাপ্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল, সেই প্রাণের উত্তরণোম্মুখ আকুতি,—ব্রহ্ম-সাযুজ্যের দৈব-নির্ঘণ্ট অনুযায়ী—ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সহনশীলতা পরীক্ষার একটি উপযুক্ত পরিবেশে প্রবেশ করার সুযোগ এনে দিল—১৯০৮ সালের ২রা মে ভোরবেলায়। ছত্রিশ বছর পূর্বে একটি ঊষার দিব্যপ্রকৃতি যেন উৎক্রমণের পথে নিঃশেষ হয়ে আর এক নতুন ঊষার মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হোলো, যেমনটি তিনি লিখেছেন তাঁর ‘Life Devine’ গ্রন্থে—“She enters into communion with the rest that are to come.”। শ্রীঅরবিন্দের

আলিপুর বোমা-মামলায় জড়িয়ে পড়া একটা নিছক ঘটনাচক্র, কারণ তাঁর মত ও পথ ছিল স্বতন্ত্র। তিনি নিজে সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন—"জানিতাম না তখন যে, আমি এই সন্দেহের লক্ষ্যস্থল, আমিই পুলিসের বিবেচনায় প্রধান হত্যাকারী, রাষ্ট্রবিপ্লবপ্রয়াসী যুবকদলের মন্ত্রদাতা ও গুপ্তনেতা।" (১৫)। "আমি জানিতাম যে, আমার বাড়িতে বিস্ফোরক পদার্থের প্রস্তুত প্রণালী বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার কোনো কাগজ থাকা অসম্ভব।" (১৬)।

এই প্রসঙ্গে দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন, "যাঁহারা অরবিন্দকে প্রকাণ্ড রাজদ্রোহী বা বিপ্লববাদের প্রবর্তক মনে করিয়া তাঁহার প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতেন ··শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, অরবিন্দের পুস্তকাগারস্থ সেই অরণ্য গ্রন্থস্তূপের মধ্যে বিপ্লববাদের সমর্থক কোনো গ্রন্থ—revolutionary literature—আমি কোনোদিন দেখিতে পাই নাই।...বৃটিশ রাজশক্তির প্রতি অবজ্ঞাসূচক কোনো উক্তি কোনোদিন তাঁহার মুখে শ্রবণ করি নাই।" (৪)।

আলিপুর বোমা-মামলা নাটকের রচয়িতা, সূত্রধার ও প্রধান অভিনেতা, ইয়ার্ড্‌লে নর্টনের লেখাতেও (মামলা শেষে) শ্রীঅরবিন্দের প্রতি আক্রমণাত্মক উক্তির তীব্রতা পূর্ণমাত্রায় হ্রাস পায়। সরকার পক্ষের কৌঁসুলি নর্টনের লেখায় শ্রীঅরবিন্দকে "One of the followers of the movement" হিসাবে ধরা হলেও "Leader of the movement" হিসাবে দেখানো হয়নি। যদিও মামলার আগে এবং মামলা চলার সময়ে তিনি শ্রীঅরবিন্দের প্রতি মূলত সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তদানীন্তন বাংলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর ফ্রেজার সাহেবের একটি গোপন পত্রের সপ্তম অনুচ্ছেদে ফ্রেজার লিখেছিলেন, "বারীন সেখানে (বরোদায়) গিয়ে ওঁর সঙ্গে মিলিত হন এবং রাজনৈতিক ও বিপ্লবাত্মক অজস্র গ্রন্থাদি পাঠ করবার পর সেইসব ভাবধারা বাংলায় প্রচারের সংকল্প নিয়ে বার হন।" কিন্তু "বিপ্লবাত্মক অজস্র গ্রন্থাদি" বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের পুস্তকাগারে যে মোটেই ছিল না সেকথা দীনেন্দ্রকুমার স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন। সুতরাং

ফ্রেজারের অনুমান যে সম্পূর্ণ ভুল তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। অবশ্য ফ্রেজার তাঁর সুদীর্ঘ পত্রটিতে বহু তথ্যের উল্লেখ করে সব শেষে স্বীকার করেছিলেন, "যদিও উক্ত তথ্যগুলি পরিষ্কার আইনসম্মত প্রমাণ নয় এবং এর সাহায্যে মামলা লড়তে গেলে উনি হয়ত মুক্তিই লাভ করবেন।" শ্রীঅরবিন্দের চরিত্র রূপায়ণে ফ্রেজার লিখেছেন, "তিনি কেবলমাত্র অনায়াস-প্রসূত এবং গভীরভাবে হৃদয়গ্রাহী এক লেখনীরই অধিকারী নন, অপূর্ব ক্ষমতাশালী এবং বিচক্ষণ সংগঠনকারীও; এবং সম্ভবত, আর কেউ যা পারেনি, তিনিই তা সাধিত করেছেন—রাজনীতিতে আরোপ করেছেন, অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গেই, ধর্মকে—যা সাম্প্রতিক আন্দোলনকে করে তুলেছে মারাত্মক, ভয়ঙ্কর। তিনি যাচ্ছেতাই রকমের একরোখা, আপসে পরাঙ্মুখ।" শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর বিচিত্র ধারণাগুলি যে পটভূমিকার ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলি সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন ১৯০৮ সালে দেশের যে সমস্ত ঘটনার ভিত্তিতে শ্রীঅরবিন্দকে আলীপুর বোমা মামলার সঙ্গে জড়ানো হয়েছিল সেগুলির সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর অন্ধ অবিচার ও নির্লজ্জ দমন-নীতির বিরুদ্ধে দেশের ক্ষত্রতেজোদীপ্ত যুবশক্তি সমবেত হোলো। তাদের স্বার্থহীন প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ-স্পৃহার চরম প্রকাশ তদানীন্তন শাসকযন্ত্রকে বিপর্যস্ত করে তুললো। রাজতন্ত্রের আজ্ঞাধীন গুপ্তচর-বিভাগ একটি সক্রিয় গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির সন্ধানে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁদের চরম অপদার্থতা প্রতিপন্ন করে, ঠিক সেই সময়েই মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ে এবং হুগলী জেলার চন্দননগরে দু'জন বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারীর জীবন নাশের চেষ্টা হোলো। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল বিপ্লবী ক্ষুদিরাম মজঃফরপুরে মিস্টার কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে নিয়তির পরিহাসে হত্যা করলেন নিরীহ কেনেডি দম্পতিকে। বিপ্লবীদের অনুসন্ধানে পুলিসী

তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পেলো। তাদের সন্ধানী দৃষ্টি কলকাতার কয়েকজনের উপর কেন্দ্রীভূত হোলো। গুপ্তচরদের তথ্যের ভিত্তিতে পুলিস দপ্তরের বিভাগীয় প্রধানগণ তল্লাসী পরোয়ানার বলে বলীয়ান হয়ে কলকাতার কয়েকটি বাড়িতে হানা দেবার পরিকল্পনা করলেন। ১৯০৮ সালের ২রা মে আকাশ থেকে শুকতারা বিদায় নেবার সময় থেকেই কলকাতা পুলিসের বড়কর্তারা কলকাতার কয়েকটি অঞ্চলে শুরু করলেন ব্যাপক তল্লাসী। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তাঁরা সশস্ত্র পুলিসের সাহায্যে ঘিরে ফেললেন: মানিকতলার ৩২ নম্বর মুরারিপুকুর রোডের বাগানবাড়ি; হাতিবাগান বাজারের কাছে ৪৮ নম্বর গ্রে স্ট্রীটে 'নবশক্তি' পত্রিকার কার্যালয়; শোভাবাজারে ৩৩।৪ নম্বর রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে হেমচন্দ্র দাসের বোমা তৈরির মূল আস্তানা; বাগবাজারে ১৫ নম্বর গোপীমোহন দত্ত লেনের ও ১৩৪ নম্বর হ্যারিসন রোডের বোমার মশলার গুপ্ত ভাণ্ডার; ২৩ নম্বর স্কট লেনে শ্রীঅরবিন্দের বাড়ি; এবং ৪ নম্বর হ্যারিসন রোডে বারীন্দ্র কুমারের 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রথম কার্যালয়।

৩২ নম্বর মুরারীপুকুর রোডের বাগান বাড়িটির মালিক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ এবং বারীন্দ্রকুমার। এই বাগানবাড়ি তল্লাস করে পুলিস বন্দুক, রিভলবার, রাইফেল, বোমা, ডেটোনেটর, বোমার মশলা এবং বিপ্লব সম্পর্কীয় পুস্তক-পুস্তিকা হস্তগত করে। এই বাড়ি থেকে পুলিস বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ রায়, বিভূতিভূষণ সরকার, নরেন বক্সী, পরেশ মৌলিক, কুঞ্জলাল সাহা, বিজয় নাগ, শচীন সেন, পূর্ণচন্দ্র সেন, হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, নলিনী-কান্ত গুপ্ত, শিশিরকুমার ঘোষ, এবং উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে ধরে নিয়ে যায়।

৪৮ নম্বর গ্রে স্ট্রীটের বাড়ির দোতলায় শ্রীঅরবিন্দ, একতলায় অবিনাশ ভট্টচার্য ও শৈলেন্দ্রনাথ বসু পুলিসের হাতে ধরা পড়েন। সেই সময়কার সঠিক বিবরণ একমাত্র তাঁর স্মৃতিচারণেই পাওয়া যায়—

"শুক্রবার রাত্রিতে আমি নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইয়াছিলাম, ভোরে প্রায় ৫টার সময় আমার ভগিনী সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, জাগিয়া উঠিলাম। পরমুহূর্তে ক্ষুদ্র ঘরটি সশস্ত্র পুলিসে ভরিয়া উঠিল; সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ক্রেগান, ২৪ পরগণার ক্লার্ক সাহেব, সুপরিচিত শ্রীমান বিনোদকুমার গুপ্তের লাবণ্যময় ও আনন্দদায়ক মূর্তি, আর কয়েকজন ইন্স্পেক্টর, লাল পাগড়ি, গোয়েন্দা, খানা তল্লাসীর সাক্ষী। হাতে পিস্তল লইয়া তাহারা বীরদর্পে দৌড়াইয়া আসিল, যেন বন্দুক কামান সহ একটি সুরক্ষিত কেল্লা দখল করিতে আসিল।...বিছানায় বসিয়া আছি, তখনও অর্ধনিদ্রিত অবস্থা, ক্রেগান জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অরবিন্দ ঘোষ কে, আপনিই কি?' আমি বলিলাম, 'আমিই অরবিন্দ ঘোষ'। অমনি একজন পুলিসকে গ্রেপ্তার করিতে বলেন।...ক্রেগানের হুকুমে হাতে হাতকড়ি, কোমরে দাড় দেওয়া হইল।...সেই সময়েই শ্রীযুক্ত অবিনাশ ভট্টচার্য ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র বসুকে পুলিস উপরে আনে, তাহাদেরও হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে কাহার কথায় জানি না, তাহারা হাতকড়ি ও দড়ি খুলিয়া লয়।...এতক্ষণ খানাতল্লাসী চলিতেছে। ইহা সাড়ে পাঁচটার সময় আরম্ভ হয় এবং প্রায় সাড়ে এগারটায় শেষ হয়।...প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আমরা বাটী হইতে যাত্রা করিলাম।...সেইখানেই (থানায়) স্নান ও আহার করিয়া লালবাজারে রওনা হইলাম। লালবাজারে কয়েক ঘণ্টা বসাইয়া রয়ড স্ট্রীট লইয়া যায়, সেই শুভস্থানে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাইলাম। রয়ড স্ট্রীটে ডিটেক্টিভ মৌলভী শাম্স-উল-আলামের সহিত আমার প্রথম আলাপ ও প্রীতি স্থাপন হয়।...এত ধর্মভাবে মাতোয়ারা হইয়াও মৌলভীসাহেব ডিটেক্টিভগিরি ছাড়েন নাই। একবার বলিলেন, 'আপনি যে আপনার ছোট ভাইকে বোমা তৈয়ার করিবার জন্য বাগানটি ছাড়িয়া দিলেন, বড় ভুল করিলেন, ইহা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই।' তাঁহার কথার অর্থ বুঝিয়া আমি একটু হাসিলাম;

বলিলাম, 'মহাশয়, বাগান যেমন আমার তেমনি আমার ভাইয়ের, আমি যে তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম, বা ছাড়িয়া দিলেও বোমা তৈয়ারি করিবার জন্য ছাড়িলাম—এ খবর কোথায় পাইলেন?'...সন্ধ্যাবেলায় স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত রামসদয় মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব।...পর মুহূর্তে কয়েকজন আসিয়া আমাকে ও শৈলেন্দ্রকে লইয়া ঝড়বৃষ্টির মধ্যে লালবাজার হাজতে লইয়া যায়। লালবাজারে... দুইজনে একসঙ্গে আছি দেখিয়া হ্যালিডে (পুলিস কমিশনার) সার্জেণ্টের উপর চটিয়া উঠিলেন ..সেই মুহূর্তেই শৈলেনকে অন্য ঘরে সরাইয়া বন্ধ করে। আর সকলে যখন চলিয়া যায় হ্যালিডে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এই কাপুরুষোচিত দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া আপনার কি লজ্জা করে না?' 'আমি লিপ্ত ছিলাম ইহা ধরিয়া লইবার আপনার কি অধিকার?' উহার উত্তরে হ্যালিডে বলিলেন, 'আমি ধরিয়া লই নাই, আমি সবই জানি।' আমি বলিলাম, 'কি জানেন বা না জানেন আপনারাই অবগত।' এই হত্যাকাণ্ডের (কেনেডি দম্পতির হত্যা) সহিত সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি।

"রবিবার সমস্ত দিন হাজতে কাটিয়া গেল। সোমবারে কমিশনারের নিকট আমাদের হাজির করে।...পরদিন ম্যাজিস্ট্রেট থর্নহিলের কোর্টে আমাদের লইয়া যায়। এই সময় শ্রীযুক্ত কুমার-কৃষ্ণ দত্ত, ম্যানুয়েল সাহেব আর আমার একজন আত্মীয়ের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।...আমার আত্মীয়কে বলিলাম, 'বাড়িতে ব'ল কোনো ভয় যেন না করে, আমার নির্দোষিতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইবে।' আমার মনে তখন হইতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ইহা হইবেই। প্রথম নির্জন কারাবাসে মন একটু বিচলিত হয় কিন্তু তিনদিন প্রার্থনা ও ধ্যানে কাটানোর ফলে নিশ্চলা শান্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস পুনঃ প্রাণকে অভিভূত করে।

"থর্নহিল সাহেবের এজলাস হইতে আমাদের আলিপুরে গাড়ি করিয়া লইয়া যায়।...আলিপুরে আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে

কতক্ষণ থাকিতে হইল, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আমাদের হাজির করা হয় নাই, কেবল ভিতর হইতে তাহার হুকুম লিখাইয়া আনে।··· তৎপরে কোর্ট হইতে আমরা জেলে গিয়া জেলের কর্মচারিগণের হাতে সমর্পিত হই।···স্নানের পর তাহারা সকলকে নিজ নিজ নির্দিষ্ট ঘরে পৌছাইয়া দেয়, আমিও আমার নির্জন কারাগারে ঢুকিলাম, ক্ষুদ্র ঘরের গরাদ বন্ধ হইল। ৫ই মে আলিপুরের কারাবাস আরম্ভ।"(১৭)।

শ্রীঅরবিন্দকে পুলিস ২রা মে ভোরে থানায় ধরে নিয়ে যায় এবং ৫ই মে ম্যাজিস্ট্রেট বার্লি সাহেবের আদেশে তাঁর কারাজীবন শুরু হয়। এই সময় থেকে শ্রীঅরবিন্দের কারাজীবন শুরু হলেও ১৭ই মে তারিখের আগে বাংলাদেশের লাটসাহেবের পক্ষ থেকে বার্লি সাহেবকে শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্যদের বিচারের কোন আদেশ দেওয়া হয়নি। তারপর শ্রীঅরবিন্দকে "Under sanction order of Governor dated 17/5/1908, sanction was given to L. Birley to prosecute certain persons (No 1 to 33) under Sections 121 A, 122, 123, 124. I. P C." (১৮) অনুযায়ী অভিযুক্ত করা হোলো। এই আদেশ বলে বার্লি সাহেব ১৯।৫।১৯০৮ তারিখে শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন—"These people are all accused of organising a gang for the purpose of waging war against the Government by means of criminal force. L. Birley." (১৮)। বার্লি সাহেবের অভিযোগ পদ্ধতিতে যে আইনবিরোধী আচরণগুলি সুস্পষ্ট ছিল সেগুলি যথা সময়ে চিত্তরঞ্জন তাঁর সওয়ালে পেশ করেন।

বার্লি সাহেবের এজলাসে দু'শ বাইশ জন সাক্ষীর জবানবন্দীর ভিত্তিতে ১৯০৮ সালের ১৯শে অগস্ট শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আরো কয়েকজনকে আলীপুরে সেসন্স জজের আদালতে বিচারার্থে পাঠান হয়। বার্লি এঁদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছিলেন—"are charged 121, 121 A, 123 I. P. C. (wage

war against king, conspiracy against sovereignty) and directed for trial by the Court of Sessions." (১৮)। এর পর আরো ৫৫ জন সাক্ষীর জবানবন্দীর ভিত্তিতে বারীন্দ্র ও বাকী সকলকে সেসন্স জজের আদালতে বিচারার্থে পাঠানো হয়। এঁদের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ ছিল। এঁদের সকলেরই বিচার শুরু হয় ১৯০৮ সালের ১৯ শে অক্টোবর থেকে আলীপুরের দায়রা জজ মিস্টার সি. পি. বীচ্ক্রফ্টের এজলাসে।*

---

*In the court of Addl. Sessions Judge, Alipore (24 Parganas), from 19/10/08—14/4/09, Judgment on the 6/5/09. Judge : C. P. Beachcroft, I. C. S. Assessors : Gurudas Bose and Kedarnath Chatterjee. Counsel for the Crown : E.Norton, Mr. Barton, Ashu Biswas (P. P.), Withal (Solicitor) Counsel and Pleaders for the accused : B. B. Chakravarty, K. N. Chowdhury (for a few days), C. R. Das, P. Mitra, E. P. Ghosh, J. N. Roy, R. C. Bonerjea, R. N. Roy, P. Pal, Hemendranath Mitra (few days only), Nirode Chatterjee, Sarat Sen, Bijoy K. Bose. Nagendra Banerjee, Narendra Bose, Dwijendra Mukherjee, Tincouri Chatterjee and Banku Behari Mallik Chowdhury, Mannuel & Agarwalla (Solicitors).

"As soon as the learned judge took his seat the following charges were read over to the accused who pleaded not guilty. Babu Gurudas Bose and Kedar Nath Chatterjee were then chosen and the trial commenced.

CHARGES

"That you, on or about 12 months preceeding May 15th, 1908, at various places in Bengal, including 32, Muraripukur Road, Maniktola, which is within my jurisdiction, collected men, arms or ammunitions, or otherwise prepared to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war against the King Emperor and thereby committed an offence punishable under section 122 of the I. P. C. and within the cognizance of the Court of Sessions. And I hereby direct that you be tried by the said Court on the said charge.

Alipore, 20/10/08 Sd/- C. P. Beachcroft." (১৮)।

আদালতে আসামীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তির ভিত্তিতে বীচক্রফ্‌ট সাহেব ১৯০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মামলার অন্যতম আসামী চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক চারু রায়কে অব্যাহতি দিলেন (extradition was taken from French Government on a murder charge—so cannot be prosecuted for political offences—discharged) এবং নিম্নলিখিত ছত্রিশজন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করে বহাল রাখলেন : বারীন ঘোষ, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, উপেন ব্যানার্জি, শিশির ঘোষ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, শচীন সেন, পরেশ মৌলিক কুঞ্জলাল সাহা, বিজয় নাগ, নরেন্দ্র বক্সী, পূর্ণ সেন, হেমেন্দ্র ঘোষ, বিভূতি সরকার, নিরাপদ রায়, হেমচন্দ্র দাস, অবিনাশ ভট্টচার্য, অরবিন্দ ঘোষ, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, দীনদয়াল বসু, সুধীর সরকার, কৃষ্ণজীবন সান্যাল, হৃষীকেশ কাঞ্জীলাল, বীরেন্দ্র ঘোষ, ধরণী গুপ্ত, নগেন গুপ্ত, অশোক নন্দী, সুনীল সেন, বীরেন সেন, হেম সেন, দেবব্রত বসু, ইন্দ্র নন্দী, নিখিলেশ্বর মৌলিক, বিজয় ভট্টচার্য, বালকিষণ হরিকানে, এবং প্রভাস দেব।

এর পরে আত্মপক্ষ সমর্থনের পক্ষে সমস্ত যুক্তি উপেক্ষা করে নর্টন সাহেব (সরকারী কৌঁসুলী) সর্বসমেত ২০৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ ও চার হাজার নথিপত্র এবং তিন-চার শ' দ্রব্যের প্রদর্শনীর সাহায্যে স্বীয় বাক্‌চাতুর্য এবং অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে শুরু করলেন। এই মামলার দর্শকরা নর্টনের একাদিক্রমে শতাধিক দিনের অভিনয় দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এই অভিনয়ের আগে অর্থাৎ আলিপুরে বীচক্রফ্‌টের এজলাসে সাক্ষ্যগ্রহণ পর্বের আগের দিন অবধি শ্রীঅরবিন্দ পরম শান্তিতে কারাকক্ষে সাধনায় আত্মস্থ ছিলেন।

১৯০৮ সালের ৫ই মে থেকে ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ 'সর্বঘটে নারায়ণ' এই মূল সত্য উপলব্ধি করবার চেষ্টায় একান্তভাবে মগ্ন ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের কারাজীবন

শুরু হয় নয় ফুট দীর্ঘ , ছয় ফুট প্রস্থ, জানালাবিহীন, লোহার গরাদের দরজাযুক্ত একটি পিঞ্জরে। আদালতের ভাষায় এই পিঞ্জর কক্ষকে ‘ছয় ডিক্রি’র ঘর বলা হয়—কারণ এই রকম ছয়টি ঘর পাশাপাশি থাকে। আহার্য গ্রহণের জন্য একটি থালা এবং অন্যান্য সব কাজের জন্য একটি বাটি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া ঐ পিঞ্জরের মধ্যেই শৌচক্রিয়ার জন্য থাকতো আলকাতরা মাখানো দুটি টুকরি, একটি স্নানের বালতি, জলের একটি নলাকার বালতি এবং দুটি জেলের কম্বল। পানীয় জল এবং স্নানের জলের পরিমাণ এবং প্রকৃতি সম্পূর্ণ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন।

তাঁর কথায়—“ঝড়বৃষ্টি হইলেই ধূলা, পাতা ও তৃণসঙ্কুল প্রভঞ্জনের তাণ্ডব নৃত্যের পর আমার খাঁচার মধ্যে ছোট-খাট একটা জলপ্লাবন হইত। প্রকৃতির এই লীলাবিশেষ সাঙ্গ হইলেও জলপ্লাবিত মাটি যতক্ষণ না শুকাইত ততক্ষণ নিদ্রার আশা পরিত্যাগ-পূর্বক চিন্তার আশ্রয় লইতে হইত, কেন না শৌচ ক্রিয়ার সামগ্রীর নিকটই একমাত্র শুষ্কস্থল থাকিত কিন্তু সেই দিকে কম্বল পাতিতে প্রবৃত্তি হইত না। এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও ঝড়ের দিনে ভিতরে প্রচুর বাতাস আসিত এবং ঘরের সেই তপ্ত উনুন-তাত বিদূরিত হইত বলিয়া ঝড়বৃষ্টিকে সাদরে স্বাগত করিতাম।…কিন্তু ভগবানের দয়া দৃঢ় ছিল বলিয়া কয়েকদিন মাত্র এই কষ্ট অনুভব করিয়াছিলাম,… মন সেই দুঃখের অতীত হইয়া কষ্ট অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। সেইজন্য জেলের স্মৃতি মনে উদয় হইলে ক্রোধ বা দুঃখ না হইয়া হাসিই পায়।

“এই আলিপুর জেলে বাসকালীন আমার দেশের কয়েদী আমার দেশের চাষা, লোহার, কুমার, ডোম বাগদীর সমান আহার, সমান থাকা, সমান কষ্ট, সমান মানমর্যাদা লাভ করিয়া বুঝিলাম সর্বশরীরবাসী নারায়ণ এই সাম্যবাদ, এই একতা, এই দেশব্যাপী ভ্রাতৃভাবে সম্মত হইয়া যেন আমার জীবনব্রতে স্বাক্ষর দিয়াছেন।… ভগবান বিদ্যা, সম্ভ্রম, লোকমান্যতা, লোক-প্রশংসা, বাহ্যিক স্বচ্ছন্দতা

ও সভ্যতা দেখেন না। তিনি দুঃখীর নিকটেই দয়াময়ী মাতৃরূপ প্রকাশ করেন। যিনি মানবমাত্রে, জাতিতে, স্বদেশে, দুঃখী-গরীব পতিত পাপীতে নারায়ণকে দেখিয়া সেই নারায়ণের সেবায় জীবন সমর্পণ করেন তাঁহারই হৃদয়ে নারায়ণ আসিয়া বসেন। আর উত্থানোদ্যত পতিত জাতির মধ্যে দেশ সেবকের নির্জন কারাগারেই ভগবৎ-সান্নিধ্যের ছড়াছড়ি সম্ভব।...গোরু ও গোপাল নিত্য প্রিয় দৃশ্য ছিল। আলিপুরের নির্জন কারাবাসে অপূর্ব প্রেম-শিক্ষা পাইলাম।...আলিপুরে বসিয়া বুঝিতে পারিলাম, সর্বপ্রকার জীবের উপর মানুষের প্রাণে কি গভীর ভালবাসা স্থান পাইতে পারে, গোরু, পাখী, পিপীলিকা পর্যন্ত দেখিয়া কি তীব্র আনন্দ স্ফুরণে মানুষের প্রাণ অস্থির হইতে পারে।...একদিন অপরাহ্লে আমি চিন্তা করিতেছিলাম, চিন্তা আসিতেই লাগিল, হঠাৎ সেই চিন্তাসকল এমন অসংযত ও অসংলগ্ন হইতে লাগিল যে, বুঝিতে পারিলাম চিন্তার উপর বুদ্ধির নিগ্রহ শক্তি লুপ্ত হইতে চলিল।...প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিলাম, আমার বুদ্ধিভ্রংশ নিবারণ করিতে বলিলাম। সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত অন্তঃকরণে হঠাৎ এমন শীতলতা ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, উত্তপ্ত মন এমন স্নিগ্ধ, প্রসন্ন ও পরম সুখী হইল যে, পূর্বে এই জীবনে এমন সুখময় অবস্থা অনুভব করিতে পারি নাই। শিশু মাতৃক্রোড়ে যেমন আশ্বস্ত নির্ভীক হইয়া শুইয়া থাকে আমিও যেন বিশ্বজননীর ক্রোড়ে সেইরূপ শুইয়া রহিলাম। এই দিনেই আমার কারাবাসের কষ্ট ঘুচিয়া গেল।

"একদিকে জেলের কারখানা, অপরদিকে গোয়ালঘর—আমার স্বাধীন রাজ্যের এই দুই সীমা ছিল। কারখানা হইতে গোয়ালঘর, গোয়ালঘর হইতে কারখানা, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে হয় উপনিষদের গভীর ভাবোদ্দীপক অক্ষয় শক্তিদায়ক মন্ত্র সকল আবৃত্তি করিতাম, না হয় কয়েদীদের কার্যকলাপ ও যাতায়াত লক্ষ্য করিয়া সর্বঘটে নারায়ণ এই মূল সত্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতাম।

বৃক্ষে, গৃহে, প্রাচীরে, মনুষ্যে, পশুতে, পক্ষীতে, ধাতুতে, মৃত্তিকায় সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম মনে মনে এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক সর্বভূতে সেই উপলব্ধি আরোপ করিতাম। এইরূপ করিতে করিতে এমন ভাব হইয়া যাইত যে, কারাগার আর কারাগারই বোধ হইত না। সেই উচ্চ প্রাচীর, সেই লোহার গরাদ, সেই সাদা দেওয়াল, সেই সূর্যরশ্মিদীপ্ত নীল পত্র-শোভিত বৃক্ষ, সেই সামান্য জিনিসপত্র যেন আর অচেতন নহে, যেন সর্বব্যাপী চৈতন্যপূর্ণ হইয়া সজীব হইয়াছে, তাহারা আমাকে ভালবাসে, আমাকে আলিঙ্গন করিতে চায় এইরূপ বোধ হইত। মনুষ্য, গাভী, পিপীলিকা, বিহঙ্গ চলিতেছে, উড়িতেছে, গাহিতেছে, কথা বলিতেছে, অথচ সবই প্রকৃতির ক্রীড়া : ভিতরে এক মহান নির্মল নির্লিপ্ত আত্মা শান্তিময় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। এক-একবার এমন বোধ হইত যেন ভগবান সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বংশী বাজাইতে দাঁড়াইয়াছেন ; এবং সেই মাধুর্যে আমার হৃদয় টানিয়া বাহির করিতেছেন। সর্বদা বোধ হইতে লাগিল, যেন কে আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে, কে আমাকে কোলে করিয়া রহিয়াছে। এই ভাব বিকাশে আমার সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করিয়া কি এক নির্মল মহতী শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল, তাহার বর্ণনা করা যায় না। প্রাণের কঠিন আবরণ খুলিয়া গেল এবং সর্বজীবের উপর প্রেমের স্রোত বহিতে থাকিল। প্রেমের সহিত দয়া, করুণা, অহিংসা ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাব আমার রজঃ-প্রধান স্বভাবকে অভিভূত করিয়া বিশেষ বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। আর যতই বিকাশ পাইতে লাগিল ততই আনন্দ বৃদ্ধি হইল এবং নির্মল শান্তিভাব গভীর হইল। মোকদ্দমার দুশ্চিন্তা প্রথম হইতে দূর হইয়া গিয়াছিল, এখন বিপরীত ভাব মনে স্থান পাইল। ভগবান মঙ্গলময়, আমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে কারাগৃহে আনিয়াছেন, নিশ্চয় কারামুক্তি ও অভিযোগ খণ্ডন হইবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গেল।...এই অবস্থা ঘনীভূত হইতে কয়েকদিন লাগিল, তাহারই মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়।...

এই নাটকের প্রধান অভিনেতা সরকার বাহাদুরের কৌঁসুলী নর্টন সাহেব ছিলেন।" (১৭)।

আলিপুর বোমা মামলায় সরকারের প্রকৃত লক্ষ্য ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। বীচক্রফ্‌টের এজলাসে যে ২০৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যাঁরা নর্টন সাহেবের জেরায় পর্যুদস্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রধানত শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, সেগুলি থেকে সাক্ষীদের চোখে শ্রীঅরবিন্দকে ভাল ভাবে জানা যায়। তাছাড়া মামলার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের প্রকৃত যোগাযোগ কতখানি ছিল সে সম্বন্ধেও বেশ খানিকটা ধারণা করা যায়ঃ—

[নিম্নোক্ত সাক্ষীদের ক্রমিক সংখ্যা Alipore Bomb Trial পুস্তকে প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী।]

(১) **পি. সি. দাসঃ** ১লা মে ১৯০৮, চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ থর্নহিলের কাছে অরবিন্দের রাজদ্রোহীদল সম্পর্কে অভিযোগ করেন।

(১৮) **রিচার্ড ক্রীগান** (পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট্‌): ২রা মে ১৯০৮, ৪৮ নং গ্রে স্ট্রীটে অনুসন্ধান চালান। উপর তলায় অরবিন্দকে দেখতে পান। অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করেন। তল্লাসী চালিয়ে চিঠিগুলি (প্রদর্শিত বস্তু নং ২৮৩) সংগ্রহ করেন। একটি চিঠি তিলকের লেখা এবং অপরটি বারীন্দ্রের 'মিষ্টান্ন' সম্পর্কীয়। তিনি অরবিন্দের হাতে হাতকড়া লাগান।

(৩৫) **পি. সি. লাহিড়ী** (ইন্‌সপেক্‌টার): ১৯০৭ সালের ৩০শে জুলাই অরবিন্দের বিরুদ্ধে 'বন্দেমাতরম্‌'-এর সম্পাদক হিসাবে, হেমেন্দ্রপ্রসাদ বাগ্‌চির বিরুদ্ধে ম্যানেজার হিসাবে এবং অপূর্ব-কুমার বোসের বিরুদ্ধে মুদ্রাকর হিসাবে অভিযোগ এনেছিলেন। অপূর্বকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তিনি জানতেন যে, ১৯০৬ সালের অক্টোবরে 'বন্দেমাতরম্‌' যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে অনুমোদন লাভ করে। ওই প্রতিষ্ঠানের একজন অংশীদার ও

পরিচালক ছিল অরবিন্দ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রথম বার্ষিক সভায় সে সভাপতিত্ব করেছিল।

(৫৮) **নগেশ মুখার্জি** (ইন্সপেক্টার) ঃ ১৯০৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর অরবিন্দ মেদিনীপুর সফরে গিয়েছিল।

(৭৫) **শৈলেন্দ্র সরকার** (করণিক, সিমলা পোস্ট অফিস) ঃ ১৯০৮ সালের মে মাসে অরবিন্দ ঘোষ গ্রেপ্তার হওয়ার পর সরকার আদেশ পাঠান—৪৮ নং গ্রে স্ট্রীট ঠিকানার সকল চিঠি আটক করতে। প্র. ব নং ১২৯০-৯৬।

(৮৪) **পবিত্র চরণ দত্ত** (ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, ছাত্রভাণ্ডার) ঃ অরবিন্দ এবং সুবোধ মল্লিক আর্টিক্ল অব এ্যাসোসিয়েশনে আমার স্বাক্ষরের সাক্ষী হয়েছিলেন।

(৮৬) **সুকুমার মিত্র** (অরবিন্দের মামাতো ভাই) ঃ অবিনাশ অরবিন্দের ২৩ নং স্কট্ লেনের বাসাবাড়িতে বাজার সরকারের কাজ করতো।

(৮৮) **বিপিনবিহারী বোস** (অরবিন্দের খুড়তুতো ভগ্নীপতি) ঃ বাগান ছিল অরবিন্দ আর তার ভাইদের। অরবিন্দ তাঁকে অনুরোধ করেছিল বাগানটা সাত হাজার টাকায় বিক্রি করতে, কিন্তু দর মাত্র পাঁচ হাজার টাকার বেশি ওঠেনি।

(৯২) **সুকুমার সেন** (ম্যানেজিং ডাইরেক্টার 'বন্দেমাতরম্'—কিছু কালের জন্য) ঃ তিনি জানতেন যে, পুরানো 'বন্দেমাতরম্' 'সন্ধ্যা' অফিস থেকে ছাপা হোতো, দিতে হোতো আড়াই হাজার টাকা এবং অরবিন্দ কিছু কালের জন্যে ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিল। বিপিন পাল ঐ টাকা ধার করেন সি. আর. দাস, আর. এন. রায় এবং শৈলেন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে। অন্য পত্র-পত্রিকার সঙ্গে 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্বন্ধ ছিল না এবং সরকারের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রে এর যোগাযোগ ছিল না—এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

(৯৫) **এন্. কে. মল্লিক** (ইন্স্পেক্টার) ঃ তিনি শৈলেন্দ্র, দীন-

দয়াল, অবিনাশ, উল্লাসকর, হেম দাস, বারীন্দ্র আর অরবিন্দকে ২৩ নং স্কট্ লেনে দেখেছিলেন। ১৮ই তারিখে অরবিন্দকে ২৩ নং স্কট্ লেনে দেখেন এবং শুনে বিস্মিত হন যে, অরবিন্দ কিশোরগঞ্জ কন্‌ফারেন্সে ১৮ই থেকে ২১শে এপ্রিল পর্যন্ত ছিল।

(১০১) **শশিভুষণ দে** (ইন্‌সপেক্‌টার) ঃ ১২ই এপ্রিল বারীন্দ্র এবং অবিনাশ ২৩ নং স্কট্ লেনে যায়, অরবিন্দ তখন সেখানে থাকতো। সাক্ষী অনেক দিন থেকে অরবিন্দের নাম জানতেন। তাঁর ধারণা ছিল—অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্'-এ লিখতো।

(১০৫) **এ. সি. ব্যানার্জি** (ব্যারিস্টার) ঃ অরবিন্দের রাজনৈতিক মতবাদ ছিল ধর্মভিত্তিক—তার সেই নীতির একটা আধ্যাত্মিক দিক ছিল। 'বন্দেমাতরম্', 'নিউ ইণ্ডিয়া', 'নবশক্তি', 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা' পত্রিকাগুলি উক্ত ষড়যন্ত্রের মুখপত্র ছিল না। অরবিন্দ কখনো হিংসার আশ্রয় নেয়নি। সেটা তার ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী ছিল। সে যত না রাজনীতিক, তার চেয়ে বেশি দার্শনিক ছিল। তিনি অরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে চরমপন্থীর মনোভাব অর্থাৎ রক্তপাত বা হত্যা থাকা উচিত—তা কখনো দেখেননি।

(১০৮) **বলবন্ত কৃষ্ণ** (হেড্ কনেস্টবল, নাগপুর) ঃ নাগপুরে অরবিন্দ চারটি বক্তৃতা যথাক্রমে ২২।১২।০৭, ৩০।১২।০৭, ৩।১।০৮ এবং ৩।২।০৮ তারিখে দেয়। সে (বলবন্ত) সভায় উপস্থিত থেকে নোট নিয়েছিল।

(১০৯) **ইউ. সি. বাপত্** (ইন্‌সপেক্‌টার, ধুলিয়া, খান্দেশ) ঃ সুরাট কংগ্রেসে যাবার পথে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে অরবিন্দ ধুলিয়ায় এসেছিল। ২৬।১।০৮ তারিখে সে যে বক্তৃতা দিয়েছিল তা সাক্ষী লিপিবদ্ধ করেছিল (প্র. ব. নং ৮৪)

(১১১) **দত্তাত্রেয়** (হেড কন্‌সটেবল, নাসিক) ঃ নাসিকে ২৪।১।০৮ তারিখে প্রদত্ত অরবিন্দের বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করেছিল (প্র. ব. নং ৮৪)।

(১১২) **গোপাল রাও** (ইন্‌সপেক্‌টার) ঃ অরবিন্দ ২৮।১।০৮

তারিখে আমরৌলিতে এসেছিল এবং সাক্ষী তার ২৯।১।০৮ তারিখের বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করেছিল।

(১১৩) **কে. বি. দত্ত** (ব্যারিস্টার) : তিনি মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন, সেখানে অরবিন্দ উপস্থিত ছিল। অরবিন্দের মতবাদ সম্পর্কে তিনি কিছু জানতেন না।

(১৫১) **গিরিজাসুন্দর চক্রবর্তী** : অরবিন্দের কোনো উপনাম সাক্ষীর জানা নাই। ১৭ই এপ্রিলের আগের রবিবার অরবিন্দ ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করে।

(১৯৭) **জি. সি. ডেনহ্যাম** (ডি.এস পি.) : প্র. ব. নং ২৯৫-এর সম্পূর্ণ নকল করেছিলেন।

প্রিয় ভাই,

মাহেন্দ্র ক্ষণ উপস্থিত। আমাদের সম্মেলনে সকলে যাতে জমায়েত হতে পারে তার চেষ্টা কোরো। দরকার হোলেই যাতে কাজে লাগাতে পারা যায় সেই মতো সারা ভারতেই আমাদের মিষ্টান্ন তৈরী রাখতে হবে। আমি তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলুম।

তোমার স্নেহের

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

(২০৬) **নারায়ণ** (ইন্‌সপেক্‌টার, বোম্বাই) : সাক্ষী ১৯০৮ সালের জানুয়ারিতে অরবিন্দকে বোম্বাইতে চার-পাঁচ দিনের জন্যে দেখেছিল। ১৫।১।০৮ তারিখে গিরগাঁওতে অরবিন্দ একটি বক্তৃতা দিয়েছিল। সেখানে প্রায় ৫০০০ লোক উপস্থিত ছিল। ১৯।১।০৮ তারিখে স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট এবং জাতীয় শিক্ষার উপর বক্তৃতা দিয়েছিল (১৮)।

১৯০৯ সালের ৪ঠা মার্চ সরকার বাহাদুরের কৌঁসুলী সাক্ষ্য গ্রহণ বন্ধ করলেন। তারপর জজ সাহেব আসামীদের অভিযোগ সম্পর্কে জেরা করেন। আইনজ্ঞগণ জবাব দেবেন, এই যুক্তি দেখিয়ে আসামীদের জেরার উত্তরে নিজেরা কিছু বলতে অক্ষমতা জানান। তখন নর্টন সাহেব তাঁর সওয়াল শুরু করেন এবং মার্চ মাসের

২০ তারিখে শেষ করেন। এর পর আসামী পক্ষের সমর্থনে তাঁদের কৌঁসুলিগণ এপ্রিল মাস অবধি তাঁদের সওয়াল রাখেন। এই সময়ের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে একাদিক্রমে আটদিন ধরে চিত্তরঞ্জন যে সওয়াল করেন তা আদালতের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে। দীর্ঘকাল স্থায়ী এই বিচার চলবার সময় একাদিক্রমে আটচল্লিশ দিন চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে নর্টনের এক ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ বাক্‌যুদ্ধ হয়েছিল। চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতাকে বলা চলে—'an epic of forensic art' আর নর্টন সাহেবের বক্তৃতাকে বলা যেতে পারে 'a vain attempt, to mix up oil and water, of a master orator.' ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ বলার অর্থ, আদালতের আঙ্গিনায় যুক্তি-বানের কৌশলে **নির্ভেজাল ধর্মের বিরুদ্ধে নির্ভেজাল অধর্মের প্রতীক যুদ্ধ হিসাবে এই মামলা এক ও অদ্বিতীয়।**

চিত্তরঞ্জনের ওজস্বিনী সওয়ালের (পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ) উল্লেখ করার আগে এই মামলায় তাঁর শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের পট-ভূমিকা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই মামলায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করার জন্য তাঁর শ্বশুরমহাশয় ভূপাল বসুর ইচ্ছা অনুযায়ী, প্রথমে নিযুক্ত করা হয় স্বনামধন্য ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও কে. এন. চৌধুরীকে। ব্যারিস্টার চক্রবর্তী পূর্বনির্দিষ্ট কাজে বিদেশে চলে যাওয়ার সময় চিত্তরঞ্জনকে এই মামলায় কৌঁসুলী নিযুক্ত করার উপদেশ দিয়ে যান। সেই অনুযায়ী শ্রীঅরবিন্দের সম্মতি পাওয়ায় চিত্তরঞ্জনকে এই ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন শ্রীঅরবিন্দের সতীর্থ শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। চিত্তরঞ্জন শ্রীঅরবিন্দকে মনে প্রাণে ভালবাসতেন সুতরাং তিনি শ্রীঅরবিন্দের য়্যাটর্নি ম্যানুয়েল এ্যাণ্ড আগরওয়ালাকে মামলার কাগজপত্র তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার কথা বলেন।

ঠিক যে সময় চিত্তরঞ্জন এই মামলার ভার নিলেন সেই সময়ে অর্থের অনটনে এতবড় জটিল মামলা চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। দুঃখিনী শৃঙ্খলিতা মায়ের দুঃখী কারারুদ্ধ ছেলের ত্রাণ-

কর্তারূপে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন আদালতের আঙ্গিনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিধিনির্দেশে। মামলার পারিশ্রমিক হিসাবে একটি কপর্দক গ্রহণ করেননি তো বটেই, সবচেয়ে বড় কথা শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিকে ধ্যান-জ্ঞান করে তিনি তাঁর জীবনী শক্তিকেও আহুতি দিয়েছিলেন। তাই তাঁর মহানুভবতা উদারতা ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় আজও আপন মহিমায় উজ্জ্বল। এই সময়ে মামলার ব্যয়ভার বহনের জন্যে শ্রীঅরবিন্দের বোন সরোজিনী দেবী দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। বিদেশী শাসকদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে দেশপ্রেমী শ্রীঅরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক হিসাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই তহবিলে অর্থ-সাহায্য এসেছিল। "চারিদিক থেকে, দূর দূর পল্লীগ্রাম থেকে পর্যন্ত সাহায্য আসতে লাগল অকুণ্ঠভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে; অজ্ঞ চাষী-মজুর থেকে শুরু করে শিক্ষিত সম্প্রদায় পর্যন্ত সকলেরই কাছ থেকে। ইংলণ্ড, কন্টিনেণ্ট আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া থেকে পর্যন্ত অর্থ-সাহায্য এসেছিল। বিদেশী অর্থ প্রেরকদের অধিকাংশ ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের গুণমুগ্ধ সহ-পাঠী। এক অন্ধ ভিখারী তার ভিক্ষালব্ধ, সবেধন নীলমণি, একটি মাত্র টাকা সরোজিনী দেবীর হাতে অধীর আগ্রহে তুলে দিয়েছিলেন। কোন একজন দরিদ্র ছাত্র নিজে অভুক্ত থেকে অর্থ সাহায্য করে এই তহবিলকে শ্রদ্ধার্ঘ্য-পুষ্ট করেছিল।" (১৯)। আর্থিক মূল্যায়ণের কথা বাদ দিয়ে এইটুকুই বলা যায় যে, শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিপণের পথিকৃৎ ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আর সেই পথে অনুগামী হয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিত্ব-মাধুর্যে শ্রদ্ধাবনত এবং প্রীত, দেশ ও অগণিত মানুষ।

১৯০৯ সালের ৩০শে মার্চ আদালতের কাজ যথারীতি আরম্ভ হোলো। তার আগে ২৩শে মার্চ থেকে চিত্তরঞ্জনের অবিস্মরণীয় সওয়াল জবাব চলছিল—সে দিন শেষ হবে। অপরাজেয় দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক ভাবসমৃদ্ধ চিত্তরঞ্জন আদালত কক্ষে প্রবেশ করলেন। নিস্তব্ধ

আদালত কক্ষে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোলো দৈবাবিষ্ট চিত্তরঞ্জনের শ্রীঅরবিন্দের মুক্তি-সমর্থন যুক্তি :

মাননীয় জজসাহেব এবং এ্যাসেসর ভদ্রমহোদয়গণের জ্ঞাতার্থে সবিনয় নিবেদন—অবশেষে বিচারের শেষ দিনটিতে এসে আজ আমাদের সকলের মধ্যেই একটি স্বস্তির আনন্দ। এই স্বস্তির আনন্দ, বিশেষ করে কাঠগড়ার আসামীদের, কারণ এই বছরের বেশির ভাগ সময় কারাজীবন ভোগ করবার পর আজ, আপনাদের সামনে তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সরকার পক্ষের অভিযোগগুলির সত্যাসত্য নির্ধারণের সময় এসেছে। আসামীদের বিরুদ্ধে এযাবৎ-কাল যে সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে সেগুলির সম্পর্কে আমাকে আমার বক্তব্য পেশ করতে হবেই, কিন্তু তার আগে এই মামলার কয়েকটি অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। (আমি জানি) মিস্টার বার্লি তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে, তিনি এই মামলা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নিয়েছেন, যা বাস্তবিক পক্ষে অস্বাভাবিক আগ্রহ, কারণ এই মামলাটির অস্বাভাবিকত্ব।—এবং আপনারাও সরকারী পক্ষের সাক্ষ্য-বিবরণীর গতি-প্রকৃতির মধ্যে সেই অস্বাভাবিকত্ব দেখতে পাবেন। এখানে, কি ঘটেছে তার উল্লেখ না করে, মামলাটি এখানে আসবার আগে বিবৃতিগ্রাহী ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের কাছে যা ঘটেছিল তা উল্লেখ করছি। অস্বাভা-বিকতার বীজ ঐখানেই বপন করা হয়েছিল। আপনারা দেখতে পাবেন যে, মিস্টার বার্লি (ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা অনুসারে) অভিযুক্ত আসামীদের কেবলমাত্র সন্দেহের বশে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরের দিনই (অর্থাৎ ৩রা মে) বিচার করতে চেয়েছিলেন—যখন ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র পুলিসের সন্দেহ হয়েছিল যে, ওরা বোমা ও ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে—যার যথার্থতা প্রমাণ করা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা।

সরকারী পক্ষের কথা অনুযায়ী, এই সব অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ২রা মে তারিখে কেবল সন্দেহের বশে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং

হাজতে আটকে রাখা হয়। নিয়ম অনুযায়ী তাদের ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়নি—অবশ্য সরকার যদি পুলিস কমিশনারকে ম্যাজিস্ট্রেট বলে ধরে নেন, সে কথা স্বতন্ত্র। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে,৩রা মে মিস্টার বার্লি এদের বিচার করার মনস্থ করেছিলেন। সেই অনুযায়ী ৪ঠা মে তাঁর সামনে এদের হাজির করা হয়েছিল। আমরা আরও দেখতে পাই যে, মিস্টার বার্লি একজন অতি বিশিষ্ট পুলিস কর্মচারীর বাড়িতে গিয়ে এদের কয়েকজনের জবানবন্দী—(যা পুলিসের মতে—পুলিসের কাছে এদের স্বীকারোক্তি)—পড়ে আসেন। আমি বলছি যে, এই পদ্ধতি স্বভাববিরুদ্ধ, এমন একটি পদ্ধতির উল্লেখ আমরা আজ অবধি কোন মামলায় পাইনি। এরপর তিনি আরও কি বলেছিলেন? ৪ঠা মে তারিখে ধৃত ব্যাক্তদের কয়েকজনকে তাঁর সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তিনি তখনি ওদের জেরা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সরকারী অভিশংসকের বক্তব্য যে, মিস্টার বার্লি দণ্ডবিধির একটি বিশেষ ধারা অনুযায়ী ওদের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে আমি পরে যখন আমার বক্তব্য পেশ করবো তখন আপনারা দেখবেন যে, বার্লি সাহেবের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ওদের কাছে অন্যান্য জড়িত ব্যক্তিদের নাম সংগ্রহ করা। এই কাজটি ৪ঠা মে তারিখে করা হয়েছিল। ৩রা মে তিনি এই মামলাটির বিচার করবেন বলে মনস্থ করেন; ৪ঠা মে তারিখেই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং তাদের বিরুদ্ধে (তথাকথিত) প্রমাণের স্তূপ তাঁর সামনে হাজির করা হয়—তিনি নিজেই ওদের জেরা করেন এবং জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন। তারপর তিনি ওদের জামিনে খালাস-পাবার আবেদন পত্রগুলি গ্রহণ করেন এবং সবাইকার আবেদনই না-মঞ্জুর করেন। পরে ১৮ই মে বার্লি সাহেব মিস্টার ফ্রিজোনিকে জেরার মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করেন—সেইদিনই বার্লি সাহেবের অধিকার বৈধতার প্রশ্নটি ওঠে। পরের দিন বার্লি সাহেব তাঁর আদেশ দানের নথি-পত্রে তাঁর গত ৩রা মে তারিখের আদেশের উল্লেখ করে তাঁর

বিচারের অধিকার সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণ খাড়া করলেন। আরো একটি স্বাভাবিক পদ্ধতির ব্যতিক্রম সম্পর্কে আমি এখানে উল্লেখ করবো।

ফ্রিজোনিকে ১৮ই মে আংশিক জেরা করবার পর, ১৯শে মে তারিখে তিনি একটি আদেশ জারী করেন—যা আমি আপনাদের পড়ে শোনাব। সেই আদেশপত্রে কিন্তু ফ্রিজোনির সাক্ষ্য-গ্রহণ সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নাই। কিন্তু সাক্ষীদের জেরা করার বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি হওয়ার আশঙ্কায় (কারণ আদালতের এ রকম কোনো নির্দেশ ছিল না) তিনি ১৯ তারিখে আদেশ জারী করে পরে সাক্ষীকে জেরা করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। এই পদ্ধতি অনুসরণ করা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে কি যুক্তিযুক্ত হয়েছে? আমার নিবেদন, বার্লি সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রিজোনির প্রথম দিনের সাক্ষ্য গ্রহণের নীতিবিরুদ্ধ ভাবটি সামলানো, যা আইনজ্ঞের দৃষ্টিতে ধরা পড়বে বলে তিনি ভালভাবেই জানতেন। সুতরাং এটাই সুস্পষ্ট যে, ১৮ই মে তারিখে তাঁর কাছে কর্তৃপক্ষের কোনো আদেশ ছিল না, এবং যখন তিনি আদেশ পেলেন তখন তিনি সাক্ষীকে আদেশমত পুনর্বার জেরা শুরু করেননি—যা করতে তিনি আইনের বলে বাধ্য। আমার সবিনয় নিবেদন, সমস্ত পদ্ধতিটিই বিধিবহির্ভূত হয়েছিল। উনি যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তা দণ্ডবিধির আওতায় পড়ে না অথবা কোনো আইন অনুযায়ীই গ্রহণযোগ্য নয়। আমার কাছে আমার বন্ধুবরের এই নীতি-অবমাননার অভিসন্ধিটুকু খুবই স্পষ্ট; তা সত্ত্বেও আমি স-ভরসায় বলছি যে, ঐ নীতি সরকারী মামলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, এবং বিশেষ করে, এমনি একটি মামলা যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির গুরুতম অভিযোগ আনা হয়েছে। সংগৃহীত ঐ সাক্ষ্য প্রমাণগুলি যখন আমি সমীক্ষণ করবো তখন আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো যে, ঐগুলির শতকরা নব্বই ভাগই গ্রহণের অযোগ্য, এবং শতকরা নব্বই ভাগই ওদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির উপর কোনো আলোকপাত করে না। ফলে জনসাধারণের সময় ও অর্থের অপচয় তো হয়েইছে, এবং সেই সঙ্গে

সঙ্গে ঐ স্তূপীকৃত সাক্ষ্যপ্রমাণ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি সুবিচারের প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে।

এই ধরনের মামলায়, প্রথমে যড়যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করা উচিত এবং পরে ঐ প্রমাণ-সিদ্ধ ষড়যন্ত্রের সহিত প্রকৃত যড়যন্ত্রকারীদের জড়ানো উচিত। কিন্তু এখানে আমার বন্ধুবর কর্তৃক কি পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে? জবানবন্দী বা স্বীকারোক্তি অথবা লিপিবদ্ধ প্রমাণ ব্যতিরেকে, কেবল আনুমানিক অভিযোগের ভিত্তিতে ওদের আসামী বিবেচনায় তিনি বিচার শুরু করেছিলেন। তিনি ওদের অপরাধ কল্পনা করে সেই অপরাধের প্রমাণগুলির সঙ্গে ওদের জড়িয়ে ফেলেছেন। তিনি একটি চিঠি পড়লেন এবং তা থেকে 'এ.জি.' অক্ষর দুটির উল্লেখ করলেন। উল্লেখ করার পিছনে তাঁর যুক্তি কি? তিনি কি কোনো প্রমাণের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, 'এ.জি.' অক্ষর দুটি 'অরবিন্দ ঘোষ' নামের সংক্ষিপ্ত রূপ? না। তাঁর যুক্তি হোলো "আমি বলছি যে, ঐ অক্ষর দুটি হোলো 'অরবিন্দ ঘোষ'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।" অভিযোগের সন্দেহটুকুর ভিত্তিতে কোনো তদন্তের শুরুতে কেবলমাত্র জেরাই করা চল্‌তে পারে এবং পরে এই সম্পর্কে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণগুলি অনুসন্ধানের প্রশ্ন ওঠে। (এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছিল)।

এইবার ছাত্র ভাণ্ডারের কথা ধরা যাক। অরবিন্দ ঘোষ একজন যড়যন্ত্রকারী—কারণ, তিনি ছাত্র ভাণ্ডারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমার সবিনয় নিবেদন, এইভাবে অভিযোগ করবার প্রচেষ্টা নীতি-বহির্ভূত —এই ধরনের প্রচেষ্টা এখনো পর্যন্ত কোনো ধর্মাধিকরণের সামনে স্বীকৃত হয়নি। আপনার এজলাসে (আলিপুর সেসন্‌স কোর্টে) আমার বন্ধুবরের নিবেদন করা উচিত ছিল যে, এই সব সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা এখনো পর্যন্ত অভিযোগমত দোষী প্রমাণিত হয়নি—সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যদি নির্ভুলভাবে এদের দোষী প্রমাণ করা সম্ভব হয় তবেই আপনারা এদের অপরাধী সাব্যস্ত করবেন।

এখনো আর একটি বিষয় বলবার আছে—সেটি হোলো

অরবিন্দের পারিবারিক পত্রগুলি সম্পর্কীয়। এই পত্রগুলি পড়ুন— পড়লে সহজেই বুঝতে পারবেন যে, ঐগুলি অরবিন্দের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির উপর কোনো আলোকপাত করেনি। এই সমস্ত একান্তভাবে পারিবারিক স্বত্ব-সংরক্ষিত পত্রগুলিকে আম-দরবারে উপস্থিত করবার অনধিকারকে নিছক খেয়ালের বশে অন্যায়ভাবে নস্যাৎ করা হয়েছে। আপনাদের কাছে ওদের অপরাধী প্রমাণ করবার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই কি ঐ প্রচেষ্টা করা হয়েছিল? আমার বিনীত নিবেদন, মোটেই ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে ঐ কাজ করা হয়নি। কারণ ঐ পত্রগুলির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনখানেই এমন কিছুই নেই যা ওদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি প্রমাণের সহায়ক। এর পরেও রয়েছে এই সম্বন্ধে আমার বন্ধুবরের চমৎকার যুক্তি, "চিঠির সবটা পড়ে তার অর্থ যা হয় তা ধর্তব্যের মধ্যে না এনে চিঠির অংশ বিশেষের অর্থ টাই বিবেচ্য।" এই যুক্তির দ্বারা বোঝায় যে, যদিও চিঠির ভাষা ষড়যন্ত্রের অনুকূলে যায় না বা কোনো অপরাধে লিপ্ত থাকার নির্দেশ দেয় না, তবু এই নির্লিপ্ততায় আপনি যেন বিভ্রান্ত না হন। আপনারা কি নিশ্চিত যে অরবিন্দ অপরাধী? আপনারা কি নিশ্চিত যে, অরবিন্দ প্রকৃতপক্ষে রাজদ্রোহী? যদি নিশ্চিত হন তবেই তাকে অপরাধী বলবেন। তার বরোদার গতি-বিধিকে বোমা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এমন কি, 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধগুলিকে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও সেই প্রবন্ধগুলি ছিল স্বাধীনতার বা পূর্ণ স্বরাজের আদর্শের ধারক ও বাহক। কিন্তু এমন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ কোথায় যার দ্বারা নিঃসন্দেহে দেখানো সম্ভব হবে যে, 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার প্রতিটি প্রবন্ধই অরবিন্দের লেখা। আমার বন্ধুবর তাঁর বক্তৃতার শুরুতেই বলেছিলেন যে, ঐ প্রবন্ধে উল্লিখিত আদর্শগুলির সঙ্গে কোনো ইংরাজ ভদ্রলোকের বিরোধ ঘটতে পারে না। যদিও প্রবন্ধে অরবিন্দ আদর্শ প্রচার করেছে, তথাপি ঐগুলি পড়বার সময়ে ঐগুলি বোমা এবং রাজদ্রোহের সম্পর্কীয় হিসাবে পড়তে হবে।

ওঁদের সওয়াল যুক্তির মধ্যে এই ধরনেরই ছলচাতুরীর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

আমি ইতিপূর্বে আপনাদের বলেছি যে, অরবিন্দের চিঠিপত্রগুলি আপনাদের নিকট দেওয়া হয়েছে ; প্রকৃতপক্ষে, ভদ্রমহোদয়গণ, অরবিন্দের জীবনের গোপনীয় বলতে আর কিছুই নেই। আমার বন্ধুবরের অভিপ্রায় হোলো যে, অরবিন্দের আন্তর্জীবনের সঙ্গে যুক্ত ঐ সকল প্রমাণগুলি অরবিন্দের ষড়যন্ত্র ও রাজদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত থাকার পরিচায়ক। আমি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে উক্ত চিঠিপত্রগুলি সম্পর্কে সওয়াল করবো, আমি আপনাদের নিকট যুক্তিসহ প্রমাণ করবো যে, অরবিন্দের জীবন (লেখার দিন থেকে ধরা পড়ার দিন পর্যন্ত) এক মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। অরবিন্দের বরোদা থেকে লেখা চিঠিপত্র ও প্রবন্ধগুলি আমি আপনাদের সামনে নিবেদন করবো, যে-গুলি অরবিন্দের লেখনী-নিঃসৃত অথবা ভাষণ-প্রসূত, এবং আমার নিবেদনের মাধ্যমে আমি আপনাদের দেখাতে সক্ষম হবো যে, ঐগুলির মধ্যে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্রপূর্ণ কোনো ইঙ্গিতই ছিল না। অরবিন্দ সব সময়েই এক মহৎ আদর্শে অনুপ্রেরিত ছিল।
আপনারা বুঝতে পারবেন যে, ১৯০৪ সালের মধ্যভাগ থেকে ১৯০৫, ১৯০৬ এবং বন্দীজীবনের ঠিক আগে পর্যন্ত অরবিন্দের কর্মজীবন সেই মহৎ আদর্শেই অনুপ্রেরিত ছিল। সেই আদর্শের বিশেষ বিশেষ অংশ নিয়ে মন্তব্য করার আগে সাধারণভাবে সেই প্রসঙ্গে কিছু বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমার বন্ধুবর তাঁর সওয়ালে সেগুলির প্রতি বিদ্রূপ করতে দ্বিধা বোধ না করলেও আমি তাতে নিরাসক্ত, কারণ সমগ্র জাতির কাছে ঐগুলি ছিল পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ ;প্রতিটি দেশবাসীর কাছে ঐগুলি ছিল স্বারাজ্য-সিদ্ধি বা ব্রহ্ম-সাযুজ্যের নীতিকথা। এই আদর্শের সঙ্গে ভারতের পরিচয় বহু পুরাতন। যাদের এই আদর্শের সঙ্গে মোটেই পরিচয় নেই, তাদের পক্ষে এর অন্তর্নিহিত ভাবটি বুঝতে পারা দুঃসাধ্য—কিন্তু, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা এই ভাবধারার সঙ্গে নিশ্চয় পরিচিত।

বেদান্তের মূল কথাই হোলো জীবাত্মা (মানুষের মধ্যে যার অবস্থান), পরমাত্মা বা ঈশ্বর থেকে ভিন্ন নয়। অর্থাৎ আপনি যদি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে চান তাহলে ঈশ্বরকে আপনার মধ্যেই উপলব্ধি করতে পারবেন। আপনার অন্তরের মণিকোঠায়, আপনার আত্মায় ঈশ্বরের অধিষ্ঠান এবং সেইজন্যেই আত্ম-উপলব্ধি দ্বারা ঈশ্বর-সান্নিধ্যে না এলে কোনো মানুষ জীবদ্দশায় নির্বাণ লাভ করতে পারে না। সমগ্র জাতির ক্ষেত্রেও, অন্য সব কিছু প্রশ্ন ব্যতিরেকে, ঐ একই উপলব্ধি প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির মধ্যে এই ঊর্ধ্বতম, মহত্তম ও বৃহত্তম উপলব্ধি না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতির অভ্যুত্থান অসম্ভব। কোনো ব্যক্তির পক্ষে এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্যে কোনো বাহ্যিক সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা ও সাধনাই একমাত্র আপনাকে আপনার মধ্যে অবস্থিত ভগবানের উপলব্ধি এনে দেবে, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন ঘটাবে। ব্যক্তিগত জীবনের ঊর্ধ্বগতি বা উত্তরণের পক্ষে প্রযোজ্য এই সত্যটি জাতীয় জীবনের ঊর্ধ্বগতি বা অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই পথে জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই আসবে এবং অন্য কোনো সাহায্য ব্যতিরেকেই জাতীয় মুক্তি সম্ভব হবে। (মুক্তির আস্বাদন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উপলব্ধি) সুতরাং কোনো ব্যক্তিকে অপর কোনো ব্যক্তি বা বিদেশী মুক্তি এনে দিতে পারে না। এই সত্যাশ্রয়ী জাতীয় চেতনার আবাহন বা জাতীয়তাবাদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে দেশবাসীর উপরই নির্ভর-শীল। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত উক্ত বাণী অরবিন্দ সব সময়েই প্রচার করেছে এবং ঐ জাতীয়তাবাদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সনাতন আর্যধর্ম-বিরোধী কোনো পদ্ধতিতে করার কথা কোনোদিনই অরবিন্দ ভাবেনি। আমি বিশেষ করে এই বিষয়টির উপর আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।—

অরবিন্দের চিন্তাধারায় 'পূর্ণ স্বরাজ' বা মুক্তিলাভ পদ্ধতি কখনো তার দেশের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের পরিপন্থী হয়ে ওঠেনি এবং সেই

জন্যেই আপনারা দেখবেন যে, বরোদা ত্যাগ করে কলকাতায় আসবার পর অরবিন্দ যে সব বাণী প্রচার করেছে সেগুলি হিংস্র, পাশবশক্তির জাগরণের বাণী নয়, সেগুলি সংযম, আত্মনিগ্রহ এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শক্তির আবাহক বাণী। যা কোনোমতেই বোমা নয়—সংযমের ভিত্তিতে ত্যাগ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। গুপ্ত সমিতির হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনের প্রতিকূলে অরবিন্দ আবেদন জানিয়েছে এবং তাদের ত্যাগ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহের শিক্ষায় অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এমন যদি কোনো আইন থাকে যা জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রতি অবিবেচক এবং ক্ষতিকর তাহলে সেই আইন এক মহান পরিণামের পরিপন্থী বিবেচনায় ভেঙে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। অরবিন্দ তার লেখনীতে অথবা ভাষণে কখনো বা কোথাও বল প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেনি। যদি সরকার উপযুক্ত বিবেচনায় এমন কোনো আইন প্রণয়ন করেন যা মুক্তির বা মুক্তিলাভের প্রতিবন্ধক হবে, সেক্ষেত্রে অরবিন্দের নির্দেশ হোলো—সেই আইন অমান্য করে আইনটির অস্তিত্ব লোপ করা। এই নির্দেশ বিবেকের শাশ্বত নির্দেশ, এই নির্দেশ বিধিলিপি। সেই আইন অমান্য করার ফলে যদি কারা-জীবন বরণ করতে হয় তাহলে নির্দ্বিধায় কারাজীবনে প্রবেশ করবে। এই কথাগুলিই অরবিন্দের প্রচারিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতির সারাংশ। পৃথিবীর সর্বত্র মুক্তি লাভের জন্যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি কি একই কথা বলেনি? কিন্তু এই দেশে এই নীতি কি এতই বিসদৃশ—এই আন্দোলন—যা মিস্টার নর্টনের অবমাননাকর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে? ইংলণ্ডবাসীরা কি এই ধরনের আন্দোলন বারংবার করেননি?

আমি বলতে চাই যে, হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়ার দিন পর্যন্ত অরবিন্দ ঐ নীতিই প্রচার করে গেছে। তার দেশবাসী আত্মবিশ্বাস হারিয়ে সবকিছু হারাতে বসেছে, এই হতাশায় অরবিন্দ বিচলিত হয়ে উঠেছিল। আপনারা দেখতে পাবেন, সেইজন্যে অরবিন্দ তার বাণী প্রচারের প্রতিটি মুহূর্তেই ঐ ব্যাপারটি সম্পর্কে দেশবাসীকে

সচেতন করতে চেয়েছিল। অরবিন্দ বলেছে, আত্মবিশ্বাসী হও; আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত মুক্তিলাভ সম্ভব হবে না। অনুরূপ নীতি জাতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জাতি যদি জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশের প্রতি সচেষ্ট বা সচেতন না হয়, তবে জাতির ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যজনক। এই ভাব অনুযায়ী অরবিন্দের বাণীতে বলা হয়েছে— "তোমরা কাপুরুষ নও, তোমরা একদল সামর্থ্যহীন মানুষ নও, কারণ তোমাদের মধ্যে দিব্যশক্তি নিহিত রয়েছে। নিজের উপর আস্থা রাখ, এবং সেই অবিচলিত আস্থার উপর নির্ভর করে এগিয়ে চল অভীষ্ট সন্ধানে এবং ক্রমশঃ জাতীয় জীবনে পূর্ণ বিকশিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হও।"

এইবার আমি আমার বিজ্ঞ বন্ধুবরের সাক্ষ্যপ্রমাণ উদ্ধৃতি অনুযায়ী ১৯০২ সাল থেকে বন্দীজীবনের শুরু অবধি অরবিন্দের গুপ্ত-জীবন সম্পর্কে সওয়াল করবো। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের নিকট সুস্পষ্ট হবে যে, ১৯০২ বা ১৯০৩ সাল পর্যন্ত বারীন এবং অরবিন্দের মধ্যে কোনই সংযোগ ছিল না।

প্রমাণসিদ্ধভাবে আপনারা জানেন যে, অরবিন্দ ইংলণ্ডে গিয়েছিল। ইংলণ্ড থেকে ফিরে বরোদায় কর্মজীবন উপলক্ষে সে প্রবাসী হয়। সেই সময়ে বারীন দেওঘরে পড়াশুনো করতো। সেখান থেকে বারীন এফ্-এ পরীক্ষার জন্যে ঢাকায় গিয়েছিল। ঢাকা থেকে সে পাটনায় এবং পরে বরোদায় যায়। ১৯০২ বা ১৯০৩ সালে আমরা বারীনকে বরোদায় দেখতে পাই। আমার বিজ্ঞ বন্ধুটি তাঁর সওয়ালে বলেছেন যে ১৯০২-১৯০৩ সালে বারীনের বরোদায় থাকার সময়ে তার মনে অরবিন্দ বিপ্লবের বীজ বপন করে। বারীন তার স্বীকারোক্তিতে বলেছে যে, ১৯০৩ সালের কোনো সময়ে সে বরোদা পরিত্যাগ করে দেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেছিল। আমার বিজ্ঞ বন্ধুর মতে এই উক্তিটির যথার্থতা দ্বিধাহীন স্বীকৃতি পাবে, সুতরাং এই উক্তির ভিত্তিতেই তিনি বললেন যে বিপ্লবের মন্ত্র বারীন বরোদাতেই পেয়েছিল।

ভদ্রমহোদয়গণ, প্রথমত সুকুমার মিত্র এবং পদ্ম তেওয়ারীর সাক্ষ্য থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে ১৯০২-১৯০৩ সালে বরোদায় সাক্ষাতের আগে পর্যন্ত বারীন ও অরবিন্দের কোনো যোগাযোগ ছিল না। ওদের সাক্ষ্য থেকে আরো জানতে পারবেন যে বারীনের দেওঘরের জীবনে অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। বারীন দেওঘর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকায় এফ্-এ পড়তে যায়; সেখান থেকে বাঁকীপুর হয়ে এক রকম উদ্দেশ্যবিহীন ভাবেই বরোদায় যায়। এর কিছুদিন পরে বারীন বরোদা ত্যাগ করে স্বাধীনতার বাণী প্রচারে প্রবৃত্ত হয়। কেবলমাত্র এই থেকেই তথ্য নিয়ে আমার বিজ্ঞ বন্ধুবর প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে অরবিন্দ বারীনের মনে বিপ্লবের বিষ ঢুকিয়েছে। ব্যাপারটির সত্যাসত্য পরীক্ষার জন্য, ১৯০২-১৯০৩ সালে যখন বরোদায় ওরা দু'জন একসঙ্গে ছিল সেই সময়ে অরবিন্দের নিজের কথাগুলোই ধরা যেতে পারে—এই প্রসঙ্গে ২৯২।১, ২৯২।৩, এবং ২৯২।৫ নম্বরের নথিভুক্ত প্রমাণগুলি পরীক্ষা করা যাক। আমি ঐ নথিভুক্ত প্রমাণ অর্থাৎ চিঠিগুলি ছাড়া ঐ সময়ের অন্য কোনো চিঠি সম্পর্কে অবহিত নয়। ২৯২।১ নম্বর প্রমাণটি হোলো অরবিন্দের লেখা ১৯০২ সালের ২রা জুলাই তারিখের একখানি চিঠি। এই পত্রে (মৃণালিনী দেবীকে লিখিত) আপনারা সরকারের বিরুদ্ধে প্ররোচনা অথবা রাজদ্রোহিতার পক্ষে কোন প্রমাণ আবিষ্কার করতে পেরেছেন কি?

যতীন্দ্র সম্পর্কীয় উক্তির প্রসঙ্গে আমি পরে আলোচনা করবো। অরবিন্দ তার স্ত্রীর জন্মকুণ্ডলী চেয়েছিল যতীন্দ্রকে দেখাবার জন্যে—যতীন্দ্র বরোদা রাজ্যের কর্মচারী এবং জন্মকুণ্ডলীর ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ গণনা করায় বিশেষজ্ঞ ছিল। যতীন্দ্র সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করে দেখবো যে, যতীন্দ্রও অপরাধী কি না, কারণ সে এখনো অবধি দণ্ডবিধির আওতায় আসেনি। অবশ্য এটা ১৯০২ সালের ঘটনা। যে ঘটনা বর্তমান মামলার ভাগ্য নির্ধারণে অভিযোগকারীদের অনুকূলে কোনো আলোকপাত করবে না। যে চিঠিগুলির

কথা আপনাদের বলছিলাম তার মধ্যে অরবিন্দের লেখা ১৯০২ সালের ২০শে অগস্টের চিঠিখানিও বিবেচ্য। এই পত্রে ব্যক্তিগত উন্নতি ছাড়া একটিই প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ রয়েছে এবং সেই কথাটি হোলো—একান্ত অনুগত হিসাবে অরবিন্দের সনাতন হিন্দু সমাজের মত ও পথকে পূর্ণ সমর্থন। এইসব চিঠিপত্রগুলিকে সংগ্রহ করে নথিভুক্ত প্রমাণ হিসাবে রাখা হয়েছে—কারণ এইগুলির সাহায্যে অরবিন্দের ১৯০২ সালের চিন্তাধারার হদিস পাওয়া যাবে। এর পরেই বারীন বরোদা থেকে চলে গিয়ে স্বাধীনতার বাণী প্রচারে ব্যস্ত হয়ে উঠে। ১৯০৪ বা ১৯০৫ সালে বারীন আবার বরোদায় যায়, যে সময়ে অরবিন্দ বারীনের গতিবিধি সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করে—যার প্রমাণ পাওয়া যাবে ২৮৬।৪ নম্বর প্রামাণ্য নথিতে (অরবিন্দের লেখা ১৯০৫ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখের চিঠি)। এই চিঠির বক্তব্য ও সুকুমারের সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, বারীন সম্পর্কে অরবিন্দের অভিযোগ ছিল, "বারীন বড় চঞ্চল, তার কাজকর্ম করার দিকে মন নেই"। সুতরাং বেশ বুঝতে পারা যায়—ঐ সময়ে বারীনের আত্মীয়স্বজন চেয়েছিল যে বারীন উপজীবিকার মাধ্যমে অর্থোপার্জন করুক। অরবিন্দ অভিযোগ করেছে, "সে অশান্ত, সে দেশসেবার কাজে ঘরের বাইরে থাকতে চায়।"—এই অভিযোগ সুকুমারের সাক্ষ্যে স্বীকৃত হয়েছে। এই সব থেকে সেই সময়ে অরবিন্দ ও বারীনের মত ও পথের বিভিন্নতার একটা ধারণা করা যায়।

ভদ্রমহোদয়গণ, এখন আপনাদের ঐ সময়টিতে অরবিন্দের মত ও পথ কি ছিল তা পর্যবেক্ষণ করতেই হবে। এই পর্যবেক্ষণের জন্য ১৯০৫ সালের ১৩ই অগস্ট তারিখে অরবিন্দের স্ত্রীকে লেখা চিঠিখানি (যে চিঠিখানি পুলিস অরবিন্দকে ধরবার দিন সংগ্রহ করে) আপনাদের সামনে নিবেদন করবো। সেই সময়ে বারীন বরোদায় অরবিন্দের কাছে ছিল।

আমি ইতিপূর্বে অরবিন্দের লেখা ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসের

চিঠির অংশ উদ্ধৃত করে আপনাদের দেখিয়েছি যে অরবিন্দ বারীনের মতিগতির প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছে এবং এই অক্টোবর মাসেও বারীন বরোদায় ছিল। আরো দেখা যাক, ঐ সময়ে অরবিন্দের একান্ত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল, যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাবে বাঙলায় লেখা এই চিঠিখানিতে (প্রামাণ্য নথি নম্বর ২৮৬।১ এবং ২৮৬।২)। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে যে, ঐ সময়ে অরবিন্দের বাঙলা ভাষায় খুব বেশি দখল ছিল না। তার বাঙলা ছিল সংস্কৃত ভাষাশ্রয়ী। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের নিশ্চয় 'অন্ধ রাজার মহিষী' কথাটি মনে আছে। এই কথাটি 'রাণী গান্ধারী'র পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে—গান্ধারী তাঁর স্বামী অন্ধ-রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্বের সমব্যথী হবার জন্য নিজে সব সময়ে চোখ বেঁধে রাখতেন। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা দেখুন যে, এই চিঠিতে অরবিন্দ নিজেকে পাগল (যে আপন ভাবে বিভোর) বলে বর্ণনা করেছে এবং নিজের স্ত্রীকে তার চলার পথ স্থির করতে বলেছে। এই প্রসঙ্গে অরবিন্দ 'গান্ধারী'র কথা উল্লেখ করে এই আশা করেছে যে তার স্ত্রীর দেহে যখন হিন্দু-রক্ত রয়েছে তখন সে হিন্দুধর্মের আদর্শ অনুযায়ী স্বামীর অনুসৃত পথেরই অনুগামিনী হবে। ঐ চিঠিতে অরবিন্দ তার জীবনের গতিপথের যে বর্ণনা দিয়েছে সেই পথ তখন সে একনিষ্ঠভাবেই অনুসরণ করছিল। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নাম মাত্র অর্থ নিজের রেখে সে তার উপার্জিত অর্থের বাকি সবটাই দেশের কল্যাণে দান করতো। তার জীবনের প্রথম মহান আদর্শের উল্লেখ করে সে এই পত্রে লিখেছিল—তার উপার্জিত অর্থের বিধি-নিযুক্ত অছি হিসাবে তার কর্তব্য, বেঁচে থাকার জন্য যে সামান্য অর্থের প্রয়োজন কেবল সেইটুকু গ্রহণ করে বাকী অর্থ বিধি-নির্দিষ্ট কাজে ব্যয় করা। কি ভাবে ব্যয় করা হবে ? ব্যয় হবে বিধি-আদিষ্ট কাজের মাধ্যমে—ক্ষুধিতের সেবায়, দীন-দুঃখী, দরিদ্র-নারায়ণের সেবায়। এই পথে চললে তবেই বিধি-ঋণে আবদ্ধ মানুষ বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারবে প্রত্যর্পণের মাধ্যমে।

এই পথ অনুসরণ না করলে মানুষ তস্কর-বৃত্তির পরিচয় দেবে। এই পথ তার নিজের কামনা-বাসনা জড়িত স্বার্থসিদ্ধির পথ নয়। সে নিজের জন্য নামমাত্র অর্থ রেখে বাকীটুকু দেবসেবায় প্রত্যর্পণ করতো।—যা আপনারাও প্রত্যর্পণ করতে পারেন গোপন দানের মাধ্যমে, ক্ষুধিতের অন্ন সংস্থানের কারণে, নিঃস্ব ব্যক্তির প্রয়োজনের জন্যে।

তার জীবনের দ্বিতীয় মহান আদর্শের উল্লেখ করে সে লিখেছিল —নিজের জীবনে ঈশ্বর দর্শনের সম্ভাবনা সম্পর্কে তার দৃঢ়বিশ্বাস— এই দর্শন করা অর্থে চোখে দেখা নয়, হিন্দুধর্ম অনুযায়ী নিজের মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপলব্ধি। মানুষ সাধনার দ্বারা স্বীয় চেতনার অবলম্বনেই সেই সৎ ও আনন্দময় চেতনার সান্নিধ্য লাভ করে। এটা ছিল তার জীবনের দ্বিতীয় আদর্শ। এই প্রসঙ্গে সে অধ্যাত্ম উপলব্ধির দীক্ষার জন্য গুরুর প্রয়োজন সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছিল। কারণ, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা নিশ্চয় জানেন যে, কোনো হিন্দু যখন গুরুর নির্দেশে মন্ত্র-দীক্ষা নেয় তখন সমস্ত ব্যাপারটি তাকে গোপনীয় রাখতে হয়। এই গোপনীয়তা শাস্ত্রের নির্দেশ। গুরুর আদেশ ব্যতীত ব্যাপারটি, এমন কি, নিজের স্ত্রীর কাছেও গোপনীয় রাখতে হবে। পত্রে লেখা ছিল, "যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে" অর্থাৎ যে ভাবে সাধনা করলে ঈশ্বর দর্শন সম্ভব— যে ঈশ্বর তার অন্তর্লোকে আসীন—সেই সাধনার পথ কোনো এক ব্যক্তি অরবিন্দকে দেখিয়ে দিয়েছে। সেই নির্দিষ্ট পথে সাধনার অভ্যাস অরবিন্দ তখন করছিল। এই সব পত্রালোচনা থেকে বুঝা যায় যে, সে তার স্ত্রীকে নিজের সাধন পথের উপযুক্ত সহায়িকারূপে গড়ে নিতে চেয়েছিল।

তারপর সে লিখেছিল যে গুরু-নির্দিষ্ট পথে চলবার পর "এক মাসের মধ্যে অনুভব করিলাম, হিন্দু ধর্মের কথা মিথ্যা নয়, যে-যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি,.....সেই পথে সিদ্ধি সকলেরই হইতে পারে"। ".....সেই পথে প্রবেশ

সম্পূর্ণ তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই পথে প্রবেশ করা প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভব"। অরবিন্দ এ কথাও লিখেছিল যে, "কেহ তোমাকে ধরিয়া নিয়া যাইতে পারিবে না, যদি মত থাকে তবে ইহার সম্বন্ধে আরও লিখিব"। আমি আপনাদের এই বিষয়টি মনে রাখতে অনুরোধ করছি কারণ অরবিন্দের পরবর্তী পত্রে এই সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে—যে আলোচনার সূত্র আমার বিজ্ঞ বন্ধুবর তাঁর সওয়ালে উল্লেখ করেছেন।

চিঠিতে অরবিন্দ তার তৃতীয় মহান আদর্শের কথাও উল্লেখ করেছে। এই তৃতীয় আদর্শটি ছিল তার স্বদেশ প্রেমের মূল কথা। এই আদর্শও বেদান্তের ভিত্তিতে গঠিত। আপনারা জানেন যে, বেদান্তের মতে এই বিশ্বচরাচর ঈশ্বরের অভিব্যক্তি—নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ প্রকাশ। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি এই দৃশ্যমান জগৎকে দেবলীলার প্রকাশরূপে উপলব্ধি করতে পারছেন, নিজের দেশকে সেই দিব্যশক্তির প্রতিমূর্তি হিসাবে উপলব্ধি করতে পারছেন, ততক্ষণ সব কিছুই অসার অনিত্য—যতদিন এই যোগসূত্রটির উপলব্ধি না আসে,—এখানে বিশ্ব প্রকৃতি ও পরমাপ্রকৃতির মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগসূত্রটির উপলব্ধির কথাই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু যখন আপনার উপলব্ধি আসবে যে, বিশ্ব প্রকৃতি পরমা প্রকৃতি থেকে ভিন্ন নয়, এগুলি সেই একেরই ভিন্ন রূপ—সেই নির্গুণ, নিরাকার, নিরক্ষর ব্রহ্মের প্রকাশ, তখনই আপনার অজ্ঞানতার অবসান হবে, দিব্যজ্ঞান আসবে—যা চিরন্তন সত্য চৈতন্য। আপনারা দেশকে কি ভাবে দেখেন? দেশ বলতে কতকগুলি নদী, মাঠ, পর্বত বুঝায় না। অরবিন্দের দৃষ্টিতে দেশমাতৃকা সেই অব্যক্ত পরমা-প্রকৃতির মাতৃরূপ—যা হিন্দুধর্ম অনুযায়ী দিব্যশক্তিরই একটি অপরূপ রূপ। অরবিন্দের স্বদেশপ্রেমের সারাংশ অনুযায়ী, "দেশকে মা বলে জানবে, ভালবাসবে, পূজা করবে তবেই দেশের মধ্যে সেই দিব্য শক্তির মাতৃরূপ উপলব্ধি করতে পারবে।" দেশপ্রেম এমনি হবে যার মধ্যে দিয়েই দিব্য শক্তির মাতৃরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। যিনি বেদান্তে বিশ্বাসী তাঁর কাছে অরবিন্দের এই আদর্শের সারমর্ম বুঝে ওঠা মোটেই

কষ্টকর নয়। এই হোলো তার স্বদেশ প্রেমের মূল বক্তব্য। স্বদেশের দিব্য সত্তাকে আপনাদের বুঝতে হবে। অরবিন্দের চেতনায় সার্বভৌম মানবিকতা ব্যতিরেকে জাতীয়তাবাদের কোনো অস্তিত্বই থাকতে পারে না। সমগ্র জাতির মধ্যে এই সচেতনতা না জাগলে মানবিকতার আদর্শে বা লক্ষ্যে কখনও পৌঁছানো যাবে না। আমি 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার একটির পর একটি প্রবন্ধ থেকে দেখাতে পারবো যে ব্যক্তি-গত জীবনের প্রকাশ যেমন সমাজ-ভিত্তিক, তেমনি জাতীয় জীবনের প্রকাশ মানবিকতা-ভিত্তিক—এ ছাড়া ঐ সম্পর্কীয় সমস্ত উন্নত চিন্তা-ধারাই সম্পূর্ণ অর্থহীন। অরবিন্দ দেশকে মা বলে জানতেন এবং ভালবাসতেন। আমি ইতিপূর্বেই বুঝিয়েছি যে দেশমাতা জগন্মাতারই এক অপরূপ অভিব্যক্তি।

অতঃপর অরবিন্দ সেই "পতিত জাতিকে উদ্ধার করা" বা পূর্ণ-স্বরাজ লাভ করা সম্পর্কে ঐ অনুচ্ছেদের সব শেষে লিখেছে, "কার্য সিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে তাহা আমি বলিতেছি না,—কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই"। "মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্ত পানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে?" এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে অরবিন্দের নিজস্ব যুক্তি কৌতূহল উদ্দীপক। "যে ছেলের বন্দুকও নেই, তরবারিও নেই সেই ছেলে কি করবে"—তা সে লিখেছে। তার নিজের মনের প্রশ্নের জবাব সে নিজেই দিয়েছে, কি-ভাবে সে জাতিকে উদ্ধার করতে চায়। "আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল।" আমার বিজ্ঞ বন্ধুবর তাঁর সওয়ালে যুক্তি দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, অরবিন্দ তার দলের উপদেষ্টা ছিল এবং তার আদেশ বা উপদেশ অনুযায়ী তার অনুগামী বা সমর্থকরা বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতো। এখন আপনারাই বলুন যে, এই সব চিঠিতে ঐ ধরনের কথা কোথায় আছে? আমার বিজ্ঞ বন্ধুবরের যুক্তি বলেছিল—এই চিঠি-পত্রের আলোচ্য বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে আপনারা সিদ্ধান্তে আসতে

পারবেন যে অরবিন্দ অপরাধী। তাহলে চিঠিপত্রগুলি ভালভাবে আপনাদের পড়তে হয়। আমার বন্ধুবরের মনোমত যুক্তি অনুযায়ী অরবিন্দ বলতে চেয়েছিল যে নিজে ব্রহ্মতেজ প্রয়োগ করবে এবং অন্যদের ক্ষত্রতেজ প্রয়োগ করাবে। এই চিঠিগুলি পড়লে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারবেন যে, অরবিন্দ ক্ষত্রতেজের বিরোধী মতবাদই প্রচার করেছে। সে একমাত্র ব্রহ্মতেজেই নির্ভরশীলতা প্রকাশ করেছিল। সে বলেছিল যে একমাত্র ব্রহ্মতেজের উপর এই দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণী-রূপের বুনিয়াদ গড়ে উঠবে। আমি স-সম্মানে আপনাদের নিবেদন করতে চাই যে আমার বন্ধুবরের সওয়ালের ইঙ্গিত—"অরবিন্দ বন্দুক এবং তরবারিতে আস্থাবান"—সম্পূর্ণ অবাস্তব। যে কেউ তার চিঠিগুলি পড়লেই সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন —অরবিন্দ শারীরিক বলের ইঙ্গিত দেয়নি, দেশের ভাবী কল্যাণী রূপের জন্যে সে চরিত্রবল বা জ্ঞান-বলের উন্মেষের প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দিয়েছে। অরবিন্দ বলেছে, "ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত"। সেই তেজের উপর আস্থা রাখ। সেই পথেই মুক্তি আসবে। কিন্তু আমার বন্ধুবরের সওয়াল-যুক্তিতে অরবিন্দের বাক্য-রচনায় যে ভাব আরোপ করা হয়েছে সেই ভাবার্থের অনুমোদন আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

পত্রের যে অংশে লিখিত আছে, "মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে?" এই অংশটি উল্লেখ করে কৌঁসুলী সাহেব বলেছেন—এই কথার অর্থ কি? এটা একটা উপমা মাত্র। তিনি বলেছেন—অরবিন্দ বলেছে যে, সে তার দেশকে কেবল মাঠ, পাহাড়, বন, ইত্যাদির সমষ্টি বলে মনে করে না, তার কাছে দেশ মায়ের মতন। তারপর সে বলেছে যে দেশ এখন পরাধীন। এর পরে সে একটা রূপকের সাহায্যে দেশবাসীকে চুপচাপ বসে না-থেকে তার আদর্শ ও লক্ষ্যে উপনীত হতে অনুরোধ করেছে। চিঠিখানি ছেপে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি, এটা তার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে লিখিত 'খোলা চিঠি' নয়—

চিঠিখানি তার নিজের স্ত্রীকে লেখা। কিন্তু এই লেখা থেকে কি এটাই বুঝতে পারা যায় না যে, তাদের দেশের অবস্থা খুব শোচনীয়, দেশের স্বাধীনতা অনেক দূরে, দেশ এখন পরাধীন? সুতরাং দেশের মুক্তির আদর্শ সম্বন্ধে প্রতিটি ভারতবাসীকে সচেতন হতে হবে। অরবিন্দের দেশপ্রেমের মূল কথা—দেশ তার কাছে দেশ মাতৃকা—মায়ের মতন। তার কাছে দেশ একটা জড়বস্তু নয়, দেশ দিব্য-সত্তার একটি অপরূপ অভিব্যক্তি। তার মূল বক্তব্য ছিল—দেশমাতাতেই জগন্মাতার প্রকাশ। সেই দেশের পুনর্জাগরণ আনতে হবে চারিত্রিক বল ও জ্ঞানের বলের মাধ্যমে—দৈহিক বল প্রয়োগের পথে নয়। পরের অনুচ্ছেদে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে লেখা হয়েছে।

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা বুঝতে চেষ্টা করুন যে, "স্ত্রী স্বামীর শক্তি" এই কথাগুলির সাহায্যে সে কি বলতে চেয়েছে। অরবিন্দের চিন্তা অনুযায়ী দিব্য-সত্তা একটি শক্তি এবং এই ভাব অনুযায়ীই সে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে দেখেছে এবং বলেছে যে, "স্ত্রী হচ্ছেন শক্তি"। এই চিন্তার মাধ্যমে সে পুরুষ ও স্ত্রীর উন্নততম যোগসূত্র সম্পর্কে তার চিন্তাকে প্রকাশ করেছে। "তুমি উঁহার শিষ্য হইয়া সাহেব-পূজার মন্ত্র জপ করিবে?"—এই কথার উল্লেখ করে কৌঁসুলী সাহেব বলেছেন যে, অরবিন্দের জিজ্ঞাস্য ছিল—"তার স্ত্রী কি পাশ্চাত্য আদর্শের পূজারিণী হবে? অর্থাৎ এই কথার মাধ্যমে অরবিন্দ যেন পাশ্চাত্য আদর্শের অনুগামীদের অবজ্ঞা করতে চেয়েছে।

"এই ছিল সেই গোপনীয় কথা"—অরবিন্দ তার চিঠিতে গোপনীয় কথাগুলি লিখে তারপর তার স্ত্রীর সহযোগিতা চেয়েছে। সে তার স্ত্রীকে বলেছে, ভগবানের আশ্রয় নাও তা হলেই সব কিছু বুঝতে পারবে। এই চিঠিতে তার স্ত্রীর স্বভাবের একটি দোষের কথা উল্লিখিত আছে, যে দোষ অরবিন্দের মতে—কালের দোষ। কারণ অরবিন্দ পরে লিখেছে, "লোকে গম্ভীর কথাও গম্ভীরভাবে শুনিতে পারে না; ধর্ম, পরোপকার, মহৎ আকাঙ্ক্ষা, মহৎ চেষ্টা,

দেশোদ্ধার, যাহা গম্ভীর, যাহা উচ্চ ও মহৎ, সব নিয়ে হাসি ও বিদ্রূপ, সবই হাসিয়া উড়াইতে চায়"।

মহামান্য ধর্মাবতার, আমি ১৯০৫ সালের ৩০শে অগস্টের চিঠির কথা উল্লেখ করছি। আমার নিবেদন, ঐ চিঠিতে এমন কিছুই লেখা নাই যার ভিত্তিতে অরবিন্দের শারীরিক বল প্রয়োগ সম্পর্কে মন্তব্য করা যায়। বরং অরবিন্দ যে ব্রহ্মতেজের উপর আস্থাবান ছিল—একথা বুঝতে পারা যায়। পরবর্তী সময়ে সে যে সব সময়েই এই ব্রহ্মতেজের উল্লেখ করে গেছে, তা আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন। সে এমনি একজন মানুষ যে বিশ্বাস করে—সনাতন হিন্দু ধর্মের আদর্শ অনুযায়ী ব্রহ্মতেজের বিকাশ সাধনেই ভারতবর্ষের মুক্তি সম্ভব। এখন আপনিই স্থির করুন—এই মানুষটির আন্তরিক ইচ্ছাটি কি ছিল? অরবিন্দের ঐ বিশ্বাসটি হচ্ছে তার রাজনৈতিক দর্শনের অন্তর্নিহিত সত্য। এই প্রসঙ্গে আপনি ভেবে দেখুন যে কোনো সরকার, রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র, জনগণের আস্থাভাজন না হলে স্থায়ী হতে পারে না। এই ধ্রুব সত্যটি নীতিবিদ্ হব্স থেকে স্পেন্সার ও তাঁদের পরবর্তীকালেও স্বীকৃত হয়েছে। যখন কোনো সরকার স্থায়ী হয় তখন দেখা যায় যে সেই সরকার জনগণের আস্থা-ভাজন হয়েছে। অরবিন্দ প্রচার করেছে—যাদের মধ্যে ব্রহ্মতেজের বিকাশ ঘটেছে, দেশের মুক্তি তারাই আনবে। সে প্রচারকের ভূমিকা নিয়েছিল কারণ প্রথমত সে বিশ্বাস করতো—যতদিন পর্যন্ত না জনমানসের রূপান্তর হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত অভীষ্ট লাভ হতে পারে না। সে বারবার অবিচল আস্থা নিয়ে বলেছে—মোক্ষলাভ একটি জন্মে আসবে না—মোক্ষলাভের জন্যে জন্ম জন্মান্তরের একাগ্র সাধনা প্রয়োজন। কিন্তু সেই অভিষ্ট সিদ্ধ হওয়ার জন্য মানুষকে ব্রহ্ম বিদ্যাপরায়ণ হতেই হবে। এবং এই ধরনের ব্রহ্মনিষ্ঠ মানুষের বা শিক্ষিত মানুষের সম্মতির বিরুদ্ধে কোনো সরকার বা শাসকগোষ্ঠীর শাসনের অস্তিত্ব স্বভাবতঃই লোপ পাবে।

সে কলকাতায় এসে কি কি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল? সে জাতীয়

শিক্ষার ভার নিয়েছিল। বন্দী হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত তার কর্মজগৎ জুড়ে ছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন। এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে সফল করবার জন্যে সে তার সমস্ত পার্থিব সুখ বিসর্জন দিয়েছিল। সে জাতীয়-শিক্ষা-উপদেশক সংস্থায় যোগ দিয়ে সেখানে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় কর্মরত ছিল। সে স্বদেশী শিল্পের প্রসার এবং বিদেশী পণ্য বর্জন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই আন্দোলন প্রসঙ্গে তার বিশ্বাস ছিল যে, দেশবাসীর স্বদেশপ্রীতির চেতনা উন্মেষিত হওয়ার জন্যে তাদের অবশ্যই দেশের শিল্পের প্রতি আগ্রহী হতে হবে। তার স্বদেশী শিল্পের প্রসার নীতির সমর্থনের পিছনে দেশের শিল্প-সমৃদ্ধির বিকাশ সাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। আমি ঐ আন্দোলনের সঙ্গে অরবিন্দের যোগাযোগকে শিল্প-সমৃদ্ধির সূত্রে গ্রথিত করতে নারাজ। আমি এই কথাই বলবো যে অরবিন্দের সব কিছু আন্দোলনের বুনিয়াদ ছিল সেই জাতীয়তাবাদের মন্ত্র-সিঞ্চিত যার উৎস ছিল বেদান্ত সূত্রে নির্দিষ্ট ভারতের সনাতন ধর্ম। তার স্বদেশী শিল্পের প্রসার ও তৎসহ বিদেশী পণ্য বর্জন নীতি, এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি—এই দুইয়ের পথনির্দেশক উপদেশাবলী মূলতঃজাতীয়তাবাদ উদ্দীপক মন্ত্র হিসাবেই গ্রাহ্য ছিল, এ ছাড়া এই দুটির কোনো সঙ্কীর্ণ অর্থই নিরর্থক। এই পথেই অরবিন্দ চলতো। এই সম্পর্কে বিভিন্ন প্রামাণ্য তথ্য নিয়ে আলোচনা করবার আগে আমাকে আপনারা এমনি দু'টি চিঠি উল্লেখ করবার অনুমতি দিন যে-চিঠিগুলি এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করবে। এই চিঠি দুটির একটি ১৯০৫ সালে ৩০শে অগস্ট লেখা এবং অপরটি ১৯০৭ সালে ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লেখা। এইখানে আমি ১৯০৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে লেখা একটি চিঠির কথাও উল্লেখ করবো, যেটি আমার বিজ্ঞ বন্ধুবর উল্লেখ করেননি। প্রথমে এই চিঠিটি শুনুন: (বাংলা ও পরে ইংরাজি তর্জমা)—

"২৩, স্কট্ লেন, কলিকাতা।

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭

"অনেক দিন চিঠি লিখি নাই,...। ৮ই জানুয়ারি আসিবার কথা ছিল, আসিতে পারি নাই, সে আমার ইচ্ছায় ঘটে নাই। যেখানে ভগবান নিয়া গিয়াছেন সেইখানে যাইতে হইল। এইবার আমি নিজের কাজে যাই নাই, তাঁহারই কাজে গিয়াছিলাম।"

এই চিঠির উপর কৌঁসুলী মন্তব্য করেছেন—চিঠির উক্তিই প্রমাণ করে যে, অরবিন্দ অন্যত্র গিয়েছিল। বিভিন্ন সাক্ষী জেরার উত্তরে এই যাওয়ার বিষয়টি সমর্থন করেছে। অরবিন্দের বক্তৃতাগুলিও তার মত ও পথের নির্দেশ—আগের চিঠির সঙ্গে কোনো সঙ্গতি না রেখে দিয়েছে। এখন আমার নিবেদন এই যে অরবিন্দ যে কাজই করে থাকুক না, তা ছিল ধর্ম-সম্মত। আমার বিজ্ঞ বন্ধুবর বোধহয় ভেবেছিলেন যে অরবিন্দ স্বীয় বক্তব্যে নিজেকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত দেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু অরবিন্দ তার বক্তব্যে বলেছে যে, "আমার সব কাজ, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক, অথবা অন্য কিছু", সব কিছুই বিধি-নির্দিষ্ট, দৈব-বাণীর রূপায়ণ। রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে তার যোগাযোগ সে নিজেই স্বীকার করেছিল। আমার বিজ্ঞ বন্ধুবরের অরবিন্দকে ভুল বুঝবার এক অত্যাশ্চর্য প্রতিভা আছে। আর একটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপারের উল্লেখ পাওয়া যায় আমার বিজ্ঞ বন্ধুবরের সওয়ালে। অরবিন্দের চিন্তাধারা কি ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল তা বোঝাতে গিয়ে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলেন যে, "মিষ্টান্নের চিঠি" পাবার পর অরবিন্দের মত ও পথে পরিবর্তন এসেছিল। তিনি তাঁর ইচ্ছামত এই চিঠিখানির কথা উল্লেখ করে দেখান যে অরবিন্দ আগাগোড়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তিনি যে কথাগুলির উল্লেখ করেছেন "মিষ্টান্নের চিঠি" প্রসঙ্গে—সেগুলি দিয়ে অরবিন্দের এই বিচিত্র পরিবর্তনকে প্রমাণ করা যুক্তিযুক্ত নয়।

এর পরে কৌঁসুলী সেই আগের চিঠির কিছুটা পড়েন, যেখানে অরবিন্দ লিখেছে, "আমার এইবার মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে...আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে ভগবান আমাকে নিয়া যাইবেন সেইখানে পুতুলের মত যাইতে হইবে, যাহা করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে।" মাননীয় ধর্মাবতার, আপনি দেখবেন যে, অরবিন্দের বিশ্বাস উত্তরোত্তর দৃঢ় হয়েছে। এই প্রসঙ্গে হিন্দু চিন্তাধারা আপনার অজানা নয়। মাননীয় ধর্মাবতারের কাছে, প্রসঙ্গত, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং অন্যান্য মহাপুরুষদের বাণী উল্লেখ করবো। কোনো কাজের কর্তা রূপে নিজেকে ভাবা হিন্দুধর্মের নীতি-অনুগ নয়, কারণ হিন্দু ধর্মে বলে—"তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র"। অর্থাৎ (হে ঈশ্বর) তুমি সকল কাজের কর্তা, আমি তোমার আদিষ্ট কাজের কারণ বা যন্ত্র। এই চিন্তাধারার ভিত্তিতেই অরবিন্দ ৩০শে অগস্ট তার স্ত্রীকে লিখেছিলো—"এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন।"

চিত্তরঞ্জন এই সময় দেব ভাষায় বলেন—'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'—এবং এর ইংরাজি অনুবাদ করে শোনান। এই ধরনের চিন্তাধারার মধ্যে বোমার ইঙ্গিত আছে কি ? এই চিন্তাধারা অরবিন্দের আধ্যাত্মিক চেতনা প্রস্ফুরণের ইঙ্গিত দেয়। অরবিন্দ আরো লিখেছিল—"তুমিও ভগবানের করুণা লাভ করিবে"। "তিনি তোমাকেও পথ দেখাইবেন"। এইগুলি কি তার স্ত্রীকে ষড়যন্ত্রের লিপ্ত হওয়া এবং বোমার আঘাতে ইংরেজদের হত্যা করার ইঙ্গিত দেওয়া ? স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীকে ধর্ম পালনে সহায়তা করা। অরবিন্দ সেই হেতু সহধর্মিণী কথাটি চিঠিতে ব্যবহার করেছিল। সে তার স্ত্রীকে হিন্দু আদর্শ অনুযায়ী সহধর্মিণীরূপে দেখেছিল। আমার মতে এই পরিণত চিন্তাগুলিই অরবিন্দের

অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের স্ফুরণসূচক। স্ত্রী স্বামীর সাধনার একান্ত সহকারী। অরবিন্দের কথায়—"রোজ আধ ঘণ্টা ভগবানের ধ্যান করিতে হয়, তাঁর কাছে প্রার্থনারূপে বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হয়।···তাঁর কাছে সর্বদা এই প্রার্থনা করিতে হয়—আমি যেন স্বামীর জীবন, উদ্দেশ্য, ও ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে ব্যাঘাত না করিয়া সর্বদা সহায় হই, সাধনভূত হই।"

"এই পত্র কাহাকেও দেখিতে দিবে না, কারণ যে কথা বলিয়াছি, সে অতিশয় গোপনীয়।" চিত্তরঞ্জন বলেন—হিন্দু ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের সময় মন্ত্র গোপনে দেওয়া হয় এবং গুরুর অনুমতি ছাড়া অপর কোনো ব্যক্তির, এমন কি স্ত্রীরও জানা নিষিদ্ধ। অরবিন্দ লিখেছিল "গোপনীয়"—এই লেখার অর্থ জটিল হলেও এর অর্থ একটিই হয় এবং দ্বিতীয় কোনো অর্থ আরোপ করা অনভিপ্রেত। "তোমাকে ছাড়া কাহাকেও বলি নাই, বলা নিষিদ্ধ"। কিন্তু কেন এই নিষেধ? এটা যদি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত কোনো নির্দেশ হোতো তাহলে সেটা তো ষড়যন্ত্রকারীদের জানবারই কথা—তাহলে অরবিন্দ "নিষিদ্ধ" বললে কেন? সরকারী তর্জমা অনুযায়ী, "এই কথা জানানো নিষেধ"। আমার নিবেদন, ঠিক তর্জমা হয়নি। ঠিক তর্জমা হবে, "জানানো অনুমতি সাপেক্ষ' (গুরুর অনুমতি সাপেক্ষ)। ৩০শে অগস্টের চিঠিখানি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ অরবিন্দ বৈষয়িক ব্যাপারগুলি সরোজিনীকে লেখা হয়েছে বলে ঐ চিঠিতে উল্লেখ করেছিল। কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে অরবিন্দ নিশ্চয় মন্ত্র দীক্ষা নিয়েছিল এবং সে তার স্ত্রীকে এই দীক্ষায় দীক্ষিত করবার জন্যে উদ্‌বিগ্ন ছিল।

বারীন ১৯০৫ সালে বরোদায় গিয়েছিল। সরকারী কৌঁসুলী সাহেবের মতে—এই সময়েই বিপ্লবের বীজ বপন করা হয়েছিল। ২৮৬।৩ নম্বর নথিভুক্ত প্রামাণ্য চিঠিখানি অরবিন্দের কলিকাতায় বাস শুরু হওয়ার আগে লিখিত। এই চিঠি থেকে প্রথমত বুঝতে পারা যায় যে, সেই সময়ে অরবিন্দ কলকাতার রাজনীতি-চক্রের সঙ্গে

জড়িত ছিল না বা ঐ ব্যাপারে আগ্রহীও ছিল না। সে বাংলার রাজনীতি সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল ছিল না, অবশ্য স্বদেশী আন্দোলন ব্যতিরেকে, কারণ স্বদেশী আন্দোলন তখন ভারতের সর্বত্র সুবিদিত। চিঠিতে আরো লিখিত ছিল, "আমাকে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য যথেষ্ট ব্যয় করতে হয়েছে। আমার মনে আর একটি আন্দোলনের পরিকল্পনা রয়েছে যার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন"।

কিন্তু এই পরিকল্পনার আন্দোলনটি কিসের? সরকারী কৌঁসুলী সাহেব বুঝিয়েছেন যে ঐ আন্দোলনটিই আমাদের আলোচ্য আন্দোলন—রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের আন্দোলন। কিন্তু এর অস্তিত্ব তখন কোথায়? ১৯০৫ সালে কি এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল? সুতরাং আমার মতে, অরবিন্দের সেই পরিকল্পনার আন্দোলন বোমার আন্দোলন নয়, সেই আন্দোলন ছিল জগৎ-ব্যাপী বেদান্ত-দীক্ষার আন্দোলন। অরবিন্দের ইচ্ছা ছিল দেশ ছেড়ে বিশ্বময় বেদান্তের বাণী প্রচার করবার। অরবিন্দ নিজে একজন বৈদান্তিক এবং তার কর্মধারা ছিল বেদান্তভিত্তিক। তাই সে বেদান্তের সূত্র ও সিদ্ধান্তের নির্দেশ অনুযায়ী ধর্ম সংরক্ষণের ব্রত গ্রহণ করেছিল। এটা প্রহসন নয়—কারণ আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডে ইতিমধ্যেই বেদান্তবাদের ঢেউ গিয়ে পৌঁছেছে—অবশ্য ইংলণ্ডে অপেক্ষাকৃত কম। তাছাড়া আমার বিজ্ঞ বন্ধু তাঁর সওয়ালে বলেছেন—যে সময়ে এই চিঠিখানি লেখা হয়েছিল তার কিছুদিন বাদেই কলকাতায় বোমার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। যেখানেই আমার বন্ধুবর "আন্দোলন" কথাটি পেয়েছেন সেখানেই উনি সেটিকে বোমার আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মাননীয় ধর্মাবতার, আমি এই চিঠির বিষয়ে আর কিছু উল্লেখ করে আপনাকে বিরক্ত করার প্রয়োজন দেখি না।

পরবর্তী প্রশ্ন আসবে—অরবিন্দের কলকাতায় বসবাস করা শুরু হওয়ার পর। সে ১৯০৬ সালের মে মাসে কলকাতায় আসে এবং আবার বরোদায় ফিরে যায়। এই (দিন বা সময়) প্রসঙ্গটি খুবই প্রয়োজনীয় তথ্য। এই দেখুন, (২৯২। ৬ নথিভুক্ত প্রমাণ) ৮ই জুন

তারিখে অরবিন্দের শ্বশুরমহাশয়কে লেখা চিঠি। চিঠিখানি কলকাতা থেকে লেখা। চিঠিতে লেখা আছে ঃ "আপনি মৃণালিনীকে কলকাতায় পাঠাতে আগ্রহী হয়ে থাকলে পাঠিয়ে দিন, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। বারীন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি মনে করি যে, বায়ু পরিবর্তনের জন্যে সে শিলংয়ে যাক্। যদি সে যায় তাহলে নিশ্চয়ই আপনি তাকে দেখাশোনা করবেন—আমি সে বিষয়ে নিশ্চিত। বারীন একটু অস্থির প্রকৃতির। যে সময়ে তার বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়া এবং স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া উচিত সেই সময়ে তাকে হৈ চৈ করে বেড়াবার জন্যে উন্মুখ দেখা যাচ্ছে। আমি তাকে এই ব্যাপারে নিরস্ত করার বিষয়ে অনভ্যস্ত। যদি আমি তাকে বাধা দিই তাহলে সে আরো বিগড়ে যাবে।" দেখা যাচ্ছে আমার বিজ্ঞ বন্ধুবর এই চিঠির ভাষ্যকার হিসাবে বলেছেন যে—অরবিন্দ ভ্রাতৃস্নেহপ্রবণ ছিল।

৭ই জুলাই তারিখে অরবিন্দ (দেখা যাচ্ছে) বরোদায় ছিল। এবং ৬ই জুলাই থেকে অগস্ট মাস পর্যন্ত এমন কোনো চিঠি নেই যা এ সম্বন্ধে অবহিত করতে পারে। যদি ১ নম্বর প্রমাণ-সংগ্রহ পুস্তকের ২৫৪ পৃষ্ঠাটি দেখেন তাহলে পৃষ্ঠাটির নিচে দেখতে পাবেন যে, অরবিন্দকে চাকুরিয়া (জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রামাণ্য দলিলের তারিখ ছিল ১লা অগস্ট, ১৯০৬। সুতরাং এই দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, অরবিন্দ ঐ সময়ে কলকাতায় ছিল। ১লা অগস্টের কিছুদিন আগে সে কলকাতায় এসেছিল। সাক্ষী সুকুমার মিত্রও ঐ কথাই বলেছে, অবশ্য তার সাক্ষ্যে তারিখের ব্যাপারটি খুব পরিষ্কার করে বলা হয়নি। সুতরাং এমনও হতে পারে যে অরবিন্দ মে মাসে কলকাতায় আসার পর আর বরোদায় ফিরে যায়নি—এখান থেকেই পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই সময়ে "জাতীয় কলেজ" সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, অরবিন্দ কলেজের অধ্যক্ষ পদ পেয়েছে, এবং এই বছরের অগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়টিকেই আমার বিজ্ঞ বন্ধু

তাঁর সওয়ালে "আন্দোলনের লগ্ন" হিসাবে বিবৃত করে বলেছেন এই সময়েই "বন্দেমাতরম্" পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়; অরবিন্দ নিঃসন্দেহে এই "বন্দেমাতরম্" সংস্থা এবং "ছাত্রভাণ্ডার" নামে অপর একটি সংস্থার উদ্যোক্তা ছিল এবং এইগুলির সঙ্গেই অরবিন্দের কর্মতৎপরতা জড়িত ছিল। কিন্তু আমি প্রমাণ দোব যে, "ছাত্রভাণ্ডার" সংস্থার সঙ্গে অরবিন্দ যুক্ত ছিল না—সে কেবল এই সংস্থার দলিলের একজন সাক্ষী হিসাবে সই করেছিল। সে "জাতীয় শিক্ষা উপদেশক সংস্থা" এবং "বন্দেমাতরম্"—এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই জড়িত ছিল। অবশ্য আমি কখনই মানতে রাজী নই যে, সে "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার সম্পাদক ছিল। তবে নিয়মিত লেখক হিসাবে "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার সঙ্গে তার যোগাযোগ আমি অস্বীকার করবো না।

"ছাত্রভাণ্ডার" প্রসঙ্গে বিজ্ঞ বন্ধুবর বলেছেন যে, এই সংস্থাটি ছিল ষড়যন্ত্রের অন্যতম কেন্দ্র। যেহেতু অরবিন্দ অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী বা অরবিন্দ এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল সেই হেতু "ছাত্রভাণ্ডার" ষড়যন্ত্রের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। এখন আমার জিজ্ঞাস্য—"অরবিন্দ কি ষড়যন্ত্রকারী"? দেখা যায় যে, "ছাত্রভাণ্ডার"-এর সঙ্গে অরবিন্দের ঘনিষ্ঠতার সন্দেহে ষড়যন্ত্রের অভিযোগটি অরবিন্দের উপর আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু এই সংস্থার ব্যবসায়িক অন্তর্ভুক্তির দলিলটি দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, অরবিন্দের নামোল্লেখ হয়েছে দলিলটির অন্যতম সাক্ষীরূপে। বন্ধুবরের মতে, নথি-পত্র অনুযায়ী এটি একটি সীমিত দায়িত্বপূর্ণ সংস্থা বলে মনে হলেও প্রকৃতরূপ প্রচ্ছন্ন রাখবার জন্যেই সংগঠকরা এই দলের আশ্রয় নিয়েছিল।

[নর্টন সাহেব চিত্তরঞ্জনের এই উক্তির প্রতিবাদ করেন—"আমি কখনো বলি নাই।"]

নর্টন সাহেব প্রতিবাদ করায় চিত্তরঞ্জন বলেন—হতে পারে, কারণ আমার স্বল্প বুদ্ধির জন্যে হয়ত আমি আমার বন্ধুবরের বিবৃতি ঠিক মত বুঝতে পারিনি। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, তার পরিকল্পনা

অপ্রকাশ্য রাখবার জন্যেই সংস্থাটিকে সে ঐ রকম একটা রূপ দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সংস্থাটির সর্তাবলীর তিন নম্বর সর্তটি আমি উল্লেখ করছি। এই সর্তটিতে লেখা আছে যে, সংস্থাটি একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানরূপে বিভিন্ন মাল আমদানি, রপ্তানি এবং পাইকারি ও খুচরা মালপত্র ক্রয়-বিক্রয় করবে। দেখা যাচ্ছে যে, "ছাত্রভাণ্ডার" কেবল স্বদেশী পণ্যের বিপণি ছিল না—বাইরে থেকে মাল আমদানি করাও এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য আমদানি বিষয়টি নিয়ে মতান্তর হতে পারে—বিশেষভাবে, অর্থবিনিয়োগ বিষয়ে আমি এই প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাই না। তবে ঐ সর্তটির "ডি" ধারা অনুযায়ী "পাইকারি ও খুচরা মালপত্রের ব্যবসায়ী" কথাটির মধ্যে রাজনৈতিক পরিকল্পনার কোনো আভাস পাওয়া যায় না। এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের নাম গন্ধও নেই। মিস্টার নর্টন মন্তব্য করেছিলেন যে, প্রতিষ্ঠানটি একটি দুরভিসন্ধি গোপন রাখবার উদ্দেশ্যেই গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটির সর্তাবলী থেকে দেখা যায়ঃ প্রতিষ্ঠানটির অংশীদার সীমিত। পরিচালকমণ্ডলীর ইচ্ছা অনুযায়ী নতুন অংশীদার স্বীকৃতি পাবে। দশ নম্বর সর্তে বলা হয়েছে যে, কোনো অংশীদারই নিজের দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নিজের স্বত্ব-স্বামিত্ব ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে না। কিন্তু ছয় নম্বর সর্ত এবং দশ নম্বর সর্তের বয়ান অনুযায়ী স্বাভাবিক অবস্থায় স্বত্ব-স্বামিত্বের ক্রয়-বিক্রয় অনুমোদন-সিদ্ধ। নতুন অংশীদার গ্রহণেও কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। এই সমস্ত উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আমার বিজ্ঞ বন্ধুর ধারণা যে—"ছাত্রভাণ্ডার" একটি দুরভিসন্ধি গোপন রাখবার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আমার বিজ্ঞ বন্ধুবর বলেছেন যে, ছাত্রভাণ্ডারের উদ্দেশ্যই ছিল ষড়যন্ত্রের সাহায্য করা—কারণ প্রতিষ্ঠানটির লভ্যাংশের শতকরা ৪০ ভাগ মাত্র অধিকারীদের প্রাপ্য হিসাবে দেওয়ার পর শতকরা ৩০ ভাগ, জনকল্যাণের নামে, প্রকৃতপক্ষে দুরভিসন্ধিমূলক কাজে ব্যয় করা হোতো।

ধর্মাবতারের নিশ্চয় জানা আছে যে, এই দেশে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলী লভ্যাংশের কিছুটা জনকল্যাণমূলক কাজেই ব্যয় করে থাকেন সম্পূর্ণ সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই। এই প্রথা আপনি ছোটখাট দোকানদারদের মধ্যেও প্রচলিত দেখতে পাবেন—এরা এই দেয় অর্থকে বলে "বৃত্তি"।

[মিস্টার নর্টন এই সময়ে প্রশ্ন করেন—"এর কোনো প্রমাণ এখানে আছে?"]

এই মামলার নথিপত্রে এর কোনো প্রমাণ না থাকলেও এটা এই দেশে একটি অতি প্রচলিত রীতি এবং সেই জন্যেই আমি এখানে এর উল্লেখ করছি। ধর্মাবতার নিশ্চয় তাঁর এজলাসে অন্য মামলায় এই ধরনের নজির পেয়ে থাকবেন। "বৃত্তি" দান করবার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন—সাধারণত প্রতিটি জিনিস বিক্রি করবার পর তারা অন্তত একটা পয়সা বৃত্তির জন্যে আলাদা করে রাখে। আপনার নিজের ঘোড়া অপটু হয়ে গেলে আপনি ঘোড়াটিকে সোদপুরের যে খোঁয়াড়ে পাঠিয়ে দেবেন—সেই প্রতিষ্ঠানটিতেও এই রীতির প্রচলন আছে।

আমার নিবেদন এই যে, ছাত্র ভাণ্ডারের আসল রূপটি ঢেকে রাখবার যদি সত্যিই কোনো উদ্দেশ্য থাকতো তাহলে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরা সীমিত দায়যুক্ত প্রতিষ্ঠান করবেন কেন? তাঁরা মালিকানা স্বত্ব নিয়েই প্রতিষ্ঠানটি গড়তে পারতেন। যাই হোক, এই প্রতিষ্ঠানটির গঠনের বৈশিষ্ট্য থেকে মোটেই প্রমাণ হয় না যে, তাঁরা তাঁদের লভ্যাংশ কোনো দুরভিসন্ধিমূলক কাজে ব্যয় করতেন। এই ধরনের কোনো অসদুদ্দেশ্য থাকলে তাঁরা অনায়াসেই একটি দোকান খুলতেন—সেখানে হিসাবপত্র থেকে তাঁদের অসদুদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয়ের কোনো প্রমাণ পাওয়া সম্ভব হতো না।

["এই সময়ে মিস্টার নর্টন বলেন—"প্রতিষ্ঠানটির লাভ কোনোদিনই হয়নি।"]

কোনো প্রতিষ্ঠান যদি ব্যবসায়ে লাভ নাই করে থাকে

তাহলে সেখান থেকে অসদুদ্দেশ্যে ব্যয়ের কোনো প্রশ্নই উঠে না। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, সমস্ত ব্যাপারটাই সন্দেহের ভিত্তিতেই বলা হয়েছে—প্রমাণের ভিত্তিতে নয়। "অরবিন্দের দুরভিসন্ধি ছিল"—এই অনুমানের ভিত্তিতে কি করে বলা যায় যে, অরবিন্দ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিল? সে কেবল দলিলের সাক্ষী হিসাবে সই করেছিল। আমি দেখাতে চেয়েছিলাম যে, ছাত্রভাণ্ডারের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে কোনো প্রমাণই পাওয়া যায়নি। ৮৪ নম্বর সাক্ষী পবিত্র দত্ত বলেছে, "আমি সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে সুবোধ মল্লিক ও অরবিন্দ ঘোষকে পেয়ে তাঁদের ঐ দলিলের সাক্ষী হিসাবে সই করাই—কারণ উভয়েই নামী লোক ছিলেন।"

মিস্টার নর্টন এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ছাত্রভাণ্ডারের সঙ্গে অরবিন্দের যোগাযোগ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। পবিত্রের কথামত খুবই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, অরবিন্দকে ও সুবোধ মল্লিককে নামী লোক বিবেচনায় সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাক্ষী হিসাবে নির্বাচন করেছিল। সুবোধ মল্লিক বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজের জন্যে এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। তাঁকে কলকাতার সবাই মহৎ ব্যক্তি হিসাবে শ্রদ্ধা করতো। পবিত্র তার সাক্ষ্যে বলেছে যে, অরবিন্দ সেই সময়ে ১২ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে থাকতো; সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে পবিত্র যেদিন দলিলে সই করাবার জন্যে গিয়েছিল, সেদিন অরবিন্দ সেখানে বসেছিল এবং সুবোধ মল্লিক (অরবিন্দকে দেখিয়ে) পবিত্রকে অরবিন্দের সই নিতে বলেছিলেন ("You better take his signature.")। বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের সম্পর্ক সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে, মিস্টার নর্টন বলেছেন, "অরবিন্দ পত্রিকার সম্পাদক ছিল, কি না,—তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কারণ আমি বলছি যে, অরবিন্দই বন্দেমাতরম্-এর সর্বেসর্বা ছিল। এইবার সুকুমার সেনের সাক্ষ্য (যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে) পড়ে শোনাচ্ছি। ন্যাশানাল কলেজের অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন, "অরবিন্দ কখনও স-হিংস নীতির

প্রচার করেনি—বা করেছে বলে মনে পড়ে না। বন্দেমাতরম্ প্রতিষ্ঠানটি ছিল একটি আদর্শ জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান, ওটা ঠিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছিল না। এই প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসার চেয়ে রাজনৈতিক আদর্শেই অনুপ্রাণিত ছিল।"

আমি যা বুঝেছি তা হোলো—অরবিন্দ বন্দেমাতরম্ প্রতিষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ে এর সঙ্গে যুক্ত ছিল; সে ঐ প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি সভায় উপস্থিত ছিল; এবং সে কখনো পত্রিকাটির ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করেনি। অরবিন্দ কিছু দিনের জন্যে প্রতিষ্ঠানের মুখ্য পরিচালকের দায়িত্ব নিয়েছিল। নথিভুক্ত প্রমাণ নম্বর ৯৫০।ডি উদ্ধৃত করে আমি আপনাদের বলতে চাই যে, অরবিন্দ কোনো সময়েই পত্রিকাটির সম্পাদক বা সহ-সম্পাদক পদে আসীন ছিল না। তার সঙ্গে তারবার্তা গ্রহণ বা পুনর্মুদ্রণ বিভাগীয় কাজকর্মের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। মাননীয় ধর্মাবতারের জ্ঞাতার্থে আমি নিবেদন করছি যে, বন্দেমাতরম্ পত্রিকা অভিযুক্ত হওয়ার জন্য পত্রিকাটিতে "যুগান্তর" পত্রিকার একটি প্রবন্ধের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত বা পুনর্মুদ্রিত হওয়ার ঘটনাই দায়ী ছিল।

[এই সময়ে জজ সাহেব প্রশ্ন করেন সাক্ষী সুকুমার সেন কি বলেননি বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?]

সাক্ষী সুকুমার সেনের সাক্ষ্য অনুযায়ী এইটুকুই জানতে পারা যায় যে, বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক থাকতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বিপিন পাল দায়িত্ব নিয়ে প্রধান সম্পাদক হোতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়ায়—অরবিন্দ ঘোষকেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব করা হয় কিন্তু অরবিন্দ তাতে অসম্মত হয়। কারণ তার পক্ষে সম্ভব ছিল না—সেই সময়ে তার উপর ন্যাশানাল কলেজের অধ্যক্ষ পদের গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। সেই জন্যে দেখা যায় যে, পত্রিকার কেবল একটি সংস্করণেই অরবিন্দ ঘোষের নাম ছিল। পরবর্তী সংখ্যা থেকেই নাম বাদ দেওয়া হয়।

[এই সময় জজ সাহেব বলেন যে, কিছু প্রবন্ধ বা ভাষণ অরবিন্দ ঘোষের কাছে সম্পাদক হিসাবে দেওয়া হয়েছিল।]

অরবিন্দ ঘোষ সম্পাদক আছেন এই অনুমানের ভিত্তিতে কিছু প্রবন্ধ বা ভাষণ তার কাছে পোঁছে দেওয়া হলেও বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ বা ভাষণগুলির কোনোটিই তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়নি। "সম্পাদক" এই আখ্যার মধ্যে কোনো যাদুকরী প্রভাব নিশ্চয় নেই (অর্থাৎ সম্পাদকের নামের ছোঁয়া লেগেই সম্পাদনার কাজ আপনা থেকে বা সম্পাদকের অজ্ঞাতেই হয়ে যাবে)।

মিস্টার নর্টন বলেছেন যে, সম্পাদক হিসাবে অরবিন্দের নাম থাকুক বা নাই থাকুক, তিনি এটার উপর আদৌ গুরুত্ব দিচ্ছেন না, কারণ তিনি জানেন যে, "বন্দেমাতরম্" মানেই অরবিন্দ এবং ঐ পত্রিকার অস্তিত্বই ষড়যন্ত্রের জন্যে। এখন ভালভাবে দেখা যাক যে, ঐ পত্রিকার মধ্যে সাংঘাতিক বিপজ্জনক কিছু ছিল কি না? বা এমন কিছু ছিল কি না, যা বোমা, ষড়যন্ত্র বা রাজদ্রোহিতার ইঙ্গিত দেয়? মহামান্য ধর্মাবতারের কাছে আমি ইতিমধ্যেই যা জানিয়েছি, তার ভিত্তিতে আমি বলতে পারি যে, ঐ ধরনের কোনো ইঙ্গিত দূরের কথা, ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তব্যগুলি মুক্তি-আদর্শের উদ্দীপক ছিল এবং সেগুলির মধ্যে অভীষ্ট লাভ করবার একটিই মাত্র পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেটি হোলো অসহযোগ আন্দোলন। যে আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের শিক্ষা, স্বদেশী এবং (বিদেশী পণ্য) বর্জন নীতিই মুখ্য প্রতিপাদ্য ছিল। ঐগুলির প্রচারই ঐ পত্রিকার বিশেষত্ব ছিল। এ ছাড়া স্বরাজ সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা থাকতো। কিন্তু অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে একটিমাত্র নীতি অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া থাকতো —যা আমি এর আগে অনেকবার বলেছি। এই পত্রিকা (প্রকাশিত বক্তব্যের মাধ্যমে) গুপ্ত সমিতি গঠনের কোনো উপদেশ তো দেয়ইনি উপরন্তু এই বিষয়ে কোনো প্রচেষ্টা পত্রিকার গোচরে আনা হলেই পত্রিকা সে-বিষয়ে প্রতিবাদ-মুখর হয়েছে। আমি কখনো বলিনি যে, "বন্দেমাতরম্"-এর আদর্শ 'পূর্ণ স্বরাজ' ছিল না। 'পূর্ণ স্বরাজ'

প্রতিষ্ঠাই পত্রিকার এক ও অদ্বিতীয় আদর্শ ছিল, এবং এরা— মধ্যপন্থা অবলম্বনে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভার সদস্যরূপে বা বড়লাট সাহেবের উপদেষ্টা সভার সদস্যরূপে বিদেশী সরকারের শাসন কাজে সহায়তা করার ঘোর বিরোধিতা করতো। এ-কথা বারবার বলা হয়েছে—ঐ পত্রিকা/প্রতিষ্ঠান সংস্কার (Reform) করবার পন্থাকে কোনো সময়েই অনুমোদন করেনি কিন্তু গঠন বা নতুনভাবে তৈরি করার পন্থাকে একান্তভাবেই চেয়েছিলো। বৈদেশিক শাসন নীতিকে বাঁচিয়ে জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা কোনো দিনই সম্ভব নয় —এই সারমর্মের ভিত্তিতেই লর্ড মর্লির পরিকল্পনা/নীতিকে "বন্দেমাতরম্" ধিক্কার দিয়েছিল, যেগুলি অভিযোগ-তথ্য হিসাবে আপনার সামনে সরকারী অভিশংসক (Public Prosecutor) নিবেদন করেছেন। ঐ সারমর্মের বক্তব্যই "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার সৎ উদ্দেশ্য ছিল। যদি ঐ সৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে রাজদ্রোহিতার নাম-গন্ধ থাকে তাহলে অরবিন্দকে রাজদ্রোহী বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। আমার যুক্তি দিয়ে আমি প্রমাণ করতে চাই যে, স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করাই ঐ সংস্থার সভ্যদের মূল প্রচেষ্টা ছিল এবং "বন্দেমাতরম্"পত্রিকাতে স্বাধীনতা অর্জন করবার পন্থাগুলি আলোচিত হতো— যেমন অসহযোগ আন্দোলন, বর্জন-নীতি অনুসরণ, জাতীয়তাবাদের অনুগামী শিক্ষা এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠা। যেখানেই হিংসাত্মক কার্যকলাপের ইঙ্গিত আছে সেখানেই মাননীয় ধর্মাবতার কোনো আক্রমণ প্রতিরোধ করার পরিচয় পাবেন। আমি কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করে প্রমাণ করতে পারবো যে, "বন্দেমাতরম্ পত্রিকাটি ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল"—একথা সত্য নয়। এই প্রসঙ্গে আমি ১৯০৬ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের "That Sinful Desire" শীর্ষক আলোচনাটির উল্লেখ করবো। এই আলোচনাটিতে জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষয় আলোচনা করা হয়েছিল। আমার নিবেদন এই যে, ঐ আলোচনায় অপরাধমূলক কিছুই ছিল না, যদি না আলোচনার বিশেষ বিশেষ অংশগুলিকে পৃথক করে ধরা হয়।

তারপর আরো দুটি আলোচনার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমটি "The Idea of National Council" শীর্ষক—যেখানে গুপ্ত সমিতিগুলি সম্পর্কে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার মনোভাব আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি ১৯০৮ সালের ৩রা অক্টোবর তারিখে লিখিত "Golden Bengal Scared"শীর্ষক (যে আলোচনাটির ভিত্তিতে পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ীকে জেরা করা হয়েছিল)।

এখন National College সম্পর্কে আমার কিছু বলার রয়েছে। এই কলেজ সম্পর্কেও নর্টন সাহেবের যুক্তি আমার বোধগম্য হয়নি। কারণ তাঁর মতে এই প্রতিষ্ঠানটিও রাজদ্রোহিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। আমি যতটা বুঝেছি, (অবশ্য মাননীয় ধর্মাবতারের কাছে স্বীকার করছি যে, আমার হয়তো ভুল হোতে পারে) আমার বন্ধুবরের বক্তব্য ছিল যে, অরবিন্দ ঐ National Council-কে স্বীয় দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনাগুলিকে রূপায়িত করবার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। আমার অনুমান সত্য হলে অরবিন্দের সঙ্গে ঐ Council-এর সম্পর্কের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। আমি মহামান্য ধর্মাবতারকে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকতে অনুরোধ করছি। যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই হয় তাহলে আমাদের আরো ভেবে নিতে হবে যে, National Councilটি একটি নির্দোষ প্রতিষ্ঠান ছিল না এবং প্রমাণ করতে হবে যে, ঐ প্রতিষ্ঠানটি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। সেটি প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত, কেবল সম্পর্কটুকুর ভিত্তিতে অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আপনি জানতে পারবেন যে, অরবিন্দ এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িত হওয়ার আগেই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং একে পরিচালনা করবার দায়িত্ব নেবার জন্যেই অরবিন্দ বাংলা দেশে এসেছিল। সতীশচন্দ্র মুখার্জির সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, অরবিন্দ প্রতিষ্ঠানটিকে কখনই রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক এমন কোনো

দলের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে ইচ্ছা পোষণ করেনি। যখন এই National Council সৃষ্টি হয় তখন আমরা এর সঙ্গে কাদের জড়িত দেখেছি? ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ, স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—যাঁদের কোনদিনই কেউ সংকীর্ণ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলবে না। এই থেকেই প্রমাণিত হয়—প্রতিষ্ঠানটির নীতি একমাত্র অরবিন্দেরই কর্তৃত্বাধীন ছিল না অথবা প্রতিষ্ঠানটিকে রাজনীতির দলীয় স্বার্থের সঙ্গে জড়িত করবার কোনো অভিসন্ধি তার ছিল না। বাঙালীরা National Council of Education-কে রাজনৈতিক দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে রাখতে চেয়েছিলেন। আমি যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি তাঁদের চিন্তাধারা এই রকমই ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত কর্মপন্থার পুস্তিকাটি পড়লেই বুঝতে পারা যায় যে, জাতীয় শিক্ষার অগ্রগতির উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি এবং প্রতিষ্ঠানটিকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখা কর্মকর্তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। সব দিক বিবেচনা করে National Council-এর কর্তৃপক্ষ অরবিন্দকে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ১৯০৬ সালের অগস্ট মাসে অরবিন্দ যখন কলকাতায় এসেছিল, সেই সময়ে সে বরোদার মহারাজার অধীনস্থ কর্মচারী ছিল। National College-এর অধ্যক্ষ পদে যোগদান করবার পর অরবিন্দ বরোদার চাকুরিতে ইস্তফা দেয়। এই বিষয়টি আদালতে প্রদত্ত সতীশচন্দ্র মুখার্জির সাক্ষ্যে স্বীকৃত হয়েছে। অরবিন্দের এই কলেজের পাঠ্যক্রম নির্বাচনেও কোনো হাত ছিল না। আমার নিবেদন অরবিন্দ এই মামলার অভিযোগ অনুযায়ী দোষী কি না সেই বিষয়ে National College-এর ব্যাপারটি কোনভাবেই আলোকপাত করে না। আমি এ কথাও বলবো যে, যদিও National College-এর ব্যাপারটি অরবিন্দকে আসামী হিসাবে প্রমাণ করতে সাহায্য করবে না—যা ইতিপূর্বেই আমি বলেছি—তবুও এই ব্যাপারটি অরবিন্দ ঘোষের ১৯০৫ সালের ১৩ই অগস্ট তারিখের লিখিত চিঠির বক্তব্যের

অনুগামী বলা যেতে পারে। ১৯০৬ সাল পর্যন্ত অরবিন্দ সম্পর্কে আমার এইটুকুই বলবার ছিল।

এরপর আমি ১৯০৬ সালের অক্টোবর থেকে ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত অরবিন্দের গতিবিধি সম্পর্কে আমার বক্তব্য পেশ করবো। এই সময়টিতে অরবিন্দ অসুস্থ থাকায় বিশেষ কোন কাজ করতে পারেনি। ১৯০৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর থেকে ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অরবিন্দ দেওঘরে ছিল; তারপর ১৯০৭ সালের ২৭শে জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত আবার সে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে দেওঘরে থাকে। সুকুমার সেন তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে, অরবিন্দ দেওঘরে যাবার দিনে সন্ধ্যার সময়ে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে নাম রাখার জন্যে তার অনুমতি চাওয়া হলে অরবিন্দের অনুমতি পাওয়া যায়নি এবং সেই মত পরের দিন থেকে পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে অরবিন্দের নামও প্রকাশ করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে আমি অন্যান্য যে তারিখগুলির উল্লেখ করেছি আদালতে সেই সম্পর্কে নথিভুক্ত কোনো প্রমাণ না থাকলেও অরবিন্দের লিখিত বিবৃতির ভিত্তিতে সেগুলি প্রমাণ করা যায়। অরবিন্দ সেই সময়ে অসুস্থ ছিল। এই জন্য অরবিন্দকে National College থেকে বহুবার ছুটি নিতে হয়েছিল। এই ব্যাপারটির উপর সতীশচন্দ্র মুখার্জিকে জেরা করে জানতে পারা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে অরবিন্দ অসুস্থতার জন্যেই ছুটি নিতে বাধ্য হয়েছিল। আরো বলা যায় যে, এই সময়ে "Seal's Lodge"-এ কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটেনি। "Seal's Lodge"-এর ঘটনাটি ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে কোনো সময়ে ঘটেছিল।

নর্টন সাহেব বলেছেন যে, ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় স্বায়ত্তশাসন, স্বরাজ, ইত্যাদি বিষয়ে যে সমস্ত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে মানব প্রেমের পরিবর্তে রাজ-

দ্রোহী কার্যকলাপের অনুকূলে উস্কানি দেওয়া হয়েছিল। ঐ সমস্ত আলোচনাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়বার পর আমি ঐ লেখার মধ্যে রাজদ্রোহিতার কোনো আভাস পাইনি। মিস্টার নর্টন কি বুঝেছিলেন জানি না, আমি যা বুঝেছি তা হোলো —পত্রিকার আলোচনার মাধ্যমে পূর্ণ স্বরাজ চাওয়া হয়েছিল। অভিযোগ হিসাবে এই একটি বিষয়েরই উল্লেখ করা যেতে পারে। নর্টন সাহেবের মতে, যে পদ্ধতিতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া হয়েছিল সেই পদ্ধতিটি আইনানুগ নয়, এই কারণেই স্বরাজের আদর্শ নীতিগর্হিত হয়ে উঠেছিল। আমি বলবো—তিনি এটা বলতে চেয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ঠিকই করেছিলেন।

এই আলোচনাগুলি সম্পর্কে আমার আরজি—বন্দেমাতরম্ পত্রিকার বিরুদ্ধে ঐ আলোচনাগুলির ভিত্তিতে রাজ-বিদ্বেষের কোনো অভিযোগ করা চলে না। ঐগুলির মধ্যে দেশবাসীর কল্যাণ কামনাই করা হয়েছিল—সেটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। হয়তো লেখার মধ্যে বিজাতি-বিদ্বেষের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল—(তা থাকলেও সেটা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না) কারণ, আলোচনার মধ্যে বিদেশীয় জাতি সম্পর্কে কোনো প্রশংসাসূচক মন্তব্য ছিল না। মহামান্য ধর্মাবতার যদি ঐ আলোচনাগুলি পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন—ঐ আলোচনার মধ্যে কোনো জাতিকেই হেয় প্রতিপন্ন করার কোনো ইঙ্গিত ছিল না কিন্তু জাতীয় সম্পদগুলির সদ্ব্যবহারে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়ে উঠবার ইঙ্গিত ছিল। এ কথা আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে, পূর্ণ স্বরাজ ভিন্ন জাতির মুক্তি সম্ভব নয়। বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে বৈদেশিক জাতির প্রতি কটাক্ষ ছিল, কারণ ঐগুলিতে বৈদেশিক সভ্যতার প্রতি ভারতীয়দের মোহান্ধতার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং উক্ত প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্যই ছিল ভারতীয়দের ইউরোপীয় জাতিগুলির প্রতি অন্ধ আকর্ষণ থেকে মুক্ত করা। ইউরোপীয় সভ্যতা যে খারাপ তা নয়, তবে উহা সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয়দেরই উপযোগী। ইউরোপীয় জাতিগুলি তাদের পক্ষে উপযুক্ত পদ্ধতিতেই সমৃদ্ধ হয়ে

উঠুক—তারা স্বীয় ঐতিহ্যগুলির উপর নির্ভর করে মহীয়ান হয়ে উঠুক। অনুরূপভাবে ভারতীয়েরা সমৃদ্ধ হোক্; তারা তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর অনুগামী হয়ে প্রতিভাত হোক্। ইউরোপীয় সভ্যতা খারাপ—এ কথা সত্য নয়। আমি বিশেষভাবে আপনাকে নিবেদন করেছি যে, উক্ত আলোচনাগুলির মধ্যে ইউরোপীয় সভ্যতাকে হেয় জ্ঞান করার কোনো ইঙ্গিত আপনি খুঁজে পাবেন না। কিন্তু আপনার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়বে যে, ভারতীয়দের পক্ষে ইউরোপীয় সভ্যতাকে অথবা ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।—এই সারমর্মটি উক্ত আলোচনাগুলির মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

ইউরোপীয় সভ্যতা-বৃক্ষটি ইংলণ্ডের মাটিতে বৃদ্ধি পেয়েছে; আপনি তাকে এদেশের মাটিতে রাখলে উপযুক্ত আবহাওয়ার অভাবে তার বৃদ্ধি ব্যাহত হবে। ঠিক সেই রকম, কোনো জাতির সমৃদ্ধি নির্ভর করে সেই জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর। বিদেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে কোনো জাতির সমৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। মানবতার প্রতি দ্বেষ বা অশ্রদ্ধা ঐ আলোচনাগুলিতে কোনো রকমেই প্রশ্রয় পায়নি। আমার সবিনয় নিবেদন, বন্দেমাতরম পত্রিকার যথার্থ বক্তব্য নর্টন সাহেবের বিচারে স্বীকৃতি পায়নি। (আমার মতে) এই পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীর মতে মানবতা ব্যতিরেকে জাতীয়তাবাদের পরিকল্পনা অবাস্তব চিন্তা। আমি ঐ সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পড়বার অনুমতি প্রার্থনা করছি। প্রবন্ধগুলি রূপকাশ্রয়ী হলেও তার মধ্যেই বন্দেমাতরম্ লেখকগোষ্ঠীর মূল চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে।

এখন দেখা যাক, ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত (অর্থাৎ অরবিন্দ ঘোষের রাজদ্রোহের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া পর্যন্ত) সময়ে অরবিন্দের গতিবিধি কি ধরনের ছিল। এই সময়ে অরবিন্দ প্রধানত National College এবং বন্দেমাতরম্ পত্রিকার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতো। [এই প্রসঙ্গে

চিত্তরঞ্জন বন্দেমাতরম পত্রিকার সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষের রাজ-দ্রোহিতার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর জাপান থেকে প্রেরিত একটি সহানুভূতিসূচক পত্রের কিয়দংশ পাঠ করেন। এ ছাড়া বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত "The Secret of Prudence and Moderation" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পাঠ করেন। এই প্রবন্ধগুলিতে অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছিল।…"প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি নিজস্ব পদ্ধতি থাকে। আমরা অসহযোগ আন্দোলনকে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের নিজস্ব পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করবো, ইত্যাদি"]…অন্যান্য প্রবন্ধগুলি পড়ে আমি মহামান্য ধর্মাবতারকে আর বিব্রত করতে চাই না ; কারণ বিষয়বস্তুগুলি প্রায় এক রকমের কংগ্রেসের বিষয়ে, স্বরাজের বিষয়ে, ইত্যাদি।

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর হোলো অরবিন্দের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণগুলিই সন্দেহজনক। মহামান্য ধর্মাবতার লক্ষ্য করবেন যে অরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির মধ্যে অস্বাভাবিকতা পুরোপুরি রয়েছে, সমগ্র ব্যাপারটি বুঝতে পারা খুবই শক্ত। আমার নিবেদন, ধর্মাবতারের অভিজ্ঞ দৃষ্টিতেও সমগ্র ব্যাপারটি অস্বাভাবিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ মনে হবে। যখন ধর্মাবতারের অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়বে যে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে অভিযোগগুলি প্রমাণ করবার প্রচেষ্টা বহুবার করা হয়েছে, তখন এই অস্বাভাবিকতার নজিরগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। নর্টন সাহেবকে আমি প্রশ্ন করে-ছিলাম যে আপত্তিকর অংশগুলিকে তিনি চিহ্নিত করে রাখেননি কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, ঐ অংশগুলি তিনি নীল পেনসিল দিয়ে দাগ দিয়েছিলেন কিন্তু দাগগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। আমার বিনীত নিবেদন, এই আলোচনাগুলিতে এমন কিছুই ছিল না যা অরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

এইবার ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়টি ধরা যাক। মাননীয় ধর্মাবতার! ১৯০৭ সালের অক্টোবর

মাসের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত অরবিন্দ অসুস্থতার জন্য দেওঘরে ছিল। এই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিঠিপত্র ও অন্যান্য প্রমাণগুলির প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চাই, কারণ এগুলির গুরুত্ব কেবল এই প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয় অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গেও জড়িত রয়েছে।

এখন শুনুন, কংগ্রেসের মধ্যে অরবিন্দের ভূমিকা সম্পর্কে মিস্টার পাল্‌কা কি লিখেছেন। পাল্‌কা অনেক চরমপন্থী প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করেছিলেন। অরবিন্দ কংগ্রেস সম্মেলনে আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের সমাবেশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। অরবিন্দের মতে এই সম্মেলন জাতীয় হিসাবে অনুষ্ঠিত করতে গেলে সমগ্র জাতির প্রতিনিধিদের যথার্থভাবে সম্মিলিত করতে হবে।

মিস্টার বীচক্রফ্‌ট: জাতীয় কংগ্রেস সংস্থাটি কি এখনও বর্তমান? চরমপন্থীদের মতে—জাতীয় কংগ্রেসের এখন কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু মধ্যপন্থীদের মতে—সংস্থাটি এখনও সক্রিয়। যেমন একটি প্রবাদ আছে, "ডুমা * বিলুপ্ত। ডুমা দীর্ঘজীবী হোক্।"

[অতঃপর চিত্তরঞ্জন বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় আলোচনার জন্য প্রেরিত সংবাদটির উপর সওয়াল করেন।]

মাননীয় ধর্মাবতার, মিস্টার বি. কে. দত্তের সাক্ষ্য থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে, মিস্টার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিও উক্ত সম্মেলনে বর্জন-নীতির বিরোধিতা করেছিলেন। কিছুদিন বাদে এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলা হয় যে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে সব কিছুই পড়ে। উগ্রপন্থীদের মতে এ বিবৃতিটি বর্জন-নীতির সমর্থকদের বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যেই প্রচারিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে অরবিন্দ ঘোষকে লিখিত মিস্টার তিলকের পত্রটিও উল্লেখযোগ্য। এই পত্রে অরবিন্দ ঘোষকে অধিক সংখ্যক চরমপন্থীদের

সম্মেলনে যোগদান করবার জন্য আমন্ত্রণ করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। মিস্টার তিলক এই জাতীয়তাবাদীদের নিয়ে কংগ্রেসের সম্মেলনের পরে অন্য একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেসকে বিনষ্ট করবার কোনো উদ্দেশ্য এদের ছিল না। এরা চেয়েছিল ডক্টর রাসবিহারী ঘোষকে নির্বাচন করবার বিষয়টি ভোটের সাহায্যে নিষ্পত্তি করবার। চরমপন্থীরা একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গঠনে প্রয়াসী হয়েছিল। ইংলণ্ডে রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র সংস্থা আছে—লিবার্যাল পার্টি, কন্‌জারভেটিভ্ পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি, ইত্যাদি। এই সব রাজনৈতিক দলগুলির মুখপাত্রদের বা প্রতিনিধিদের বক্তব্যগুলিই কংগ্রেসে উপস্থাপিত হয় এবং প্রয়োজনমত কংগ্রেসকে পথ চলার নির্দেশ দেয়। আমার বিনীত নিবেদন, জাতীয়তাবাদীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে কিছু প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সব প্রস্তাবগুলি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। জাতীয়তাবাদীরা কংগ্রেসকে বিনষ্ট করবার জন্যে সম্মিলিত হয়নি। তারা কখনো বলেনি যে "যদি আমাদের মতবাদ গ্রহণ না করো তাহলে তোমাদের মাথা ভেঙে দোব।" তাদের মনে বোমা সম্পর্কীয় কোনো মতলব ছিল না। আমি নর্টন সাহেবের মতো বলতে পারবো না যে তাদের মনে বোমার পরিকল্পনা ছিল।

মিস্টার বীচক্রফ্‌ট : তারা কংগ্রেসের উপর জোর করে তাদের মতবাদ চাপাতে চেয়েছিল?

মিস্টার নর্টন : নিশ্চয়ই।

চিত্তরঞ্জন : প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিল তা বলছি। জাতীয়তাবাদীরা ডক্টর রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করতে চায়নি। তারা লালা লাজ্‌পত্ রায়কে সভাপতি করতে চেয়েছিল। লালাজীর অসম্মতি থাকলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে তারা সভাপতি

করত। বস্তুতঃ চরমপন্থীদের সঙ্গে মধ্যপন্থীদের আদর্শগত কোনো ভেদ ছিল না। মধ্যপন্থীরা ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল এবং চরমপন্থীরা স্বয়ং-নির্ভর পূর্ণ স্বরাজ চেয়েছিল।

মিস্টার নর্টন: মধ্যপন্থীরা একটি রাষ্ট্রের অধীনে ঔপনিবেশিক সরকারের পত্তন করার আদর্শ গ্রহণ করেছিল।

চিত্তরঞ্জন: সুতরাং পার্থক্য কোথায়? উপনিবেশ-রাজ্যের উপর ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব কোথায়?

মিস্টার বীচক্রফ্‌ট: এটি সম্পূর্ণ নীতিগত ব্যাপার।

চিত্তরঞ্জন: ঠিক কথা। এটি আদর্শগত ব্যাপার নয়। আইন সভা বা ব্যবস্থাপক সভা তার মতবাদ জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না। চরমপন্থীরা একটি সুচিন্তিত যুক্তির ভিত্তিতে তাদের আদর্শ উপস্থাপিত করতে চেয়েছিল। বন্দেমাতরম্ পত্রিকা এই বক্তব্য খুব স্পষ্টভাবে বিবৃত করে। মধ্যপন্থীরা এবং চরমপন্থীরা একই কথা বলতে চেয়েছিল কিন্তু মধ্যপন্থীরা চরম পন্থীদের মতো, স্পষ্টবক্তা হতে পারেনি। মিস্টার তিলকের লেখা ঐ পত্রটিতে "Government Expression" হিসাবে দু'টি কথা ছাপা হয়েছে—এবং মনে হচ্ছে যেন তিলক সাহেব বলতে চেয়েছিলেন, "If Dr. Ghosh was rejected, there would be 'Government Expression"

মিস্টার বীচক্রফ্‌ট: মনে হয় কথাগুলি হবে Government Repression"।

মিস্টার বীচক্রফ্‌টের উক্তির পর চিত্তরঞ্জন মতিলাল ঘোষকে লেখা তিলকের পত্রটির উল্লেখ করে বলেন যে এই পত্রটিতেও তিলক মতিলাল ঘোষকে ডক্টর রাসবিহারী ঘোষের বিরোধিতা করতে অনুরোধ জানান। কৌঁসুলী অরবিন্দ ঘোষ কর্তৃক চরম-পন্থীদের কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করার জন্য আবেদনটির উল্লেখ করেন।

মাননীয় ধর্মাবতার কংগ্রেসের পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে পরিকল্পনার কথা নিশ্চয় শুনেছেন। এই বিষয়টির উপরও চরমপন্থীদের যথেষ্ট মতবিরোধ ঘটেছিল। মিস্টার নর্টন বলেছেন, অরবিন্দ যে এই ব্যাপারটি সুরাটে জানতে পেরেছে—এ বিষয়ে বিতর্কের কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। আমি যা বুঝেছি তা হোলো—কংগ্রেসের মত ও পথের পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল—যার মধ্যে জাতীয় তহবিল, সালিসি-আদালত, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বরাজ, এবং বর্জন-নীতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিষয়গুলি, কংগ্রেসের অধিবেশনে অথবা প্রকাশ্যে আলোচিত হওয়ার জন্য উপস্থাপন করা হবে স্থির করা হয়েছিল। আমাদের মামলার দিক থেকে, এজলাসের আঙ্গিনায়, সালিসি পদ্ধতির উল্লেখটি খুবই ক্ষতিকর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মোটেই ক্ষতিকর নয়; কারণ এই পদ্ধতির মধ্যে বোমা, ষড়যন্ত্র বা ঐ জাতীয় কিছু ছিল না।

ঐ সময়ের আরও কয়েকটি চিঠিপত্র রয়েছে। আমি ঐগুলি আর পড়তে ইচ্ছুক নই। ঐ চিঠিগুলির প্রত্যেকটিই অরবিন্দের সঙ্গে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পর্কের প্রমাণ দেয়। এই সম্পর্ক অনস্বীকার্য। আমি যে চিঠির অংশ-বিশেষ উল্লেখ করে অরবিন্দের দেওঘরে থাকা প্রমাণ করেছি, সেই চিঠিখানিতে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সংস্কার সম্বন্ধে লেখক তার মতগুলি ব্যক্ত করেছিল। লেখক বোম্বাই শহরের অধিবাসী। তার ধারণা ছিল যে বন্দেমাতরমের উপর অরবিন্দের কিছুটা কর্তৃত্ব আছে, তাই সে অরবিন্দকে এই ব্যাপারে লিখেছিল। এই থেকে বুঝতে পারা যায়, বন্দেমাতরম পত্রিকার উপর অরবিন্দের কিছুটা কর্তৃত্ব ছিল—আমি এই প্রসঙ্গে এবং এই মামলার সওয়াল করতে গিয়ে অন্যান্য কয়েকটি প্রসঙ্গেও তা স্বীকার করেছি।

অরবিন্দ যা কিছু করে থাকুক সে বন্দেমাতরম্ পত্রিকাকে ভাল বাসতো বলেই করেছিল। বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় যে-সব লেখা প্রকাশিত হোতো সেগুলির প্রত্যেকটির জন্যে অরবিন্দকে দায়ী করা

চলে না। কারণ তার স্বাস্থ্য এবং সময় দুইই পত্রিকাটি তত্ত্বাবধান করার অনুকূলে ছিল না বা তা করার পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না। এই কারণেই অরবিন্দ পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল, অরবিন্দ কোনো সময়েই পত্রিকার সম্পাদক পদ গ্রহণ করেনি। ইংরাজী সংবাদপত্র বা পত্রিকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাংবাদিকরা তাদের সংবাদগুলি সংগ্রহ করে সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং সংবাদগুলি সম্পাদকের দায়িত্বে প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে পত্রিকার সঙ্গে অরবিন্দ যুক্ত ছিল বটে, কিন্তু সম্পাদকীয় হিসাবে যা প্রকাশিত হোতো সেগুলির দায়িত্ব তার ছিল না। আমি মহামান্য ধর্মাবতারকে সব কিছুই পড়তে অনুরোধ করছি না, তবে এইটুকু বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি যে ঐ লেখাগুলির মধ্যে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যার ভিত্তিতে অরবিন্দের দায়িত্ব প্রমাণ করা সম্ভব। মহামান্য ধর্মাবতারের সমীপে নিবেদন করার মতো আরও কিছু লেখা আমার কাছে রয়েছে। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে যা প্রকাশিত হয়েছে সেটি নিবেদন করছি। আমার কাছে অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতবাদের উপর ৩।৪টি প্রবন্ধ রয়েছে। অরবিন্দ ১৯০৮ সালের ২রা মে ধৃত হয়। আমার কাছে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রকাশিত সব প্রবন্ধগুলিই রয়েছে। ঐসব প্রবন্ধগুলি, আমি শুরু থেকে শেষ অবধি যা বলতে চেয়েছি তার অনুকূলে সাক্ষ্য দেবে।

আমি এতক্ষণ পর্যন্ত তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর সওয়াল করেছি এবং এইবার আমি মহামান্য ধর্মাবতারের সমীপে মধ্যপন্থী সংবাদপত্র গুলিতে প্রকাশিত (বিশেষ করে "Bengalee" এবং "Indu Prokash") মতবাদের সঙ্গে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র-গুলিতে প্রকাশিত (বিশেষ করে "Statesman", "Indian Daily News", "Pioneer," এবং "Englishman") মতবাদগুলির সাদৃশ্য সম্পর্কে আলোচনা করবো। যদিও সংবাদপত্রগুলির মতবাদের মধ্যে

পার্থক্য রয়েছে, তবুও এই সব মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, আমার এই অনুমান আক্রমণাত্মক নয়। এই সব মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও প্রতিটি সংবাদপত্রই স্বয়ংনির্ভরশীল এবং স্বতন্ত্র। ধর্মাবতারের অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে এই স্বাতন্ত্র্য ভাবটি নিশ্চয় ধরা পড়বে। আপনি জানেন যে "Bengalee" এবং বোম্বাই থেকে প্রকাশিত "Indu Prokash" সংবাদপত্র দুটি মধ্যপন্থায়। আমি বুঝতে পারছি না, কেন নর্টন সাহেব এতদূর পর্যন্ত জল গড়িয়েছিলেন।

বন্দেমাতরম্ এবং যুগান্তর পত্রিকার মতবাদ প্রসঙ্গে যতদূর বুঝেছি তা বুঝিয়ে বলার জন্যে আমি বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করবো—ঐ প্রবন্ধ অনুযায়ী অসহযোগ আন্দোলন, স্বদেশী, বর্জন-নীতি, জাতীয় শিক্ষা, সালিসি-আদালত, ইত্যাদির মাধ্যমেই স্বাধীনতার আদর্শে সাফল্যের সঙ্গে পৌঁছানো সম্ভব। গ্ল্যাডস্টোনের সুবিদিত বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত করে বলছি, "স্বায়ত্তশাসনের জন্য তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সরকারী শাসন যন্ত্রের কাজগুলির মধ্যে যা যা সম্ভব সুসম্পন্ন করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।" জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী ইত্যাদির মাধ্যমে ঐ ধরনের শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব বলেই বন্দেমাতরম্ পত্রিকা অভিমত পোষণ করতো। এই পত্রিকার মতে ঐ পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত স্বাধীন সরকার পরিচালনা করবার উপযুক্ততা আসতে পারে না। "নিজেকে স্বাধীন-সরকারের উপযুক্ত করে গড়ে তোলো"—পাশ্চাত্য দেশের রাজনীতির দার্শনিকগণের এই উপদেশের ভিত্তিতেই পত্রিকার মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদটি বন্দেমাতরম্ পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর দ্বারা বিশ্লেষিত হওয়ার পর বেদান্তের সরল ও সহজ রূপটির সঙ্গে মিলিয়ে রচিত হয়েছিল। ইউরোপের প্রতিটি দার্শনিক গণতন্ত্রের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। হব্‌সের সময় থেকে স্পেন্সর পর্যন্ত—ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব অধ্যায়টি পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে জনগণের মৌন সম্মতি ব্যতীত কোনো শাসনতন্ত্র সচল থাকতে পারে না। কোনো শাসনতন্ত্র

এবং শাসকগোষ্ঠী যতই স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠুক বা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তরে দেশ শাসন করুক—যদি শাসনতন্ত্র সচল থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে তার উপর জনগণের আস্থা রয়েছে। হব্সের মতে, এমন একটি সময় ছিল যখন রাজা ও প্রজা একসঙ্গে মিলিত হোতো। কিন্তু কেন তারা মিলিত হোতো? জনগণের আস্থা অটুট আছে কি না, তা জানবার জন্যে। দার্শনিক লক্ মনীষী রুশোর কাছ থেকে তাঁর মতবাদটি গ্রহণ করেছিলেন। স্পেন্সরের "জনগণ ও রাষ্ট্র" একই কথা বলেছে। প্রকৃতপক্ষে, শাসক এবং শাসিতের সম্পর্ক সর্তাধীন। ইতিহাসের পাতায় এর উল্লেখ না পাওয়া গেলেও যুক্তি দিয়ে বিচার করলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হবে। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্র সচল রাখা যায় না। সর্বকালে শাসনতন্ত্র ততক্ষণই জীবিত যতক্ষণ পর্যন্ত দেশবাসী বা জনসাধারণ সেই শাসনতন্ত্রের প্রাণশক্তি যোগাতে পারে।

অরবিন্দ এই একই মতে বিশ্বাসী ছিল। অরবিন্দ এই মতটি সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে অভিনবরূপে উপস্থাপন করেছিল—ফলে অরবিন্দের নিজস্ব দার্শনিক চিন্তার অভিব্যক্তি ঘটেছিল। "জনসাধারণের মৌন সম্মতি" সম্পর্কীয় মতবাদটি এবং "জনগণের বাণীই ঈশ্বরের বাণী" সম্পর্কীয় মতবাদটি—সাধারণত যার অপপ্রয়োগ হয়ে থাকে—এই দুটি মতবাদই এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত। অরবিন্দ জাতির ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে ঐ একই মত পোষণ করতো। সমাজ এবং মানুষ উভয়ের বিকাশের মধ্যেই সে ঈশ্বরের অভিব্যক্তি দেখতে পেতো। সে বিশ্বাস করতো যে নিয়তির অমোঘ নির্দেশে বা ঈশ্বরের নির্দেশমতোই জগতের সবকিছুই বিকশিত হবে—বেদান্ত এই কথাই বলে। "জনগণের বাণীই ঈশ্বরের বাণী"—কারণ জনগণ ঈশ্বরেরই প্রকাশ, সেই এক ঈশ্বর বহুর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছেন। আত্মসংযম ব্যতীত মুক্তিলাভ করা অসম্ভব। যদি কেউ ত্যাগ এবং সংযমের শিক্ষা না পায় তাহলে তার জীবনে মুক্তি দুরাশা মাত্র।

মহামান্য ধর্মাবতার যদি অরবিন্দ ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী এই দেশের জনগণের উপর ঐ নীতি প্রয়োগ করেন তাহলে কি ফল পাবেন ? জনগণের মানসিক প্রস্তুতি আসবে, জনগণ স্বরাজ বা স্বাধীন-সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে। আমি এই বিষয়ে প্রযোজ্য আমার যুক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। অরবিন্দ স্বরাজের কোনো রূপারোপ করেনি। অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষার সঙ্গে স্বদেশী, বর্জন-নীতি, এবং সালিসি-আদালতের প্রস্তাব করেছে। কিন্তু যুগান্তর পত্রিকা "সূচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে স্পষ্টভাবেই দাবি করেছে যে স্বাধীনতা ব্যতীত দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। স্বদেশী প্রসঙ্গে যুগান্তর উপহাস করেছে। জাতীয় শিক্ষা, সালিসি-আদালত প্রসঙ্গে যুগান্তর মন্তব্য করেছে যে ঐগুলি অবসর চিন্তার নামান্তর। যুগান্তর পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মতে—সম্পূর্ণ স্বাধীন না হলে দেশের কোনো উন্নতিই সম্ভব নয়। বন্দেমাতরমের সঙ্গে যুগান্তরের এইখানেই নীতিগত প্রধান পার্থক্য। অনুরূপভাবে আমি আপনাকে "সন্ধ্যা", "নবশক্তি" এবং অন্যান্য সংবাদপত্রের মধ্যে নীতিগত পার্থক্যগুলি দেখাবো।

[চিত্তরঞ্জন ঐ সংবাদপত্র থেকে স্ব-নির্বাচিত উদ্ধৃতিগুলি পাঠ করেন ও সেগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সংবাদপত্রের উদ্ধৃতিগুলি ব্যতীত চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের কিছু অপ্রকাশিত রচনাও পাঠ করেন।]

বন্ধুবর নর্টন সাহেবের যুক্তিতে ২৯৯৮ নম্বর নথিভুক্ত-প্রমাণটি (একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ) লেখকের মতবাদের যন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা যায়। চিঠিখানি বাঙলা ভাষায় লিখিত কিন্তু চিঠিখানি যে অরবিন্দ ঘোষেরই হস্তাক্ষর সে কথা তিনি প্রমাণ করেননি।

মিস্টার নর্টন : আমি মনে করি ওটা (চিঠিখানির লেখা)—সরোজিনীর হস্তাক্ষর।

চিত্তরঞ্জন : ঠিকই—হস্তাক্ষরটি কোনো মহিলার হস্তাক্ষরই বলে মনে হয়। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না—চিঠির

বক্তব্য সরোজিনীর মতবাদ প্রচারের (অর্থাৎ নটন সাহেবের কথামত "লেখকের মতবাদ") যন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা যায় কি না ? কারণ, মহামান্য ধর্মাবতারের এজলাসে সরোজিনী ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে অভিযুক্ত হয়নি। "বর্জন-নীতি" সম্পর্কীয় ঐ প্রবন্ধটি যেহেতু লেখক প্রকাশ করেনি সেই হেতু আমি বলতে ভরসা পাচ্ছি—লেখক জানতো যে ঐ প্রবন্ধটি লোকে ভুল বুঝবে। সুতরাং আমার জিজ্ঞাস্য, অপ্রকাশিত কোনো রচনার জন্য কি-যুক্তিতে অরবিন্দকে অভিযুক্ত করা যায় ? মহামান্য ধর্মাবতারের সমীপে বিনীত নিবেদন এই—আপনিই বলুন কিভাবে এই অপ্রকাশিত প্রবন্ধটি কারুর চিন্তাধারার পরিমাপক হিসাবে এক্ষেত্রে বিচার্য হতে পারে ? আমার মতে—বিচার্য হতে পারে না। কারণ, প্রবন্ধের কথাগুলি সুস্পষ্টভাবে ঠিক অরবিন্দের আদর্শকে রূপায়িত করতে পারেনি। প্রবন্ধটির নির্ভুল পরিবেশন সম্পর্কে সন্দিহান হয়েই অরবিন্দ প্রবন্ধটি প্রকাশ করতে দেয়নি। যে পর্যন্ত প্রমাণ না হয় যে ঐগুলি গুপ্ত প্রচারপত্র, এবং গোপনে জনমত সংগঠন করবার উদ্দেশ্যে ঐগুলি প্রচারিত হয়েছিল, সেই পর্যন্ত ঐগুলিকে কারুর মতবাদের যন্ত্র হিসাবে বিচার করা যায় না। আমি মহামান্য ধর্মাবতারকে এই বিষয়টি বিশেষ সহানুভূতির দৃষ্টিতে বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। এই লেখা কোথাও প্রকাশিত হয়নি। অরবিন্দের ইচ্ছা থাকলে লেখাগুলি খুব সহজেই প্রকাশ করা সম্ভব হোতো। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটি নিরীক্ষণ করলে বুঝতে পারা যায় যে জনমত বিভ্রান্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাতেই অরবিন্দ এই লেখাটি অপ্রকাশিত রেখেছিল—একটু সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। নর্টন সাহেব এই লেখাটিকে যে ভাবে বিবৃত করতে চেয়েছিলেন প্রকৃতপক্ষে লেখাটি সেই দোষে দুষ্ট নয়।

[এর পর চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের অন্য একটি অপ্রকাশিত রচনা, "What is Extremism" পাঠ করেন। এই সময়ে ঐ লেখার একটি বাক্য, "The law was made for man and not man for the

law.", উদ্ধৃত করে জর্জ সাহেব প্রশ্ন করেন, "প্রত্যেকের আইন সম্পর্কে নিজের অভিমত ব্যক্ত করবার অধিকার আছে কি না?"]

চিত্তরঞ্জন : নিশ্চয়ই আছে। কারণ, প্রত্যেকের জীবনের নীতি স্বীয় বিবেকের নির্দেশাধীন হওয়া উচিত।

মিস্টার নর্টন : তাহলে সমাজের সত্তা কোথায়?

চিত্তরঞ্জন : অসহযোগ সম্পর্কে এই মামলায় জড়িত ব্যক্তিদের মতোই অন্যান্য দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় কি না? অন্যান্য দেশেও কি আইন অমান্য আন্দোলন হয়নি? সেখানেও কি আইন অমান্য করে লোকে কারাজীবন বরণ করে নেয়নি?

মিস্টার নর্টন : করেছে। কিন্তু "law is wrong" এই যুক্তির ভিত্তিতে নয়।

চিত্তরঞ্জন : ঐ মতবাদ অরবিন্দের। কারণ অরবিন্দ মনে করে —আইন যারা প্রণয়ন করবে সেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আইন যাদের জন্যে প্রণয়ন করা হবে সেই জনগণের যদি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক (যেমন দেহযন্ত্রের মধ্যে বর্তমান) এবং ঐক্য না থাকে, তাহলে সেই আইনের ক্ষেত্রে "law is wrong" এই যুক্তিটি প্রযোজ্য। এই মামলার বিষয়বস্তু অনুযায়ী আদালত কারুর আদর্শকে বিচার করবে না। তবে কার্যতঃ যদি কেউ কোনো আইন অমান্য করে, তাহলে অন্যান্য দেশের মতো এই দেশেও সেই অপরাধীর উপর দণ্ডবিধি প্রযুক্ত হবে। শাসকগোষ্ঠী বা কর্তৃপক্ষ যে বিধিনিষেধ সৃষ্টি করেছেন, যারা সেইগুলিকে অন্যায় মনে করে অমান্য করবে তাদের আইন অনুযায়ী জরিমানা হবে বা শাস্তি হবে—আইন অমান্যকারীরা এর জন্য সব সময়েই প্রস্তুত থাকে। অরবিন্দের ভাষায় এই দেশের শাসন-কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ বিজাতীয়, ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের অন্তরের কোনো সম্পর্ক নেই। এই বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে কারুর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। অরবিন্দ নির্দ্বিধায় এই একই কথা বারবার বলেছে। স্বৈরতন্ত্র সরকারের বিরুদ্ধে বা অগণতান্ত্রিক সরকারের বেপরোয়া নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, প্রতিবাদ তত্ত্বের বিরুদ্ধে—

এই দেশের শাসক দেশের জনগণ থেকে বিযুক্ত, দেশবাসীর সঙ্গে বা জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তার অন্তরের কোনো যোগাযোগ নেই। অরবিন্দের যুক্তি একান্তভাবেই উপযোগিতাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইংলণ্ডের আইনের বুনিয়াদও উপযোগিতাবাদের—যা জাতির শ্রীবৃদ্ধির সম্পূর্ণ সহায়ক। দেশের কর্তৃপক্ষও তাই চায়। আমরা সেই আইন সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছি, কারণ সেটি জনস্বার্থের সংরক্ষক এবং যা জনস্বার্থের সংরক্ষক তাকে নিশ্চয়ই জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির পরিপন্থী হিসাবে ভাবতে পারা যায় না।

[এই প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের লিখিত প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে অরবিন্দের পূর্ণ-স্বরাজের আদর্শ এবং কিভাবে সেই ঈপ্সিত বস্তু লাভ করা যাবে তা পড়ে শোনান।]

চিত্তরঞ্জন : অরবিন্দের কাছে যদি কেউ বোমা নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, "সাহেব দেখলেই এই বোমাটি ছুঁড়বো কি ?" এই প্রশ্নের উত্তরে অরবিন্দ বলবে, "এর দ্বারা কি সেই মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে ?" এবং এর উত্তর একটি—না, এইভাবে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছানো যাবে না।

জজ সাহেব : যদি লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয়, তাহলে কি বোমা ছুঁড়তে পারে ?

চিত্তরঞ্জন : যদি নিপীড়নের মাত্রা সহ্যসীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার ফলে জনসাধারণ সংঘবদ্ধ হয় এবং সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার বলে যদি তারা উপযুক্তভাবে বলীয়ান হয়ে ওঠে তবেই পারবে—নচেৎ নয়।

জজ সাহেব : অর্থাৎ এখানেও সেই উপযোগিতাবাদের যুক্তি—যুদ্ধ করবার উপযুক্ততা এলে তবেই যুদ্ধ করতে পারবে।

চিত্তরঞ্জন : যথার্থ, আমার যুক্তিগুলির সাহায্যে আমি ঐ কথাই বলতে চেয়েছি। অরবিন্দের মতে সহিংস পদ্ধতি সব সময়েই খারাপ এবং অহিংস পদ্ধতি সব সময়েই ভাল। অরবিন্দ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি নিয়ে প্রবন্ধটির যে অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছে সেখানে সে

প্রতিটি লক্ষ্যের মধ্যেই সত্যের অধিষ্ঠান আছে কি না তা পরীক্ষা করবার নির্দেশ দিয়েছে, অর্থাৎ তার নির্দেশিত পথে গেলে এক মাত্র সত্যের সন্ধান পাওয়াই সম্ভব হবে। অরবিন্দ লিখেছে "মুক্তির জন্য সংগ্রামের চিন্তা মহান ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয় কি না?"—অরবিন্দের এই প্রশ্নটির উপর আমি মহামান্য ধর্মাবতারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

যদি দণ্ডবিধির এমন কোনো নির্দেশ থাকে—যা দুর্ভাগ্যবশতঃ নেই—যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে উদ্‌বুদ্ধ করার অর্থ রাজদ্রোহিতা, তাহলে অরবিন্দের উত্তর হবে—"তৎসত্ত্বেও আমাকে তা করতে হবেই। এ ক্ষেত্রে আমি নিরুপায়। এই উন্মাদনা আমার অন্তরের সম্পদ এবং আমার আত্মার কাছে এবং পরমাত্মার কাছে এই বিষয়ে আমি ঋণী—আমার জীবনের সব শক্তি দিয়ে ঐ ঋণ পরিশোধে আমি বাধ্য।" আলোচনা প্রসঙ্গে অরবিন্দ এক জায়গায় বলেছে, "That result will be anarchy" এবং আমি অবাক্ হয়ে গেছি যে ঐ উক্তিটিকে নর্টন সাহেবের মতো একজন ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত ব্যক্তি কদর্থ করে বললেন যে অরবিন্দের ঐ উক্তি "anarchist's outrage"-এর পরিচায়ক। "Anarchy" শব্দের অর্থ "নৈরাজ্য" বা "অরাজকতা" এবং অরবিন্দ ঐ শব্দটির ব্যবহারে বিশৃঙ্খলার আভাস দিতে চেয়েছিল।

অরবিন্দের লেখার মধ্যে কয়েকটি রূপকের ইঙ্গিত নর্টন সাহেব ঠিকমত ধরতে না পেরে ঐগুলির শব্দার্থের উল্লেখ করেছেন। যেমন, অরবিন্দ "দেশের জন্যে আত্মোৎসর্গ করতে হবে" এই শব্দগুলির সমন্বয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিল "ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি পরাঙ্মুখ হয়ে দেশের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে এবং যে কোনো দুঃখকষ্টকে হাসিমুখে মেনে নিতে"। অপর একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ, "দেশের মাটিকে রক্ত দিয়ে উর্বর করতে হবে।"—কেবল শব্দার্থ ধরলে মনে হবে ব্যাপারটি অবাস্তব, কিন্তু ঐ কথাগুলির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুতির আমন্ত্রণ। যদি অসহযোগ

আন্দোলন সুসংবদ্ধভাবে গড়ে ওঠার ফলে দেশের জনসাধারণ কর না দেয় তাহলে কি হবে? তাহলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা এখানে না করাই যুক্তিযুক্ত; কারণ, খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে পরিণতিতে শাসকের বন্দুকের গুলি চলবে এবং ফলে দেশবাসীর রক্তে দেশের মাটি লাল হয়ে উঠবে।

আমি অসহযোগ আন্দোলনের যে পর্যায়টির উল্লেখ করলাম, যদিও সেই পর্যায়ে পৌঁছানো অসম্ভব, কিন্তু তবুও, আমাকে উল্লেখ করতে হোলো, কারণ এই আলোচনাটির লেখক শেষপর্যন্ত একটি ভিন্ন সিদ্ধান্তে পেঁ ৗছেছে—যা বিভ্রান্তিমূলক। লেখকের একাগ্র দৃষ্টি ছিল "লক্ষ্য" এবং "লক্ষ্যে পেঁ ৗছানোর পদ্ধতির উপর"। কিন্তু লেখার মধ্যে একটিই মাত্র জিজ্ঞাসা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে উক্ত "লক্ষ্য" এবং "লক্ষ্যে পেঁ ৗছানোর পদ্ধতি" কতটা ফলপ্রসূ হবে এবং জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারবে কি না। আত্মনিগ্রহের প্রস্তুতি না থাকলে শাসিত প্রজাবর্গের মধ্যে চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আসবে না। লেখকের "রক্ত" "অন্ধকার" এবং "মৃত্যু" শব্দগুলির ব্যবহার রূপকাশ্রয়ী। যদি আন্দোলন সমাজে ও জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে তাহলে তা সানন্দে মেনে নিতে হবে অভিষ্ট সিদ্ধির সহায়ক হিসাবে। এইগুলি (নর্টন সাহেবের সিদ্ধান্তমত)—বোমা, এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের বা অন্যান্য হিংসাশ্রয়ী চিন্তার উপাদান যোগাবার জন্যে লিখিত হয়নি। আলোচনার মধ্যে "বিপ্লব" শব্দটির উল্লেখ রয়েছে—এই বিপ্লব শব্দটি সশস্ত্র বিপ্লবের (যেমন ফরাসী বিপ্লব) ইঙ্গিত দেয়নি। এই বিপ্লব শান্ত, সংযত, এবং সুসংবদ্ধ জনশক্তির অহিংসাশ্রয়ী প্রতিবাদ বা অসহযোগ।

মহামান্য ধর্মাবতার যদি ঐ অপ্রকাশিত রচনাটির মূল বক্তব্যগুলি পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে অরবিন্দের বক্তব্যের সঙ্গে রচনাটির সঙ্গতির কোনো তারতম্য নেই। কিন্তু শব্দ বিশেষের বা অংশ বিশেষের শব্দার্থের ভিত্তিতে বিচার করলে ঐ রচনাটি

বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। সেইজন্য আমি আপনাকে প্রবন্ধগুলির আদ্যপ্রান্ত পড়তে অনুরোধ করছি। মহামান্য ধর্মাবতার, অরবিন্দ আর একটি প্রবন্ধে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছে—"Who would free themselves must themselves strike the blow."। এখানে "strike the blow" কথাগুলিকে নর্টন সাহেব বোমা ব্যবহারের নির্দেশক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ধর্মাবতার যদি সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন যে এই প্রবন্ধটি কংগ্রেস অধিবেশনে রাসবিহারী ঘোষের বক্তৃতার সমর্থনে লিখিত হয়েছিল। অরবিন্দ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতার ঐ অংশটি উদ্ধৃত করে বলতে চেয়েছিলেন যে রাসবিহারী ঘোষ জাতিকে স্বয়ংনির্ভর হতে বলেছেন।

এইবার, যে চিঠিখানিতে "মিষ্টান্ন"-এর প্রসঙ্গ ছিল সেই চিঠিখানি সম্পর্কে আমার বক্তব্য পেশ করছি। ধর্মাবতার, এই প্রমাণটির উপর নির্ভর করে কোনোমতেই সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে চিঠিখানি বারীন্দ্রকুমার ঘোষের হাতে লেখা অথবা চিঠিখানি অরবিন্দের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত। তবে চিঠিখানি কি প্রমাণ করে? চিঠির ভিত্তিতে এইটুকু বলা যায় যে সুরাট থেকে এক ভাই অপর ভাইকে একটি চিঠি লিখেছিল। যদি চিঠিখানিকে প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হয় তাহলে বলতে হবে—এই দুই ভাই তখন সুরাটে ছিল। তাই যদি হয় তাহলে দুই ভাইই ষড়যন্ত্রকারী অনুমানে চিঠিখানির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ উভয়েই যখন সুরাটে রয়েছে তখন তারা সাক্ষাতে আলোচনা না করে পত্রালাপ করবে কেন? চিঠিখানিতে লেখা ছিল, "We must bave sweets all over India ready made for emergency. I wait here for your answer."। সরকারী কৌঁসুলী সাহেবের জবানিতে স্বীকৃত হয়েছে যে, বারীন অরবিন্দকে 'সেজদা' বলে সম্বোধন করতো। বারীন এই চিঠি লেখার সময়ে কি এই সম্বোধন ভুলে গেছল? সে লিখেছে, "Dear brother"। এই দেশে কোনো ছোটভাই তার বড় ভাইকে

"Dear Brother" বলে সম্বোধন করে না—অবশ্য বড় সব ভাইয়ের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ তাকে করলেও করতে পারে।

জজ সাহেব : কেন করতে পারে ?

চিত্তরঞ্জন : কারণ মেজদা, সেজদা ইত্যাদি সম্বোধনের থেকে পৃথক করবার জন্য সবার বড় ভাইকে দাদা বলে সম্বোধন করার প্রচলন আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে দুই ভাই-ই যখন সুরাটে তখন অরবিন্দের সঙ্গে বারীনের পত্রালাপ খুবই বিসদৃশ বলে মনে হচ্ছে। এই সম্পর্কে আর একটি তথ্য আমি মহামান্য ধর্মাবতারের নজরে আনতে চাই—দেখুন, বারীন চিঠিতে সই করেছে "বারীন্দ্র কুমার ঘোষ", এবং এই ভাবে নাম সই করবার কারণ দেখিয়ে নর্টন সাহেব বলেছেন যে দুই ভাই-ই ইউরোপীয় আদব কায়দায় কেতাদুরস্ত হওয়ার জন্যেই বারীন পুরো নাম সই করেছিল। কিন্তু বারীন ইংলণ্ডে গিয়েছিল অনেক দিন আগে (যখন তার বয়স ছিল মাত্র এক বছর) এবং তার অনেক পরে আমি সেখানে ছিলাম। আমি ইংলণ্ড থেকে ভারতে ফিরে এসেছি প্রায় পনেরো বছর, তাই আমি ইংলণ্ডের বর্তমান আদব কায়দায় কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকলে তা বলতে পারব না। তবে আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম তখন দেখেছি—ভাই ভাইকে চিঠি লেখার সময় পুরো নাম সই করতো না।

জজ সাহেব : আমি আমার পুরো নাম সই করতাম না, আমার পদবী বাদ দিয়ে নাম সই করতাম।

চিত্তরঞ্জন : সাধারণত কেউ পুরো নাম সই করে না—এই প্রথার ভিত্তিতেই আমি আপনাকে বলেছি যে ভাইয়ের সঙ্গে পত্রালাপে ভাই, "বারীন্দ্রকুমার ঘোষ"—এই রকম পুরো নাম সই করার মধ্যে যথেষ্ট অসাধারণত্ব রয়েছে।

আরো বিস্ময়কর হোলো যে, এই "Sweet's letter"টি অরবিন্দ সযত্নে রক্ষা করেছিল, কলকাতায় এনেছিল এবং বহুদিন ২৩ নম্বর স্কট্ লেনের বাড়িতে রেখে দিয়েছিল—কিন্তু পুলিস ঐ চিঠিখানি সৌভাগ্যবশত সম্পূর্ণ ভিন্ন ঠিকানা (৪৮ নম্বর গ্রে স্ট্রীট) থেকে সংগ্রহ

করতে পেরেছিল। সমস্ত ঘটনাগুলির মধ্যেই বাস্তবতার অভাব লক্ষণীয় মাত্রায় পরিস্ফুট হয়েছে। আমার সবিনয় নিবেদন, মহামান্য ধর্মাবতার এই চিঠিখানিকে অরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে নির্দ্বিধায় যেন গ্রহণ না করেন।

[এখন আমি মিস্টার ক্রেগানের সাক্ষ্য বিবৃতিটি পড়ছি।]

মিস্টার ক্রেগানের বিবৃতি অনুযায়ী ২রা মে তারিখে ৪৮ নম্বর গ্রে স্ট্রীট ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি ঠিকানায় অবস্থিত বাড়িগুলিতেও তল্লাসী চলেছিল। এই তল্লাসীর ফলে যে সমস্ত জিনিস সংগৃহীত হয়েছিল সেগুলিকে পার্ক স্ট্রীট থানায় পাঠানো হয়। দেখা যাচ্ছে যে, ১৫ নম্বর গোপীমোহন দত্ত লেনের এবং মুরারীপুকুর বাগানবাড়ির সব জিনিসগুলি পার্ক স্ট্রীট থানায় পাঠানো হয়েছিল কিন্তু ৪৮ নম্বর গ্রে স্ট্রীটের বাড়ি থেকে পাওয়া জিনিসগুলির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছিল। উক্ত চিঠিখানি (মিস্টার ক্রেগানের বিবৃতি অনুযায়ী) তল্লাসীর সময়ে তল্লাসকারীর নজরে পড়েনি। (তল্লাসীর পরে) থানায় গিয়ে চিঠিখানি পুলিসের নজরে পড়ে সুতরাং থানাতেই পরীক্ষা করে অরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে তালিকাভুক্ত করার ব্যাপারটি সব দিক থেকেই ঘোরালো। মিস্টার ক্রেগান তাঁর সাক্ষ্যে (জেরার উত্তরে) বলেছেন—তল্লাসীর সময়ে পাওয়া চিঠিগুলি খামের ভিতর থেকেই বার করা হয়েছিল। তল্লাসীর সময়ে পাওয়া চিঠিগুলিকে একটি বাণ্ডিল বেঁধে রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং যার মধ্যে ৬৪ খানি চিঠি এবং কুড়িখানি খাম পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং বেশ বুঝতে পারা যায় যে ঐ বাণ্ডিলের মধ্যে কিছু চিঠি (যার খাম পাওয়া সম্ভব নয়) তল্লাসের পরেই রেখে দেওয়া হয়েছিল।

মাননীয় ধর্মাবতার এবং এ্যাসেসার মহোদয়গণ, এই মামলার মুখ্য আসামী অরবিন্দের পক্ষে আমার বক্তব্য আপনারা ধৈর্য সহকারে শুনে যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার ইচ্ছা ছিল যে আদালতের ঐতিহ্য মণ্ডিত বিচার কক্ষে আপনাদের সমীপে অন্য কেউ এই বক্তব্য পেশ করুক ;

কিন্তু যেহেতু এই গুরু দায়িত্ব আমার উপরেই ন্যস্ত হয়েছে তাই আমার সাধ্য অনুযায়ী এই মামলা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদির সমন্বয় আপনাদের সমীপে উপস্থাপন করেছি। মামলার শুরু থেকেই একটি বিষয় আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করলেও আমি এখনও পর্যন্ত তা উল্লেখ করিনি, কারণ আমি মনস্থ করেছিলাম বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবন্দী এবং নথিভুক্ত প্রমাণগুলির উপর আমার বক্তব্য পেশ করবার পর সুবিধামত উপযুক্ত সময়ে ঐ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো।

মহামান্য ধর্মাবতার জানেন যে আমার বন্ধুবর নর্টন সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী অরবিন্দ এই ষড়যন্ত্র-মামলার প্রধান আসামী। তাঁর মতে অসামান্য ধী-শক্তি এবং সংগঠন-শক্তির অধিকারী অরবিন্দ লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে এই ষড়যন্ত্রের নির্দেশক বা পরিচালকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই প্রসঙ্গে ধর্মাবতারের কাছে আমার বিনীত নিবেদন—যে ধরনের ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা আমার বন্ধুবর প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন সেই ধরনের ষড়যন্ত্রের সাফল্য সম্পর্কে অরবিন্দ সব সময়েই নৈরাশ্য পোষণ করতো। অরবিন্দের অসাধারণ ধী-শক্তি সম্পর্কে আপনার স্বীকৃতি যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু আপনি সহৃদয়তাবশতঃ অরবিন্দকে যে স্বীকৃতি দিয়েছেন তা নির্ভুল হলে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, যে ধরনের ষড়যন্ত্রের পুরোধা এবং নির্দেশক হিসাবে অরবিন্দকে দায়ী করা হয়েছে, সেই ধরনের ষড়যন্ত্রের সাফল্য অরবিন্দের বিচক্ষণ বিশ্লেষণে স্বীকৃতি পেতে পারে না অর্থাৎ এই পথে অভীষ্ট সিদ্ধির কথা অরবিন্দের মনে কখনো স্থান পায়নি। আমার বিজ্ঞ বন্ধু নর্টন সাহেব ঐ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে হাজার রকমের ফিরিস্তি দিয়ে বললেন যে, ষড়যন্ত্রের জাল দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এই বিরাট ষড়যন্ত্রের বাস্তবতা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি এমন লোকদের জড়িয়েছেন যাদের কোনো প্রকারেই ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে প্রমাণ করা যায় না। আমি এই সব উদ্ভট যুক্তিগুলিকে উপেক্ষা করবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি ; এই ষড়যন্ত্র আমার বিজ্ঞ

বন্ধুবরের কল্পনালোকের সম্পদ ; আমি কখনই বলব না যে উনি ব্যাপারটি সত্য বলে মনে করেন না ; আমি একথাও বলছি না যে তিনি যা যা বলেছেন সেগুলি সম্পর্কে তাঁর নিজের সংশয় রয়েছে অথবা তাঁর যুক্তির মধ্যে অনুমানের আশ্রয় মোটেই নেই। আমি মনে-প্রাণে ধরে নিয়েছি যে তিনি ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত মনেই ধর্মাবতারের এজলাসে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন এবং আমার মতে, তাঁর এই আত্মবিশ্বাসের এক অদ্বিতীয় কারণ হচ্ছে—এই সম্পর্কে দীর্ঘ দিন ধরে পুলিসের কাছে এই বিষয়ের পাঠ গ্রহণ। গত দশ মাস ধরে পুলিস তাঁর মনকে বিষিয়ে তুলেছে এবং আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি যে তিনি মনে-প্রাণে ঐ শেখানো-কথাগুলি বিশ্বাস করে আপনার এজলাসে পেশ করেছেন।

কিন্তু এই মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রমাণগুলি অন্য কথা বলছে। আপনার সামনে যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যেগুলি অভিশংসকের বিবেচনায় সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য—সেগুলি নিরীক্ষা করলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে সমগ্র ব্যাপারটি একটি চাপল্য—শিশুসুলভ ষড়যন্ত্র বা বিপ্লবের অভিনয়। অরবিন্দের মত লোকের পক্ষে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা অসম্ভব যে একজন, দু'জন বা কয়েকজন ইংলণ্ডবাসীকে দেশের কয়েকটি স্থানে বোমার আঘাতে নিধন করলেই দেশ থেকে বৃটিশ সরকারকে অপসারণ করা সম্ভব হবে। আপনি যদি অরবিন্দকে বিচক্ষণ ও ধীশক্তিসম্পন্ন বলে স্বীকার করেন, তাহলে তাকে এই শিশুসুলভ ষড়যন্ত্র বা খেলাঘরের বিপ্লবের নায়ক হিসাবে বিচার করার কথা উঠতেই পারে না। এই কথাটি মামলার শুরুতেই ভাববার বিষয় ছিল বলে আমার মনে হয়েছে।

বিধিদত্ত অপরিসীম মানস-শক্তির অধিকারী হওয়ার ভিত্তিতে অরবিন্দকে এই ষড়যন্ত্র-মামলার মূল নায়ক হিসাবে প্রতিপন্ন করবার পক্ষে নর্টন সাহেবের জোরালো যুক্তিগুলিকে হয় নস্যাৎ করতে হবে নতুবা মেনে নিতে হবে যে ঐ সব স্বীকৃত অসাধারণ গুণাবলীর

অধিকারী অরবিন্দ, এই প্রমাণ সাপেক্ষ খেলার বিপ্লবের পুরোধা। আমার এই ইঙ্গিতটি ছাড়া আপনি যদি অরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণগুলি নিরীক্ষণ করেন তাহলেও (আমার মতে) দেখতে পাবেন যে সাক্ষীদের বিবৃতিসমূহ অরবিন্দের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ-গুলি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। যদি কেউ বলেন—অরবিন্দের গতিবিধি অনুসরণকারীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে অরবিন্দের যোগসূত্র প্রমাণিত হয়, তাহলে আমি বলবো—এই প্রমাণগুলির উপর বিন্দু-মাত্র আস্থা রাখা যায় না ; তা ছাড়া পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের যোগাযোগ ঘটলেও ঘটতে পারে। যদি শাসকগোষ্ঠীর সন্দেহ জন্মায় যে তাঁদের বিরুদ্ধে এমন একটি ষড়যন্ত্র হচ্ছে যার ফলে তাঁরা গদিচ্যুত হতে পারেন, তাহলে (সাধারণ বুদ্ধির বিচারে) এমনই কিছু গুপ্তচর পাওয়া যাবে যারা ঐ সন্দেহের যথার্থতা প্রমাণের জন্য বেশ কিছু মিথ্যা-প্রমাণ সংগ্রহ করতে দ্বিধা করবে না। এই প্রসঙ্গে আমি কোনো একজন প্রখ্যাত বিচারপতির লেখা বই থেকে একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করছি। "The Government under those circumstances have spies who wriggle into the case, causes drop into families, abstract correspondence and froge letters." সুতরাং এক্ষেত্রে আপনার সামনেও যে সমস্ত প্রমাণগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে উক্ত উদ্ধৃতির ভিত্তিতেই গ্রহণ করা যেতে পারে। আমার মনে হয়, আমার বক্তব্যের মধ্যে যে সব ইঙ্গিত আমি দিয়েছি সেইগুলি স্মরণে রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেই আপনি নিঃসন্দেহে ঐ সংগৃহীত প্রমাণগুলিকে 'সাজানো-প্রমাণ' হিসাবে বাতিল করে দেবেন—এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। বলা হয়েছে যে যে-সমস্ত চিঠি এখানে দাখিল করা হয়েছে সেগুলি প্রমাণ করে—অরবিন্দ একটি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত। এর উত্তরে আমি বলছি যে ঐ চিঠিগুলি সে কথা প্রমাণ করে না। আমার বন্ধুবর নর্টন সাহেব চিঠিগুলি সম্পর্কে ঐ কথাই বলেছিলেন ; এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু

যুবকের সঙ্গে অরবিন্দের সম্পর্ককে এমনিভাবে দেখানো হয়েছে যাতে কারুর পক্ষেই হাসি চেপে রাখা সম্ভব নয়; মনে হয় ঠিক যেন মিস্টার পিক্‌উইকের বিরুদ্ধে মিসেস বার্ডেল। আমার বন্ধুবর যখনই কোনো নথি-ভুক্ত প্রমাণ আদালতে পড়েছেন তখনই সেটির ব্যাখ্যা করেছেন সম্পূর্ণ নিজের কল্পনার ভিত্তিতে। ঐগুলিকে ঠিক যেমনটি ছিল সেইমত পড়লে—(অর্থাৎ যে কারণে লেখা হয়েছিল সেই কারণটির পরিপ্রেক্ষিতে পড়লে আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি)—যে-কথাই লেখা থাকুক না কেন সেগুলি অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির যথার্থতা প্রমাণ করে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে না।

আমার আর একটি বিনীত নিবেদন হচ্ছে—আমার বিজ্ঞ বন্ধুবর স্বীয় যুক্তির অসারতা কিছুটা বুঝতে পেরেই হতাশার সঙ্গে বলেছেন, "চিঠিগুলির বা নথিভুক্ত প্রমাণগুলির কথার উপর নির্ভর না করে তার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতগুলি এবং তৎসংশ্লিষ্ট অরবিন্দের চিন্তাধারার বিশ্লেষণই বিবেচ্য।" এই বক্তব্যের ভিত্তিতেই তিনি বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিকে আপনার দৃষ্টিগোচর করেছিলেন এবং দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছিলেন। "বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলি পড়ুন এবং অন্যান্য সংবাদ পত্রগুলি পড়ুন"—আমার বন্ধু বলতে চেয়েছিলেন যে ঐ সব সংবাদপত্র পড়ুন এবং ঐগুলির মধ্যে অরবিন্দের চিন্তাধারাকে আবিষ্কার করুন—কারণ সবগুলির মধ্যেই ষড়যন্ত্রের আভাস প্রচ্ছন্ন। তিনি বলতে চেয়েছিলেন—ঐ সব বক্তৃতা এবং প্রবন্ধের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলেই অরবিন্দ তার বক্তৃতার মাধ্যমে দেশবাসীকে স্বাধীনতার আদর্শ বলতে কি ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিল তা বুঝতে পারা যাবে এবং সেই সঙ্গে নিঃসন্দেহে প্রমাণিতও হবে যে অরবিন্দ বোমার ব্যবহার, গুপ্ত সমিতির সংগঠন, এবং এই মামলার অভিযোগ সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়ের সমর্থক ছিল। এই প্রসঙ্গে আমি আগেও বলেছি এবং আবার বলছি—ঐ সব লেখা, প্রবন্ধ,

চিঠি এক্ষেত্রে কোনো মতেই আইনানুগ প্রমাণ বলে ধরা যায় না এবং যদি ধরেন তাহলেও ঐগুলির মধ্যে এমনি অভ্রান্ত ইঙ্গিত পাবেন যার ভিত্তিতে বলা যাবে যে অরবিন্দের মতবাদ যা-ই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি অনুযায়ী সে অভিযুক্ত হতে পারে না।

মহামান্য ধর্মাবতার আমি আপনাকে অরবিন্দের লেখা ১৯০৫ সালের ১৬ই অগস্ট তারিখের চিঠিখানি পড়ে শুনিয়েছি। সম্পূর্ণ চিঠিখানি পড়বার পর আমি চিঠির প্রতিটি অংশ ব্যাখ্যা করেছি এবং ঐগুলির সম্পর্কে আমার মন্তব্য আপনাকে জানিয়েছি। অরবিন্দ লিখিত জবানবন্দি মারফত জানিয়েছে : "বরোদা থেকে কলকাতায় আসবার পর আমি এক মুহূর্তের জন্যও আমার ১৩ই অগস্ট, ১৯০৫-এর চিঠিতে বিবৃত নীতিগুলি অনুসরণে বিচ্যুত হইনি। আমি কখনো সক্রিয় রাজনীতি করিনি। আমার গতিবিধি, রাজনৈতিক, সামাজিক, বা ধর্মীয়—যে ধরনের হোক না কেন, আমি কোনো সময়েই ১৩ই অগস্ট তারিখের চিঠিতে বিবৃত নীতিগুলি অনুসরণে ভ্রষ্ট হইনি। (আপনার সমীপে আমার এইটুকুই নিবেদন) এর থেকে যদি বুঝতে হয় যে আমার দেশের কাছে জাতীয় স্বাধীনতার যে আদর্শ আমি প্রচার করেছি তা আইনানুগ নয়, তাহলে আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি। জাতীয় স্বাধীনতার বাণী প্রচার যদি এদেশে প্রচলিত দণ্ডবিধি অনুযায়ী অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়, তাহলে আমি বাণী প্রচার করেছি এবং সেই ভিত্তিতে আমি আপনাকে আমায় দণ্ডিত করতে অনুরোধ করছি। কিন্তু যে অপরাধ আমি করিনি তার বোঝা যেন আমার উপর চাপানো না হয় ; যে সমস্ত কাজ আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এবং (আমার মানসিকতার প্রতি সুবিবেচনা করে) যা আমার মানসিকতার পরিপন্থী সেই সব কাজের জন্য আমায় যেন অভিযুক্ত না করা হয়। স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমি স্বীকার করছি আমি তা করেছি—আমি কখনোই তা অস্বীকার

করিনি। এই কাজের জন্যই আমি আমার জীবনের সবকিছু ত্যাগ করেছি। এই কাজের জন্যই আমি কলকাতায় এসেছিলাম, এই কাজের মধ্য দিয়েই বাঁচতে এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করতে। আমার স্বপ্নে এবং জাগরণে এই কাজই ছিল আমার ধ্যান-জ্ঞান। এই কাজ যদি আমার অপরাধ হয়, তাহলে তা প্রমাণ করবার জন্য সাক্ষীদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি এখানে স্বীকৃতি করছি। আদালতে আমার আর বলবার কিছুই নেই। বন্দেমাতরম্ পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ প্রমাণ করবার সময় যে নাটকের অবতারণা করা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তির আর কোনো প্রয়োজন নেই। এই বিচারের আদ্যপ্রান্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেন। আমি যা বললাম সত্যিই তাই যদি আমার অপরাধ হয়, তাহলে সেটি আমায় বলুন আমি হৃষ্টচিত্তে শাস্তি মাথা পেতে নোব। কিন্তু আমি এই ভেবে কষ্ট পাচ্ছি যে আমি যে-ধরনের চিন্তাকে কখনো প্রশ্রয় দিইনি অথবা যে-সমস্ত কাজ আমার প্রকৃতি বিরোধী সেগুলির দায়-দায়িত্ব আমার উপর আরোপ করা হচ্ছে কেবল মিথ্যা সাক্ষ্য বা প্রমাণের ভিত্তিতে নয়—আরোপ করা হচ্ছে আমারই লেখা সেইসব আলোচনা বিকৃত করে, যেগুলির আদ্যপ্রান্ত সেই মহান আদর্শের নির্দেশক, যে আদর্শের প্রচারক হওয়ার জন্যই আমার জন্ম এবং কর্ম। আমি সেই কাজ করেছি এবং আমার এই স্বীকারোক্তির উপর কোনো প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। আমি পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দর্শনের মূল সূত্রগুলিকে বেদান্তের অমর বাণীর আলোকে সংস্কৃত করে আমার প্রচার্য আদর্শকে রূপ দিয়েছিলাম। আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে বিশ্বের দরবারে, জাতিপুঞ্জের সভায়, ভারতের মহান ভূমিকার কথা ভারতীয়দের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই বিধিনির্দেশে আমার জন্ম ও কর্ম স্থির হয়েছে —আমি ঐ কাজ করতে বাধ্য। এটাই যদি আমার অপরাধ হয়, তাহলে আপনি আমায় বন্দী করুন, কারারুদ্ধ করে রাখুন বা যে শাস্তিই দিন আমি অপরিবর্তিত থাকব। আমি নিঃশঙ্কচিত্তে

নিবেদন করছি যে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির কোনো বিধান অনুযায়ী আমি অভিযুক্ত হতে পারি না এবং যে-সমস্ত দুষ্কার্যের অভিযোগে আমায় অভিযুক্ত করা হয়েছে সেগুলির পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, কারণ আদালতে আমার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত প্রমাণগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে আমি দেখেছি যে ঐগুলির মধ্যে আমি যা বলেছি, লিখেছি, এবং শিখিয়েছি তার নাম-গন্ধ নেই।"

মহামান্য দণ্ডসত্রাধীশ, অরবিন্দের চিন্তাধারা ও ধ্যানজ্ঞান সম্পর্কে সবকিছু আপনাকে বলবার পর তার পক্ষ থেকে আপনার কাছে আমার প্রার্থনা হোলো—এই অনন্যসাধারণ চরিত্রবিশিষ্ট মানুষটি ভারতীয় দণ্ডবিধির কয়েকটি ধারার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত হয়ে শুধুমাত্র কলকাতার দায়রা জজের আদালতের বিচারমঞ্চেই আনীত হয়নি, তাকে আনা হয়েছে ন্যায়বিচারের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাসের সর্বোচ্চ আদালতে সুচিন্তিত ও আদর্শ বিচারের আশায়। সেই ভরসায় মহামান্য দণ্ডসত্রাধীশের সমীপে আমার সর্বশেষ নিবেদন ঃ

কালচক্রে এই বাদ-বিসংবাদ ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যখন নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতার সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাবে, এই বিশৃঙ্খলার যখন চিহ্নমাত্র থাকবে না, এই উত্তেজনা যখন প্রশমিত হয়ে যাবে, এই অভিযুক্ত ব্যক্তির নশ্বর দেহ যখন মৃত্যুর আশ্রয়ে অবলুপ্ত হয়ে যাবে, তারও অনেক অনেক পরে আজকের এই অভিযুক্ত ব্যক্তিটি জাতীয়তাবাদের অনন্য কাব্যস্রষ্টা হিসাবে, স্বাদেশিকতার পথিকৃৎ হিসাবে, এবং মানবতার পূজারী হিসাবে সর্বজন-স্মরণীয় হয়ে উঠবে। কালের অমোঘ নির্দেশে তার দেহের বিলুপ্তি ঘটবে কিন্তু ভারতের আকাশে-বাতাসে, ভারতের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বের দিকে-দিগন্তে তার বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে। তাই আমি বলেছি যে তাকে আনা হয়েছে ন্যায় বিচারের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাসের সর্বোচ্চ-আদালতে আদর্শ বিচারের আশায়। মহামান্য বিচারপতি, আপনার রায় দেবার সময়

আসন্নপ্রায়, এবং শ্রদ্ধেয় এ্যাসেসর মহোদয়গণেরও বিচক্ষণ মতামত দেবার আর বিলম্ব নেই। ঐতিহ্যমণ্ডিত ইংলণ্ডের বিচারালয়ের ঐতিহাসিক সুখ্যাতির কথা স্মরণ করে আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানালাম। ইংলণ্ডের হাজার সূত্রের বিচার-নীতির অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের কথা স্মরণ করে, ইংলণ্ডের প্রখ্যাত বিচারপতিদের সুচিন্তিত দণ্ডবিধি প্রয়োগের যে ক্ষমতা আজও প্রজাবর্গকে ইংলণ্ডের আইন-কানুনের প্রতি অবিচল আস্থা এবং আনুগত্য বজায় রাখতে সাহায্য করেছে সেই ক্ষমতার কথা স্মরণ করে, আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানালাম। আমি আপনাদের সমীপে ইংলণ্ডের ইতিহাসের সমৃদ্ধিময় ঐতিহ্যের নামে আবেদন জানালাম এই কারণে যে লোকে না বলে—ইংলণ্ডের একজন বিচারপতি ন্যায়বিচারে ভুল করেছেন। অরবিন্দ কর্তৃক প্রচারিত মহান আদর্শের নামে এবং আমাদের দেশের মহান ঐতিহ্যের স্মরণে এ্যাসেসর মহোদয়গণের কাছেও আমি একই আবেদন জানালাম—যাতে লোকে না বলে যে অরবিন্দের দুই স্বদেশাত্মজ মোহবশে এবং পরাধীনতার আনুগত্যে অন্ধ বিশ্বাসের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে অভিযোগকারীদের নালিশের বেড়াজালে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।"(২০)।

আলিপুর বোমা-মামলায় চিত্তরঞ্জনের ঐতিহাসিক সওয়ালটির স্বীকৃতি দেন তীক্ষ্ণধী নির্ভীক, এবং ন্যায়নিষ্ঠ বীচক্রফ্‌ট সাহেব। শ্রীঅরবিন্দের দিব্য চেতনার প্রতি এই বিদেশী বিচারকের গোপন শ্রদ্ধা এই ঐতিহাসিক মামলার একটি অপরিহার্য আলোচ্য বিষয়। বীচক্রফ্‌ট এই মামলায় প্রধান আসামীর বিরুদ্ধে আনীত প্রতিটি অভিযোগ চিত্তরঞ্জনের সওয়ালের পরিপ্রেক্ষিতে কি ভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন তার পূর্ণ বিবরণ থেকে বীচক্রফ্‌টের বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে নর্টন এবং বীচক্রফ্‌ট সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের ব্যাজোক্তি উল্লেখযোগ্য—"যেমন মিল্‌টনের Paradise Lost-এর শয়তান, আমিও তেমনি নর্টন সাহেবের plot-এর কল্পনাপ্রসূত

মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রস্বরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষমতাবান প্রতাপশালী bold bad man। আমিই জাতীয় আন্দোলনের আদি ও অন্ত, স্রষ্টা, পালক ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংহার প্রয়াসী। উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী ইংরাজি লেখা দেখিবামাত্র নর্টন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চৈস্বরে বলিতেন—অরবিন্দ ঘোষ।···বেরসিক বীচক্রফ্‌ট হ্যামলেট নাটক হইতে হ্যামলেটকে বাদ দিয়া বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্যকে হতশ্রী করিয়া গেলেন।" (২১)

শ্রীঅরবিন্দের জীবনী সম্পর্কে যে কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে চিত্তরঞ্জনের মত বীচক্রফ্‌টের ভূমিকাও চিরস্মরণীয়। চিত্তরঞ্জনের ঐতিহাসিক সওয়াল শেষ হওয়ার পর বীচক্রফ্‌ট অরবিন্দ ঘোষ সম্পর্কে নিম্ন-লিখিত মন্তব্য করেন ঃ

"···আমি এইবার এই মামলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আসামী অরবিন্দ ঘোষ সম্পর্কে আলোচনা করব। অরবিন্দই সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি যাকে দোষী প্রতিপন্ন করবার জন্য সরকার পক্ষ বিশেষ উদ্‌গ্রীব এবং যে অভিযুক্ত হয়ে আদালতের কাঠগড়ায় না দাঁড়ালে এই মামলার নিষ্পত্তি অনেক আগেই হয়ে যেতো। মুখ্যত এই কারণে সব শেষে আমি অরবিন্দের বিষয় আলোচনা করছি; এবং আরও একটি কারণ হোলো— অন্যান্য অভিযুক্তদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার অভিযোগও অরবিন্দের বিরুদ্ধে আনীত হয়েছিল।

"অরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে সে যে আদর্শ জনগণের মধ্যে প্রচার করতে চেয়েছিল বলে তার কৌঁসুলী বর্ণনা করেছেন, সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করবো। সরকার পক্ষের এবং তার স্বপক্ষের কৌঁসুলী দু'জনে একবাক্যে তার ধর্মভাবকে এই মামলার বিচার্য করে তুলেছেন। বস্তুতঃ সরকার পক্ষের কৌঁসুলীর মতে অরবিন্দের ধার্মিক দৃষ্টিভঙ্গী তার দেশের স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলেই সে নিজের মতবাদের একজন অন্ধ বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল।

"তার পক্ষের কৌঁসুলী যুক্তি দেখিয়েছেন যে অরবিন্দ একজন বৈদান্তিক ছিল, এবং সে তার রাজনৈতিক মতবাদকে বেদান্ত-ভিত্তিক করে রচনা করেছিল। বেদান্ত বলে—প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বর্তমান এবং মানুষের ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের জন্য নিজের মধ্যে সেই ঐশী-অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে হবে। সেই রকম জাতির 'পূর্ণ-স্বরাজ'-এর জন্য জাতির মধ্যেও সেই প্রত্যক্ষ অনুভূতি আনতে হবে যার দ্বারা জাতির মধ্যে একাত্মবোধ আসবে এবং শুভ-বোধ জাগ্রত হবে—জাতির এই মুক্তি কোনো বিদেশীর সাহায্যে আসতে পারে না; এই জাতীয় মুক্তির জন্য প্রয়োজন দেশীয় পদ্ধতির অনুসরণ। অরবিন্দের নীতি বা মতবাদ কেবলমাত্র অসহযোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, কারণ তার মতে—মুক্তির জন্য প্রয়োজন চরম ত্যাগ এবং আত্মনিগ্রহের সাধনা। যদি আইনের মধ্যে অনাচার প্রকাশ পায় তাহলে সেই আইনকে অমান্য করে শাস্তি ভোগ করবে কিন্তু কখনো হিংস্রতার আশ্রয় নেবে না। কারণ নীতিগতভাবে যখন তুমি আইন মানতে, তখন (অনাচারের প্রতিবাদে) আইন অমান্য করে হাসিমুখে শাস্তি বরণ করে নেওয়াই উচিত। অরবিন্দ জনগণের উদ্দেশ্যে বলেছে যে 'তোমরা কাপুরুষ নও, সুতরাং আত্মবিশ্বাসী হও এবং মুক্তিলাভ কর—অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী ও স্বাধীন পদ্ধতিতে'। চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের মতে—এই কথাগুলিই ছিল অরবিন্দ ঘোষের মতবাদের সারমর্ম।

"অরবিন্দ তার লিখিত জবানবন্দিতে বলেছে, বরোদায় থাকা কালে বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না এবং বাড়ির কাজকর্মের জন্য অবিনাশকে নিযুক্ত করার আগে সে অবিনাশকে চিনতো না।

"অরবিন্দের মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণগুলিকে নিম্নলিখিত সাতটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে আমি এই সম্পর্কে আলোচনা করবো:

(১) অরবিন্দ এবং তার স্ত্রীর চিঠিপত্র;

(২) অরবিন্দ এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের লেখা চিঠিপত্র ;

(৩) অরবিন্দের বক্তৃতা ;

(৪) অরবিন্দের প্রবন্ধ ;

(৫) অন্যান্য ব্যক্তিদের চিঠিপত্র ;

(৬) নথিভুক্ত প্রমাণ ;

(৭) জবানবন্দী ও সাক্ষীর বিবৃতি ; এবং অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাদি।

সবশেষে, আমি এমন কতকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করবো, যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে এই মামলায় স্বীকৃত হয়েছে।

"১৯০২ সালের যে তিনখানি চিঠি পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যে আলোচ্য কিছুই নেই। ১৯০৫ সালের তিনখানি চিঠির মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু প্রচুর। এই চিঠিগুলি পড়লে জানা যায় যে অরবিন্দের মতবাদ এবং দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যগুলি কি? চিঠিতে অরবিন্দ তার তিনটি আদর্শের উল্লেখ করেছিল : 'এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ। সাধারণ লোক—অসাধারণ মত, অসাধারন চেষ্টা, অসাধারন উচ্চ আশাকে যাহা বলে তাহা বোধহয় তুমি জান। এই সকল ভাবকে লোকে পাগলামী বলে, তবে পাগলের কর্মক্ষেত্রে সফলতা হইলে ওকে পাগল না বলিয়া প্রতিভাবান মহাপুরুষ বলে।... ...আমার তিনটি পাগলামী আছে। প্রথম পাগলামী এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের ; যাহা পরিবারের ভরণপোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকী রহিল, ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত।...ভগবানকে দেওয়ার মানে কি, মানে ধর্মকার্যে ব্যয় করা।...আমার ত্রিশকোটি ভাইবোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া কোনোমতে বাঁচিয়া থাকে,

তাহাদের হিত করিতে হয়। দ্বিতীয় পাগলামীটা এই, যে কোনো মতে ভগবানের সাক্ষাৎ-দর্শন লাভ করিতে হইবে।…ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোনো-না-কোনো পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সংকল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। …যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, আমি সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্মের কথা মিথ্যা নয়, যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি।…তৃতীয় পাগলামী এই যে…আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল।'

"চিঠির শেষের দিকে অরবিন্দ লিখেছে—'জগতে ভগবানের কাজ করিতে আসিয়াছি, সেই কাজ আরম্ভ করি।…পরোপকার ও স্বার্থত্যাগের দিকে তোমার টান আছে, কেবলি এক মনের জোরের অভাব, ঈশ্বরের উপাসনায় সেই জোর পাইবে।'

"চিঠির শেষ পরিচ্ছেদের শুরুতে অরবিন্দ লিখেছে, 'এটাই ছিল আমার সেই গুপ্ত কথা।'

"এই চিঠির বিষয়বস্তু ছিল স্ত্রীকে হিন্দুধর্মের পথ অনুসরণ করতে অনুরোধ করা। তার স্ত্রী ব্রাহ্ম-স্কুলে শিক্ষিত সুতরাং তার কাছে অরবিন্দের জিজ্ঞাসা ছিল যে সে বিদেশী চিন্তাধারার অনুসরণ করবে, না হিন্দুধর্মের পথ অনুসরণ করবে? এইসব আলোচনা গুহ্য-তত্ত্বের নির্দেশক সুতরাং অরবিন্দের ইচ্ছা ছিল এইগুলি গোপনীয় রাখা। এই চিঠিটি কোনো মতেই ষড়যন্ত্রকারীর চিঠি হিসাবে ধরা যেতে পারে না, কারণ চিঠির মধ্যে ষড়যন্ত্রের নামগন্ধ নেই।

"অন্য কতকগুলি চিঠিপত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদগুলি আমার আলোচ্য।—

(ক) 'মাধব রাওকে বিশেষ কাজের ভার দিয়ে ইংলণ্ডে পাঠানো হয়েছে, আমাকে তার জন্য কিছু অর্থ পাঠাতে হবে। আমাকে স্বদেশী আন্দোলনের জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে এবং এছাড়া আমার অপর একটি আন্দোলনের পরিকল্পনা আছে যেটির জন্য অগণিত অর্থের প্রয়োজন হবে।' অভিযোগে বলা হয়েছে, এইগুলি সব বিপ্লবের নির্দেশসূচক। কিন্তু প্রতিবাদে বলা হয়েছে যে মাধব রাও অরবিন্দের ছাত্র। তাকে অরবিন্দ ইংলণ্ডে পড়াশুনা করবার জন্য পাঠায়। তার মারফতে অরবিন্দ ইংলণ্ডে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্রদের অর্থ সাহায্য করতো। এই পরিচ্ছেদে লিখিত—'অপর একটি আন্দোলনের পরিকল্পনা' অর্থে অরবিন্দের বিশ্বব্যাপী বেদান্তধর্ম আন্দোলনের পরিকল্পনাকে বুঝায়। অরবিন্দের লিখিত জবান-বন্দিতেও এই ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়।

(খ) ১৯০৫ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে লেখা একটি পত্রে অরবিন্দ বারীন্দ্রের অসুস্থতা এবং দেশ-সেবার উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণের কথা উল্লেখ করেছিল। সে লিখেছিল যে 'সরোজিনীকে বোলো না, বললে সে দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে যাবে।' বারীনের জবানবন্দি থেকে বারীন সম্পর্কে অরবিন্দের কথাগুলি সমর্থিত হয় বটে, কিন্তু বারীন্দ্রের দেশ-সেবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অরবিন্দ কতটা ওয়াকিফহাল ছিল তা বুঝতে পারা যায় না। এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত 'সরোজিনীর দুশ্চিন্তায় পাগল হওয়া' একটা স্বাভাবিক ঘটনা, কারণ ভাইয়ের ভগ্নস্বাস্থ্য বিষয়ে কোনো সংবাদ বোনকে স্বভাবতঃই বিচলিত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে পারে। এই চিঠিতে লিখিত—'সান্ধ্য প্রার্থনার সময় আগত প্রায়'—কথাগুলি থেকে অরবিন্দের ধর্মভাব সম্পর্কে বা ধর্মপথ অনুসরণের অভ্যাস সম্পর্কে একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

"১৯০৬ সালে লিখিত চিঠিগুলি থেকে কেবল মাত্র একটি প্রয়োজনীয় তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—অরবিন্দ আমিষ আহার পরিত্যাগ করেছে। ১৯০৭ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে অরবিন্দকে লিখিত একটি চিঠিতে মৃণালিনী 'তোমার কাগজ' অর্থে বন্দেমাতরম্

পত্রিকার কথা বলেছিল। ঐ সালে ৩রা ডিসেম্বর তারিখে লেখা আর একটি চিঠিতে অরবিন্দের কলকাতার বাড়ির বাজার-সরকার অবিনাশ সম্পর্কে মৃণালিনী মন্তব্য করেছিল যে, 'অবিনাশের বিয়ে হবার পর সে আর তোমার কাজ করতে পারবে না।' এই মন্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল অরবিন্দকে বাজার-সরকারের কাজের জন্য একটি উপযুক্ত লোকের সন্ধান করতে বলা; এছাড়া এই মন্তব্যের মধ্যে ষড়যন্ত্রের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। আরো কিছুদিন পরে ৬ই ডিসেম্বর তারিখের একটি চিঠিতে কংগ্রেস সম্পর্কে অরবিন্দের ভাব-গম্ভীর চিন্তার কথা বলতে গিয়ে চিঠির একটি অংশে সে লিখেছিল—সাধারণ বাঙালীর মত নিজের পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সে জীবনের যথাসর্বস্ব বলে মনে করে না। ২০শে ডিসেম্বর তারিখে মৃণালিনী দেবীর লিখিত পত্রে মৃণালিনী দেবীর নিজস্ব একটি বাসস্থান অরবিন্দ ব্যবস্থা না করে দেওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছিল—এই প্রসঙ্গে ১৯/৩ ছকু খানাসামা লেনের বাড়ির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯০৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লেখা অরবিন্দের একটি চিঠিতে সে তার স্ত্রীকে লিখেছিল, 'এই পত্র কাহাকেও দেখিতে দিবে না, কারণ যে কথা বলিয়াছি, সে অতিশয় গোপনীয়। তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও বলি নাই—বলা নিষিদ্ধ।' এই কথাগুলি অরবিন্দের ধর্মজীবনের নীতির নির্দেশক। এই চিঠি কখনই কোনো ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারে না।

"চিঠিগুলির বিষয়ে উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে অরবিন্দ সত্য সত্যই ধর্মনিষ্ঠ ছিল এবং সে চেয়েছিল যে মৃণালিনী দেবী সব দিক থেকে তার প্রকৃত সহধর্মিণী হোক। এইসব চিঠিপত্রের কোনো কোনো বক্তব্য সন্দেহের উদ্রেক করলেও প্রতিটির মধ্যে সহজ নির্দোষ বক্তব্যের ভাব সুস্পষ্ট। ১৯০৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে দেশপাণ্ডে অরবিন্দকে বরোদার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যা লিখেছিল তার মধ্যেও আমি ক্ষতিকারক কিছুর সন্ধান পাইনি।

"আদালতের ২৯৩।৯ নথিভুক্ত প্রমাণ চিঠিটি অরবিন্দের লেখা বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সম্পর্কীয়। এই চিঠির মধ্যে নির্দোষ উক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ এর ভিত্তিতে বিপ্লব বা বিদ্রোহের কোনো সিদ্ধান্ত করা যায় না।

"বিষ্ণুগোবিন্দ লেলের সম্পর্কে অরবিন্দ তার জবানবন্দিতে বলেছে যে লেলেকে সে থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভ্য হিসাবে এবং একজন ধর্মপ্রাণ চিন্তাশীল মানুষ হিসাবে জানতো। অরবিন্দ লেলের রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল না। এই মন্তব্যের অনুকূলে চিঠির একটি অংশ উদ্ধৃত করছি—'প্রেম ও শান্তি নিবেদনান্তে আপনারই "অরবিন্দ ঘোষ"।' আদালতের ২৯২।৬ নম্বর নথিভুক্ত প্রমাণ অপর একটি চিঠি যাতে অরবিন্দ বারীন্দ্রকে 'খামখেয়ালী, বিভ্রান্ত এবং পরিবারের চিন্তার কারণ' হিসাবে বর্ণনা করেছে। এই উক্তিটি অরবিন্দের আদালতের নিকট প্রদত্ত লিখিত বিবৃতির ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

"অরবিন্দের বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত ভাষণগুলির মধ্যেও মামলার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সাক্ষী (যারা ১৯০৮ সালের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অরবিন্দের ভাষণগুলি শুনেছে এবং লিপিবদ্ধ করেছে) তাদের সাক্ষ্যে যা বলেছে তা থেকে ঐসব অঞ্চলে অরবিন্দের অভাবনীয় জনপ্রিয়তার লক্ষণ ছাড়া অন্য কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় না। এই সাক্ষ্যগুলি অরবিন্দের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি প্রমাণ করা অপেক্ষা খণ্ডন করতেই বেশি সাহায্য করে। জাতীয়তাবাদী শিক্ষার প্রচারক হিসাবে অরবিন্দের ভাষণগুলিতে মূল বক্তব্য ছিল—ভারতের মুক্তি আসবে অন্তর্লোকের আবাহনে, বহির্জগতের অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বরের মাধ্যমে নয়। এই প্রসঙ্গে অরবিন্দের উক্তি, 'স্বদেশীর জন্য জীবন এবং স্বদেশীর জন্য মরণ'—একটি অতিশয়োক্তি বিবেচনায় আদালতের নিকট উপেক্ষণীয়।

"১৯০৮ সালের ৩রা এপ্রিল তিন্নেভেলীর বিপ্লবীদের সমর্থনে

ভাষণ দেবার সময়ে অরবিন্দ তার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের মাধ্যমে বলেছিল যে 'মন-প্রাণ দিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবার, কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করবার, এবং দেশের জন্য যুদ্ধ করবার সময় এসেছে,—দেহ, মন, বুদ্ধিকে প্রস্তুত করবার এই হোলো মাহেন্দ্রক্ষণ'। অরবিন্দ জনগণকে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে আহ্বান জানিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আদালতের নথিভুক্ত ২৮৩ এবং ২৯১৯ নম্বরের প্রমাণ দুটি অরবিন্দের বাড়ি তল্লাসীর সময়ে পাওয়া গেছল। এই রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়নি ; সুতরাং সেগুলিকে কেবলমাত্র অরবিন্দের চিন্তার আলেখ্য হিসাবে ধরা যেতে পারে।

"বিদেশী পণ্য বর্জন নীতির পক্ষে অরবিন্দের মূল বক্তব্য ছিল—অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে বল-প্রয়োগ করার যৌক্তিকতা। 'আমরা ইংরাজদের ঘৃণা করি না কিন্তু ভারতের প্রতি ইংরাজদের শোষণ-নীতির বিরোধিতা করি। কারণ দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রের স্বার্থ সাধারণত এক হতে পারে না। সুতরাং তাদের দেশের পণ্য বর্জন করে আমরা তাদের শোষণ-নীতির প্রতিবাদ করতে পারি। বর্জন করা উদ্দেশ্য দেশের জনগণের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বলে নীতিগতভাবে বর্জন করা অন্যায়ের পর্যায়ে পড়ে না। যা অন্যায় নয় সেই কাজের সফলতার জন্যে প্রয়োজন বোধে বল-প্রয়োগ করা যেতে পারে—অবশ্য বল প্রয়োগ করার উপযুক্ত হোলে। কেবলমাত্র একটি নিছক দার্শনিক চিন্তার নিদর্শন ছাড়া এই লেখার মধ্যে সত্যিকারের কিছু পাওয়া যায় না। এই লেখাটি আদালতের ২৮৩ নম্বর নথিভুক্ত প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত।

"২৯১৯ নম্বর নথিভুক্ত প্রমাণে যে প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেটি আরও অসাধারণ। এই প্রবন্ধটির সারমর্ম হোলো জাতীয়তাবাদীর একমাত্র লক্ষ্য জাতীয় অভ্যুত্থান। জাতীয়তাবাদীরা নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি সশ্রদ্ধ থাকবে কারণ নিয়ম-শৃঙ্খলা ব্যতীত জাতীয়

অভ্যুত্থান সম্ভব নয়। কিন্তু এই নিয়ম-শৃঙ্খলা জনগণের ইচ্ছার পরিপন্থী হোলে চলবে না। যদি পরিপন্থী হয় তাহলে তা জনগণের স্বার্থ-বিরোধী এবং জনগণের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠা পালনে অক্ষম। এই কারণে সেই অনুপযুক্ত নিয়ম-শৃঙ্খলাকে অমান্য করা উচিত। জাতীয়তাবাদী চরম অত্যাচারের ভয়ে ভীত নয়। সে সব যম-যন্ত্রণা হাসিমুখে জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য সহ্য করতে সক্ষম।

"অরবিন্দের চিন্তার সঙ্গে ইউরোপীয় দার্শনিকদের চিন্তার যথেষ্ট সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপের জাতীয় অভ্যুত্থানের যতগুলি ইতিহাস আছে সেগুলির মধ্যে জনগণের স্বার্থবিরোধী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনকেই বিপ্লবের কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে। তার পার্থক্য হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে ইউরোপের শাসক এবং শাসিত জনগণ একই জাতিভুক্ত, কিন্তু এখানে তা নয়। রচনার মাধুর্য বিচারে প্রবন্ধটি অপূর্ব বিশিষ্টতার অধিকারী। কিন্তু অপরিণত বা ভাবপ্রবণ মনের কাছে এই ধরনের প্রবন্ধ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে—আমার মতে, বোধহয় প্রবন্ধের লেখক সেই আশঙ্কাতেই প্রবন্ধটি প্রকাশ করেনি।

"উপরোক্ত দুটি প্রবন্ধই অপ্রকাশিত থাকায় এদের ভিত্তিতে অরবিন্দের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা যায় না অথবা অরবিন্দকে ষড়যন্ত্রকারী বলা চলে না।

"মিস্টার নর্টন তাঁর সওয়ালে 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি আলোচনার উপর অভিযোগ প্রমাণের উপাদান আছে বলে যে জোরালো যুক্তি দেখিয়েছেন সেগুলি আমার মতে ঠিক নয়। এই সব প্রবন্ধের লেখক আলোচনার মাধ্যমে এক-ই আদর্শের জন্য বিভিন্ন মত ও পথের উল্লেখ করে বলেছে, স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কোনো কাজ করা দূষণীয় নয়। আমার মতে আদর্শের মধ্যে কোনো দোষ ছিল না তবে আদর্শলাভের কয়েকটি পদ্ধতির মধ্যে দুষ্টভাব লক্ষ্য করা যায়।

"২৯২/৮ নম্বর নথিভুক্ত-প্রমাণটির মধ্যে একটি মারাত্মক

হিংসাশ্রয়ী রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। রচনাটি আপাতদৃষ্টিতে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কীয় বলে মনে হয়। কিন্তু লেখাটির হস্তাক্ষর কোনো মহিলার— অরবিন্দের নয়।

"১৮২ নম্বরের প্রমাণটি হচ্ছে উপেন্দ্রকে ২৩, স্কট লেনের ঠিকানায় লিখিত রামচন্দ্র প্রভুর একটি চিঠি। ঐ চিঠিতে লেখক অরবিন্দকে সরল শিশুর মত নিষ্পাপ মহাত্মাপুরুষ অথচ জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করেছে। লেখকের মতে এমন চরিত্র-সংযোজন পৃথিবীতে বিরল।

"৩৮৫।২ নম্বরের প্রমাণটির উপর সরকার পক্ষের কৌঁসুলী বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই প্রমাণটি 'ভাই ডাক্তার' সম্বোধনে জনৈক গোবিনের লেখা একখানি চিঠি। চিঠির এক জায়গায় লেখা ছিল, 'এই রকম কর্তা পছন্দ করে দেওয়ার জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি'। অভিযোগকারীর পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে 'কর্তা' অর্থে অরবিন্দ এবং 'ভাই ডাক্তার' সম্বোধনটি উপেনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে অরবিন্দের কৌঁসুলী বলেছেন যে চিঠিখানি অরবিন্দের প্রতিবেশী কোনো একজন ডাক্তারের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল। চিঠিতে যে ২৩ নম্বর বাড়ির উল্লেখ রয়েছে সেটি ২৩ নম্বর স্কট লেন নয়—ঐ বাড়িটি ২৩ নম্বর সুরেন দাস লেনে অবস্থিত। আরও বলা হয়েছে যে অরবিন্দকে 'কর্তা' সম্বোধন করা হোতো না—'কর্তা' বলতে বারীনকেই বোঝানো হোতো।

"৯৯২ নম্বর প্রমাণটির ভিত্তিতে বড়জোর বলা যেতে পারে যে অরবিন্দের সঙ্গে মেদিনীপুরের ছাত্রভাণ্ডারের একটা যোগাযোগ ছিল।

"অরবিন্দ বন্দেমাতরম্ পত্রিকার অংশীদার ছিল এবং ঐ পত্রিকাতেই ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করা হয়েছিল সুতরাং অরবিন্দ ষড়যন্ত্রকারী—এই যুক্তিটি প্রমাণ করতে ১০৯৯ নম্বরের প্রমাণ-দলিলটি মোটেই সাহায্য করে না। কারণ ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার এমন কোনো সংখ্যা আমাকে দেখানো হয়নি। যদি এই ধরনের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহলে

অপরাধীকে অর্থদণ্ডের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে—অন্য কোনো গুরুদণ্ডের অধিকারী সে হতে পারে না। সেই রকম ৯৯০ নম্বরের প্রমাণ—যুগান্তর পত্রিকার পিওন-বুক। ঐ পিওন-বুক থেকে জানা যায়, অরবিন্দ কোনো একদিন ঐ পিওন-বুকে সই করে যুগান্তর পত্রিকার দুখানি চিঠি নিয়েছিল। অরবিন্দের সঙ্গে যুগান্তরের সম্পর্ক প্রমাণের পক্ষে এই দলিলটির কোনো গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি না।

"২৩৯ নম্বরের নথিভুক্ত প্রমাণটি অরবিন্দের বিরুদ্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসাবে দাবি করা হয়েছে। এই প্রমাণটি একটি সংকেত-পত্র। এই পত্রে লেখা ছিল : 'J. B.-কে A. G.-র গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করতে হবে। A G. নিষ্কৃতি পেতে চাইছে। Dr. Dhude-কে বাগানে রাখতে হবে এবং উল্লাস, A. G., B. G.-কে জানানো হয়েছে'। এই সংকেত-পত্রে A.G. বলতে যদি অরবিন্দকে বুঝতে হয় তাহলে প্রমাণটি অরবিন্দের বিরুদ্ধে যায় কিন্তু ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়নি। একমাত্র নরেন গোঁসাই প্রমাণ দিতে পারতো কিন্তু সে এখন মৃত। অরবিন্দের পক্ষে বলা হয়েছে যে A.G. অর্থে অরবিন্দ বুঝতে হলে বলা যেতে পারে—বারীন অরবিন্দকে সব সময়েই বলে এসেছিল যে তারা একটা ধর্মীয় সংস্থা (বাগানে) গঠন করেছে কিন্তু ব্যাপারটি অন্যরকম প্রকাশ পাওয়ায় অরবিন্দ বিরূপ হয়েছিল। এই রকম ব্যাখ্যা করলে A. G. কে বোঝা গেলেও J. B. এবং Dr. Dhude বলতে কারা সেটা বুঝতে পারা যায় না।

"বলা হয়েছে, অরবিন্দ ১৯০৬ সালের মাঝামাঝি বরোদার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে কলকাতায় চলে আসে। তারপর সে তার জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা শুরু করে ছাত্রভাণ্ডার এবং বন্দেমাতরম্ সংস্থা দুটি স্থাপনার মাধ্যমে। অরবিন্দ স্বীকার করেছে যে বন্দেমাতরম্ সংস্থার প্রথম পর্বে সে কিছুদিনের জন্য সংস্থার প্রধান ব্যবস্থাপক ছিল কিন্তু ছাত্রভাণ্ডারের সঙ্গে তার সম্পর্ককে সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। ছাত্রভাণ্ডারের দলিল সই করার সময় সে সুবোধ মল্লিকের

বাড়ি উপস্থিত থাকায় শুধুমাত্র সাক্ষী হিসাবে সে দলিলে সই করেছিল—সে ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছিল। এই যুক্তি সত্য বলেই আমি মনে করি। সুবোধ মল্লিক জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী কলেজ তৈরি করবার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেছিল সুতরাং অরবিন্দের সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ থাকার মধ্যে দূষণীয় কিছু থাকতে পারে না।

"অরবিন্দ ১৮ই এপ্রিল কলকাতায় ছিল কি না? অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে প্রমাণ করবার চেষ্টা হয়েছে অরবিন্দ ১৭ই এপ্রিল করিমগঞ্জে যায়নি এবং ১৮ই এপ্রিল তাকে কলকাতায় দেখা গেছে। ১১৪ নম্বরের সাক্ষী, ১৫ নম্বর গোপীমোহন দত্ত লেন যে অঞ্চলে অবস্থিত সেখানে, ডাকঘরের পিওন হিসাবে চিঠি বিলি করতো। সে তার সাক্ষ্যে বলেছে যে ১৮ই এপ্রিল চিঠি বিলি করবার সময় সে অরবিন্দের মতো একজনকে দেখেছিল। এই সাক্ষীর সাক্ষ্যকে আমি খুব নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না কারণ সাক্ষী যে অরবিন্দকেই দেখেছিল এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

"আমি এইবার অরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রদত্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করবো। এইগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হোলো ২৯৫ নম্বরের নথিভুক্ত প্রমাণটি—অরবিন্দ ঘোষের থাকবার ঘরে তল্লাসীর সময়ে সংগৃহীত ১৯০৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে লিখিত 'মিষ্টান্নের চিঠি'। চিঠিখানি যে খামের ভিতর ছিল সেই খামের উপর লেখা ছিল—'অরবিন্দ ঘোষ', 'গোপনীয়'। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে চিঠিখানি বারীনের লেখা। অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনকারী কৌঁসুলী বলেছেন—চিঠিটি জাল ; যদি তাই হয় তাহলে চিঠিটি জালিয়াতির একটি সুন্দর নিদর্শন।

"অভিযোগে বলা হয়েছে 'মিষ্টান্ন' শব্দটি 'বোমার' পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছিল। আরো বলা হয়েছে যে চরমপন্থীরা কংগ্রেস অধিবেশনের প্রথম দিনে সাফল্য লাভ করবার পর এতই উৎফুল্ল হয়েছিল যে বারীন অরবিন্দকে ঐ চিঠির মাধ্যমে তাদের 'বাগবাজার'

এবং 'মুরারিপুকুর' ষড়যন্ত্র-ঘাঁটির পরিকল্পিত কার্যপ্রণালীকে সারা দেশে ছড়াতে অনুরোধ করেছিল। মিস্টার ডেনহামের সাক্ষ্যে জানা গেছে যে ঐ চিঠিটি সংগ্রহ করে এনেছিলেন মিস্টার ক্রীগ্যান। মিস্টার ক্রীগ্যান বলেছেন—তল্লাসীর সময় ৪৮ নম্বর গ্রে স্ট্রীটে তিনি ঐ চিঠিখানি পেয়েছিলেন এবং আইন অনুযায়ী চিঠির উপর নিজের স্বাক্ষর (initial) রেখেছিলেন কিন্তু স্বাক্ষরটি ২রা মে তারিখে অর্থাৎ তল্লাসীর সময়ে বা দিনে রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন—স্বাক্ষরের তলায় তারিখটি অন্যলোকের হাতের লেখা বলে বুঝতে পারা গেছে।

"অরবিন্দের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে চিঠিটি জাল এবং জাল করেছে শরৎ দাস। যদিও শরৎ দাস এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

"আমি মনে করি চিঠিটি বারীন অরবিন্দকে লেখেনি। চিঠিটি পড়ে আমার এই সিদ্ধান্তটি মনে এসেছে। বারীন ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এবং অরবিন্দ তৃতীয়। এ্যাসেসারগণ বলেছেন যে স্বাভাবিকভাবে অরবিন্দের উদ্দেশ্যে চিঠিতে বারীনের সম্বোধন করার কথা 'প্রিয় সেজদা' বলে। অরবিন্দ ভাইয়েদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ হলে 'প্রিয় ভাই' বলে সম্বোধন করা সম্ভব হোলেও হোতে পারে। আমার কাছে এই যুক্তি সন্দেহাতীত।

"আমার এ কথাও মনে হয়েছে—যা আমার নিজস্ব মন্তব্য—যে বারীনকে যখন আত্মীয়-স্বজন মহলে 'বারী' নামেই ডাকা হয়, তখন সে তার দাদাকে লেখা চিঠিতে 'বারী' না লিখে 'বারীন্দ্রকুমার ঘোষ' লিখবে কেন? দুই ভাইয়ের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। তা ছাড়া দুই ভাইই যখন সুরাটে ছিল তখন এইভাবে চিঠি লেখার স্বপক্ষেও আমি কোনো যুক্তি দেখছি না। যদিও আমি জানি যে, এই প্রমাণটি অরবিন্দের বাড়ি তল্লাস করবার সময়ে ২রা মে তারিখে পাওয়া গেছল, তবুও আমার কাছে প্রমাণটি নানা কারণে সন্দেহযুক্ত মনে হওয়ায় আমি প্রমাণটি গ্রাহ্য হিসাবে নিতে পারলাম না। অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে এই ধরনের কাজে

যখন গুপ্তচরদের লাগানো হয়ে থাকে তখন কিছু কিছু প্রমাণ স্বপ্নাতীতভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তির বাড়ীতে প্রবেশ করে থাকে—ব্যাপারটি এমনভাবে ঘটে যে অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষেও কি ভাবে ঘটলো তা বলা সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে ২৯৯।৭ নম্বরের নথিভুক্ত প্রমাণটিও আমি অগ্রাহ্য করলাম। এটিও ঠিক আগের মত রহস্যজনকভাবে অরবিন্দের বইয়ের মধ্যে প্রবেশ করেছিল—যার অস্তিত্ব অরবিন্দের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এটি ছিল একটি নোটবুকের ছেঁড়া পাতায় লেখা নিরর্থক কতকগুলি কথা—এই লেখার সঙ্গে অরবিন্দের হাতের লেখার কোনো সাদৃশ্যও ছিল না। এবং অরবিন্দ বলেছে যে বইটি যতদিন অরবিন্দের কাছে ছিল ততদিন পর্যন্ত ঐ নোটবুকের ছেঁড়া পাতাটি বইয়ের মধ্যে ছিল না। সুতরাং 'মিষ্টান্নের চিঠি'-র মতই এই প্রমাণটিও তৈরি হয়েছিল।

"৩০০।২১ নম্বরের প্রমাণ সুধীরকুমার সরকারের নামে একটি চিঠি। এই চিঠির মধ্যে এমন কিছুই লেখা ছিল না যা অরবিন্দের বিরুদ্ধে গ্রহণীয়। বাকী নথিভুক্ত প্রমাণগুলির মধ্যেও উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া যায় না।

"সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে অরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রমাণগুলি হোলো :

(১) একটি রহস্যাবৃত আন্দোলনের পরিকল্পনা যার জন্য অফুরন্ত অর্থের প্রয়োজন।

(২) অবিনাশ বাড়ির কাজ না-করে অন্য কিছু করেছে—এই সংবাদটি।

(৩) নানা অছিলায় মুরারিপুকুরের বাগানবাড়ি বিক্রি না করা।

(৪) সুবোধ মল্লিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব। লেলে এবং প্রভুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। ষড়যন্ত্রকারী অবিনাশকে চাকরি দিয়ে প্রতিপালন করা। উপেন, বীরকুমার, হৃষীকেশ, বীরেন সেন এবং সুধীরের সঙ্গে মেলামেশা করা। মেদিনীপুর ছাত্রভাণ্ডারের সঙ্গে জড়িত থাকা।

(৫) ২৩৯ নম্বরের প্রমাণটি।

(৬) নোট বইয়ের ছেঁড়া পাতা এবং মিষ্টান্নের চিঠি।

"উপর্যুক্ত প্রমাণগুলির ভিত্তিতে অরবিন্দকে ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে অভিযুক্ত করতে আমি যথেষ্ট দ্বিধা বোধ করছি। সুতরাং দেখা যাক—অরবিন্দের অভিযোগের বিরোধী প্রমাণ কি কি পাওয়া গেছে ঃ

(১) বন্দেমাতরম্ পত্রিকার আলোচনায় হিংসাত্মক কার্যকলাপকে বর্জন করতে অনুরোধ করা।

(২) স্বদেশী আন্দোলনকে গুপ্তসমিতির কার্যক্রমে পরিণত করার বিরোধিতা করা।

(৩) অরবিন্দের রচনাগুলিতে প্রচারিত উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী এবং তার কর্মপদ্ধতির মধ্যে অসামঞ্জস্য না থাকা।

(৪) অরবিন্দের প্রকাশিত রচনাগুলির বিষয়বস্তু জাতীয় অভ্যুত্থানের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকা।

আমার মতে—উল্লিখিত প্রমাণগুলি অরবিন্দের বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত গুরুতর অভিযোগের সত্যতা প্রতিপন্ন করতে সাহায্য করে না।

"এই মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে বারীন, উল্লাসকর, এবং বিভূতিকে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হোলো। এদের সঙ্গে উপেন, হৃষীকেশ, বীরেন সেন, সুধীর, ইন্দ্রনাথ, অবিনাশ, ইন্দুভূষণ, শৈলেন্দ্র, হেমচন্দ্র দাস, পরেশ, শিশির এবং নিরাপদ জনসংগ্রহ, অস্ত্র-সংগ্রহ এবং রাজদ্রোহের প্রস্তুতির কাজে সাহায্যকারী হিসাবে অভিযুক্ত হোলো।

"উভয় এ্যাসেসর মহোদয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে আমি মনে করি যে নরেন বক্সী, শৈলেন্দ্র সেন, নলিনী গুপ্ত, পূর্ণ সেন, বিজয় নাগ, কুঞ্জলাল সাহা, হেমেন্দ্র ঘোষ, ধরণী গুপ্ত, বীরেন্দ্র ঘোষ,

বিজয় ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র সেন, প্রভাসচন্দ্র দে, দীনদয়াল বোস, নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক, দেবব্রত বোস এবং অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে আনীত (ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১, ১২১এ, ১২২ এবং ১২৩ ধারাভুক্ত) অভিযোগ অনুযায়ী তাদের অপরাধী সাব্যস্ত করা গেল না।

স্বাক্ষর : সি. পি. বীচক্রফট্,
অতিরিক্ত দায়রা জজ,
আলিপুর।
৬ই মে, ১৯০৯।" (১৮)।

"৫ই মে আলিপুরে কারাবাস আরম্ভ। পর বৎসর ৬ই মে নিষ্কৃতি পাই।"(১৭)

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ৫ই মে তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট থর্নহিলের আদালতে উপস্থিত হবার পর তাঁর এটর্নি ম্যানুয়েল সাহেবকে যা বলেছিলেন সেই উক্তির পুনরাবৃত্তি করছি। "ম্যানুয়েল সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুলিসে বলে আপনার বাড়িতে অনেক সন্দেহজনক কাগজ পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ চিঠি কি কাগজ, ছিল কি ? আমি বলিলাম, 'নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ছিল না ; থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব।' অবশ্য তখন মিষ্টান্ন পত্র (Sweets letter) বা Scribbling (in the torn page of a note book)-এর কথা জানিতাম না। আমার আত্মীয়কে (কুমার কৃষ্ণ দত্তকে) বলিলাম, 'বাড়িতে বোলো কোনো ভয় যেন না করে, আমার নির্দোষিতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইবেই'। আমার মনে তখন হইতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল ইহা হইবেই।"(১৭)। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে যে শ্রীঅরবিন্দের আত্মবিশ্বাস কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার প্রভাবে আসেনি ; কারাজীবনের শুরুতেই তিনি জানতেন—মিথ্যা অভিযোগে সত্যাশ্রয়ীর জয়যাত্রা ব্যাহত হবে না।

প্রাক্-পণ্ডিচেরী বৃত্তান্ত

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকারবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগবিশিষ্যতে ॥
—গীতা ৫।২

শ্রীঅরবিন্দ ষড়যন্ত্রের ও রাজদ্রোহের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাবার পর তাঁর লীলা-সহচর শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত এবং শ্রীবিজয় নাগকে সঙ্গে নিয়ে আসাম পরিভ্রমণে গেলেন। আসাম থেকে ফিরে এসে বাংলা সাপ্তাহিক 'ধর্ম' এবং ইংরাজী সাপ্তাহিক 'Karmayogin' প্রকাশে মনোনিবেশ করলেন। এই সময়ে তিনি তাঁর মাসীমার বাড়িতে থাকতেন এবং পত্রিকার কার্যালয় করেছিলেন ৪ নম্বর শ্যামপুকুর লেনের একটি বাড়িতে। শ্যামপুকুর লেনের বাড়িতে পত্রিকার অফিসের সঙ্গে নলিনীবাবু এবং বিজয়বাবুর থাকবার ব্যবস্থাও উনি করেছিলেন।

'কর্মযোগিন্' এবং 'ধর্ম' পত্রিকার লেখার মধ্যে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ প্রচার করতে লাগলেন সনাতন হিন্দুধর্মের বাণী, দেশবাসীর সামনে তুলে ধরলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের সাধনার আদর্শ এবং সাধন পথে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিতগুলি। যে সাধনার মাধ্যমে ভারত মহীয়ান হয়ে উঠেছিল সেই সাধনালব্ধ শক্তি অবক্ষয়িত হওয়ায় ভারতীয়েরা তাদের দেবভাব হারিয়ে ফেলেছে। দিব্য-ভাবের অভাবে শুধুমাত্র সংস্কারগুলির বশবর্তী হয়ে ভারতের জনগণ মৃতবৎ জীবন-যাপন করছে এবং তাদের সমাজ-জীবনে উত্তরণের পরিবর্তে উত্তরোত্তর অধোগতি দেখা দিয়েছে। নিমজ্জমান জাতির পুনরভ্যুত্থানের জন্য অতীতের সেই সাধনপদ্ধতিকে জানতে হবে, অনুসরণ করতে হবে

যাতে সমগ্র জাতির, প্রতিটি দেশবাসীর আত্মা অমৃতলোকের সন্ধান পায়।

এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের প্রাসঙ্গিক চিন্তা যে ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছিল তার নিখুঁত ধারণা পাওয়া যায় ১৯০৯ সালের ৩০শে মে হুগলী জেলার উত্তরপাড়ায় অভিনন্দন সভায় প্রদত্ত শ্রীঅরবিন্দের বাণীতে ঃ

হিন্দুধর্মই প্রকৃতপক্ষে সনাতন ধর্ম। কারণ তা সর্বকালের এবং সর্বজনের পক্ষে উপযোগী—যদি তা না হত তাহলে সেটা সনাতন আখ্যা পেত না।...সনাতন হিন্দুধর্মই মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছে—ভগবান মানুষের কাছেই অতি প্রিয়জনরূপে আছেন এবং তাঁকে পাবার সব সাধনপথই এই ধর্মের পরিধিতে পড়ে। এই ধর্ম সত্যাশ্রয়ী—যার মূল কথা হচ্ছে, ভগবান সকলের মধ্যে ও সব কিছুতেই রয়েছেন এবং ভগবানের মধ্যেই আমরা বাস করছি, যাতায়াত করছি। এই ধর্ম ঐ সত্যকে শুধু বুঝতে ও বিশ্বাস করতে আমাদের সাহায্য করে না, আমাদের সমস্ত সত্তা দিয়ে সেটিকে উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য করে। যার সাহায্যে আমরা সহজেই বুঝি জগৎটা কি ? বুঝি যে জগৎটা হচ্ছে বাসুদেবেরই লীলা—যে লীলার মধ্যে কিভাবে আমাদের চলতে হবে এবং লীলার মাধুর্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি। এর মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ঘটনাতেও আমরা যেমন ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকি তেমনি এর মধ্যেই অমৃতত্বলাভের বা মোক্ষের সেই মহান পরিণামের সম্ভাবনার সঙ্গেও আমরা সদাই যুক্ত রয়েছি।...সনাতন ধর্মের সঙ্গেই হিন্দুজাতির উদ্ভব হয়েছিল ; সেই ধর্মকে আশ্রয় করেই হিন্দুজাতি এগিয়ে চলেছে এবং ক্রমবিকশিত হচ্ছে। সেই ধর্ম সম্পর্কীয় উপলব্ধির যখন অভাব ঘটেছে তখন তারা পিছিয়ে পড়েছে একথা সত্য হলেও তারা এতদিনেও যে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়নি তার একমাত্র কারণ হল—সনাতন ধর্ম অবিনশ্বর। সনাতন ধর্মই আমাদের জাতীয়তা—এবং এটাই আজ আপনাদের কাছে আমার বাণী।”

সমগ্র জাতির কাণ্ডারী, জনকল্যাণের মূর্ত-চেতনা, শ্রীঅরবিন্দের

দিব্যচিন্তা দেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতি-উদ্ভূত প্রধান সমস্যাগুলিকে কখনও অবহেলা করেনি। তাই ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হুগলীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে তিনি জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্ব দিতে সম্মত হন। এই সম্মেলনে তাঁর দিব্যশক্তিসমৃদ্ধ অপরাজেয় ব্যক্তিত্বের সামনে মধ্যপন্থীরা জাতীয়তা-বাদী দলের মত ও পথের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হোলো। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে এই সম্মেলন শেষ হওয়ায় প্রমাণিত হোলো—শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী ছিলেন না। সুরাট কংগ্রেস অধিবেশন পণ্ড হওয়ার পর থেকে মধ্যপন্থীরা প্রচার করেছিলেন যে, "Aurobindo was at the root of all disorder and violence."। হুগলীতে শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে অখণ্ডতা পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলন শেষ হওয়ার পর শ্রীঅরবিন্দ পূর্ববঙ্গ সফরে যান।

এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ দেশবাসীকে স্ব স্ব শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে জাতীয় অভ্যুত্থানের কাজে আত্মদান করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কারণ তিনি রাজনৈতিক নেতাদের উত্থান, পতন এবং মত ও পথ পরিবর্তনের আকস্মিক প্রভাবের ঘূর্ণাবর্তে দেশের ও দেশবাসীর ভাগ্যকে দিগভ্রান্ত করার বিরোধী ছিলেন। তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে ভারতের ইতিহাসের অন্তর্নিহিত রহস্যের মূল সূত্রটি ধরা পড়েছিল। অতীতের কোনো এক শুভ লগ্নে দৈব-নির্দিষ্ট পথেই ভারতের জন্ম, এবং সেই পথেই ভারতের মাটিতে বিধাতার প্রতিভূ বিশিষ্ট যোগীশ্বরদের সমন্বয় ঘটেছিল, যুগে যুগে। এঁদের পরা-চৈতন্যের তেজস্ক্রিয় প্রভা-সমৃদ্ধ লেখনী থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল পরা-বিদ্যাশ্রয়ী এক অনন্য নিরপেক্ষ ধর্ম-নীতি বা 'সনাতন ধর্ম'। সনাতন ধর্মের সার বস্তু বেদে ছিল প্রতীকাশ্রয়ী ভাবে, যা ভাষ্যে পরিণত হয়েছিল উপনিষদে, এবং যার লক্ষ্য ও আদর্শ ব্যক্ত হয়েছিল বেদান্তে। এই সব ভাষ্য আলোচনা-সমালোচনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল দর্শনে, সাধারণের বোধগম্য করে পরিবেশিত হয়েছিল পুরাণে, এবং একটি সুপরিকল্পিত

সাধন-পথের নির্দেশ ছিল যোগশাস্ত্রে। সনাতন ধর্মের উৎস পরা-চৈতন্য এবং সনাতন ধর্মের পুরোধা স্বয়ং পুরুষোত্তম। সুতরাং সনাতন ধর্মাশ্রয়ীদের বিপৎকালে স্বয়ং পুরুষোত্তম বাসুদেব আবির্ভূত হন সনাতন ধর্ম সংরক্ষণের জন্য। সনাতন ধর্ম স্রষ্টার নির্দেশে নিরপেক্ষভাবে সৃষ্টিকে অভ্যর্থনা জানায়, রক্ষা করে, এবং স্রষ্টার কাছে প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করে। এই পথ-পরিক্রমা সৃষ্টির ইচ্ছায় হয় না, স্রষ্টার ইচ্ছাতেই হয় সুতরাং সনাতন ধর্ম দৈব-নির্দিষ্ট পথেই চলে। সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টা বন্দী-জীবন যাপন করছেন সুতরাং তিনি মুক্ত হবেন-ই —তাঁর নিজের ইচ্ছাতেই। দৈব-নির্দিষ্ট সনাতন ধর্মের প্রতিটি নীতির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে সমর্পণের মন্ত্র—"তোমাকে মুক্তি দেবার যোগ্য করে নাও" ; প্রচ্ছন্ন থাকে আবেদনের মন্ত্র—"আমাকে তোমার কাছ থেকে বিযুক্ত করে রেখো না ; তোমার সঙ্গে যুক্ত হলেই তোমারও ছুটি এবং আমারও ছুটি" ; প্রচ্ছন্ন থাকে আর একটি নিবেদন বা প্রার্থনা—"ছুটিতে অলস হয়ে থাকব না ; তোমার কাজ করব ; তুমি যাদের মধ্যে বা যেখানে-যেখানে বন্দী হয়ে কষ্ট পাচ্ছ তাদের জাগাব, তাদের তোমার সঙ্গে যুক্ত করে দিতে সাহায্য করব—যাতে তারা আমার মত মুক্ত হয়ে, আমার মতই তোমার কাজে (অর্থাৎ মুক্তি-আন্দোলনের কাজে) নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে পারে।—জীবনের সব কাজে তুমিই নেতা, তুমিই কর্তা।"—সেই এক সুর, "নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়"।

শ্রীঅরবিন্দ বাংলার পূর্ব অঞ্চল সফর শেষ করে কলকাতায় ফিরে তাঁর মানস-সন্তান দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীকে জাতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম ও স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহশীল এবং সক্রিয় করে তুলতে লাগলেন। এইভাবে পুরো একটি বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে দেশে মিন্টো-মর্লি সংস্কারনীতি প্রবর্তিত হয়েছে। এই প্রবর্তনে অনেকেই বেশ আশ্বস্ত হয়েছেন, এমনকি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেও অনেকে তৃপ্ত হয়েছেন। যদিও জাতীয় আন্দোলন তখনও নিষ্প্রভ হয়নি তবুও শ্রীঅরবিন্দ বুঝেছিলেন যে আন্দোলনে ভাটা

পড়তে শুরু হয়েছে এবং দেশবাসী তাঁর প্রস্তাবিত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করবার উৎসাহ এবং প্রস্তুতি হারিয়ে ফেলছে। কিন্তু আন্দোলনের সাফল্য এবং দেশবাসীর আগ্রহের প্রতি তাঁর আস্থা তখনও অটুট ছিল। ১৯০৯ সনের ১৭ই মে ইংরেজ সরকার একটি গোপন সার্কুলার (No. 810 P-D) জারি করলেন, তাতে রাজদ্রোহ ও বিপ্লব আন্দোলন বন্ধ করবার উপায় সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হোলো এবং এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের উপর গোয়েন্দা বিভাগের সতর্ক দৃষ্টি অব্যাহত ছিল। তাঁর সম্পাদিত ধর্ম ও কর্মযোগিন্ পত্রিকার উপর পুলিসের কড়া নজর ছিল।

সব অবস্থার সংমিশ্রণে পরিস্থিতি ক্রমশঃ জটিল হয়ে শ্রীঅরবিন্দের মনে অশুভ মুহূর্তের ইঙ্গিত দিয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ মনে মনে এক অজ্ঞাতবাসের নির্দেশ পাচ্ছিলেন। সুতরাং ১৯০৯ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে কর্মযোগিন্ পত্রিকায় তিনি দেশবাসীর কাছে জাতীয় আন্দোলনের ভাবী পদক্ষেপ সম্পর্কে তাঁর সময়োচিত বক্তব্যটি প্রকাশ করলেন। তিনি নিজেই ঐ বক্তব্যটির নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়েছিলেন:

(১) আত্মনির্ভরশীল হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে অসহযোগের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে সঞ্জীবিত করা।

(২) সরকারের নীতির প্রতি সংযতভাবে উদাসীন হওয়া।

(৩) মধ্যপন্থীদের সঙ্গে সম্ভাব্য আপসের মাধ্যমে অখণ্ড কংগ্রেসের পুনর্বিন্যাস করা।

(৪) সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে বিদেশী পণ্যদ্রব্য বর্জনের মাধ্যমে রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক বর্জন-নীতিকে ফলপ্রসূ করা।

(৫) জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য পূর্ণ-স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাদেশিক সংগঠন, এমনকি সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলা।

এই বক্তব্য কর্মযোগিন্ পত্রিকায় "An Open Letter to My Countrymen" শিরোনামায় প্রকাশিত হয় এবং অধ্যাপক জ্যোতিষ

ঘোষ লিখেছেন যে এইটি শ্রীঅরবিন্দের "Last Political Will and Testament."।

১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারি বিকেল সাড়ে চারটার সময় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) সহায়তায় বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের গুলিতে আদালত প্রাঙ্গণে পুলিসের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেণ্ট সামসুল আলম নিহত হন। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সখ্যতার সূত্র ধরে পুলিস এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষকে লিপ্ত প্রমাণ করতে ব্যগ্র হয়ে পড়ে। এই জটিল পরিস্থিতির উপযুক্ত মোকাবিলা করতে শ্রীঅরবিন্দের মানসিক প্রস্তুতিও তখন সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু পথ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত তখনও অপেক্ষমান। শ্রীঅরবিন্দ পরম নিশ্চিন্তে বাসুদেবের নির্দেশের অপেক্ষায় নিত্যকর্মে ব্যস্ত রয়েছেন।

১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে সন্ধ্যার সময় ধর্ম ও কর্মযোগিন্ পত্রিকার কার্যালয়ে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর লীলাসহচর বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সৌরীন্দ্রনাথ বসু, বিজয়কুমার নাগ, হেমচন্দ্র সেন, নলিনীকান্ত গুপ্ত এবং সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী অবসর বিনোদনে ব্যস্ত ছিলেন। অটোমেটিক রাইটিং-এর সাহায্যে পরলোকগত আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাব্যতা নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলছিল। এমনি সময়ে পত্রিকার কার্যালয়ের সহকারী এবং শ্যামপুকুরের সান্ধ্য মজলিসের নিয়মিত সভ্য রামচন্দ্র মজুমদার শ্রীঅরবিন্দকে জানালেন যে তাঁদের নামে আবার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত না হলেও উপস্থিত সকলের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শ্রীঅরবিন্দ "কয়েক মুহূর্ত যেন কি ভাবলেন—কয়েক মুহূর্ত মাত্র—তারপর বললেন—'আমি চন্দননগর যাব'।...এক্ষুণি এই মুহূর্তে।" সেই সময়কার বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম সহচর শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর 'স্মৃতি-কথা'-য় আরও বলেছেন, "একটা শোভাযাত্রা নয়, বোবাযাত্রা অর্থাৎ Silent Procession তৈরি হল।...প্রায় পনর কি বিশ মিনিট

আন্দাজ চলে, আমরা গঙ্গার এক ঘাটে এসে পৌঁছলাম।…অরবিন্দ নৌকায় আরোহণ করলেন। তারপর বীরেন ও আমি তাতে উঠলাম। রামবাবু বিদায় নিলেন। নৌকা খুলে দিল। আমরা ভাগীরথী বক্ষে ভাসলাম।…খুব ভোরে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে পৌঁছলেন। ওখানকার খ্যাতনামা নাগরিক ৺চারুচন্দ্র রায় শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হলেন। এমন সময় ৺মতিলাল রায় সাগ্রহে এসে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে গেলেন তাঁর নিজের বাড়িতে।" (১২)।

যে বাংলাদেশকে তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রের উপযোগী মনে করে বরোদা ত্যাগ করে এসেছিলেন সেই বাংলাদেশকে চিরদিনের মতো ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতে হোলো একটি বৃহত্তম ও মহত্তম লক্ষ্য নিয়ে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ঃ

"Any premature attempt at a large-scale collective spiritual life is exposed to vitiation by some incompleteness of the spiritual knowledge on its dynamic side, by the imperfections of the individual seekers and by the invasion of the ordinary mind and vital and physical consciousness taking hold of the truth and mechanising, obscuring or corrupting it. …Spirituality liberates and illumines the inner being, it helps mind to communicate with what is higher than itself, to escape even from itself, it can purify and uplift by the inner influence the outward nature of individual human beings : but so long as it has to work in the human mass through mind as the instrument, it can exercise an influence on the earth-life but not bring about a transformation of that life. For this reason there has been a prevalent tendency in the spiritual mind to be satisfied with such an influence and in the main to seek fulfilment in other life elsewhere or to abandon altogether any outward-going

endeavour and concentrate solely on an individual spiritual salvation or perfection."(২৩)।

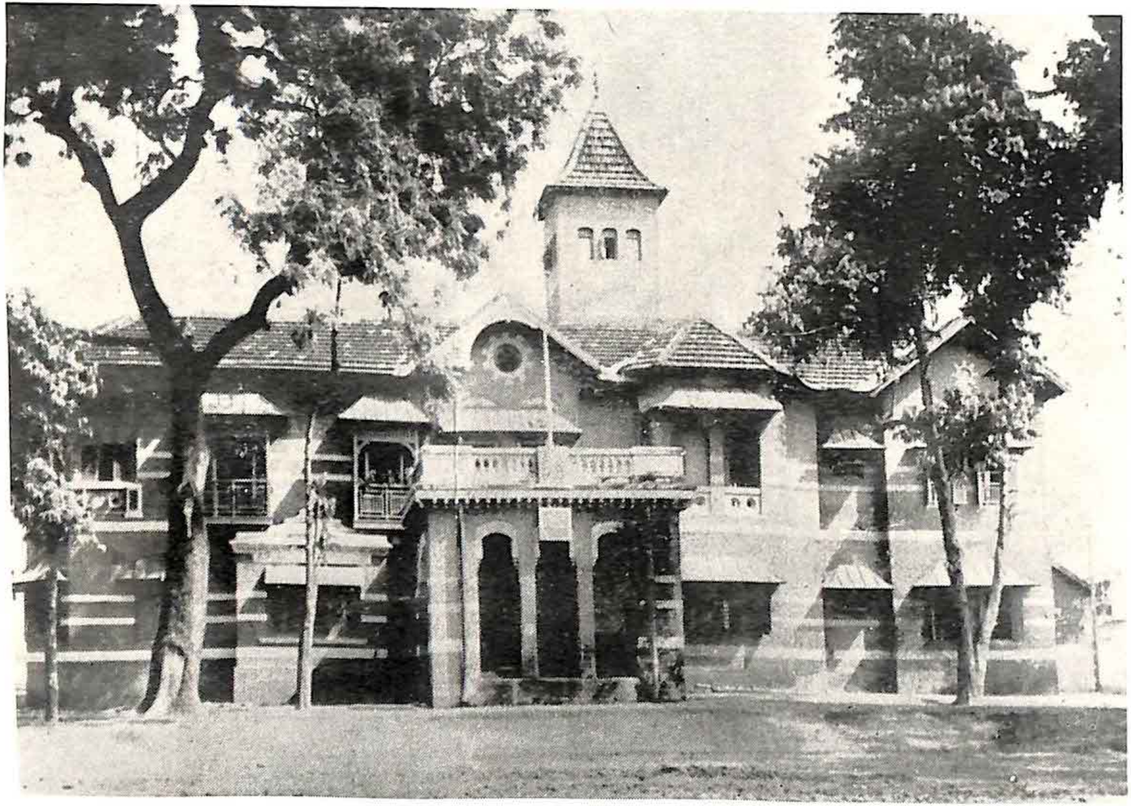
চন্দননগরে থাকাকালীন শ্রীঅরবিন্দ সুরেশচন্দ্রকে একটি নির্দেশ পাঠান, পণ্ডিচেরীতে গিয়ে তাঁর বাসের ব্যবস্থা করতে। সেই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল শ্রীঅররিন্দ বিজয় নাগকে সঙ্গে নিয়ে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে পেঁছিলেন। চন্দননগর ত্যাগ করবার পূর্বে তিনি সিস্টার নিবেদিতার উপর 'কর্মযোগিন্' পত্রিকা সম্পাদনার ভার দিয়ে গেলেন। বাংলা কাগজ 'ধর্ম' পত্রিকা প্রকাশের ভার রইল অন্যান্য অনুরাগীদের উপর।



শ্রীমান অরবিন্দ ঘোষ



শ্রীমা



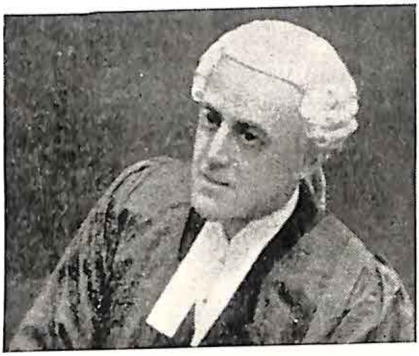
শ্রীঅরবিন্দের বাসগৃহ ঃ বরোদা



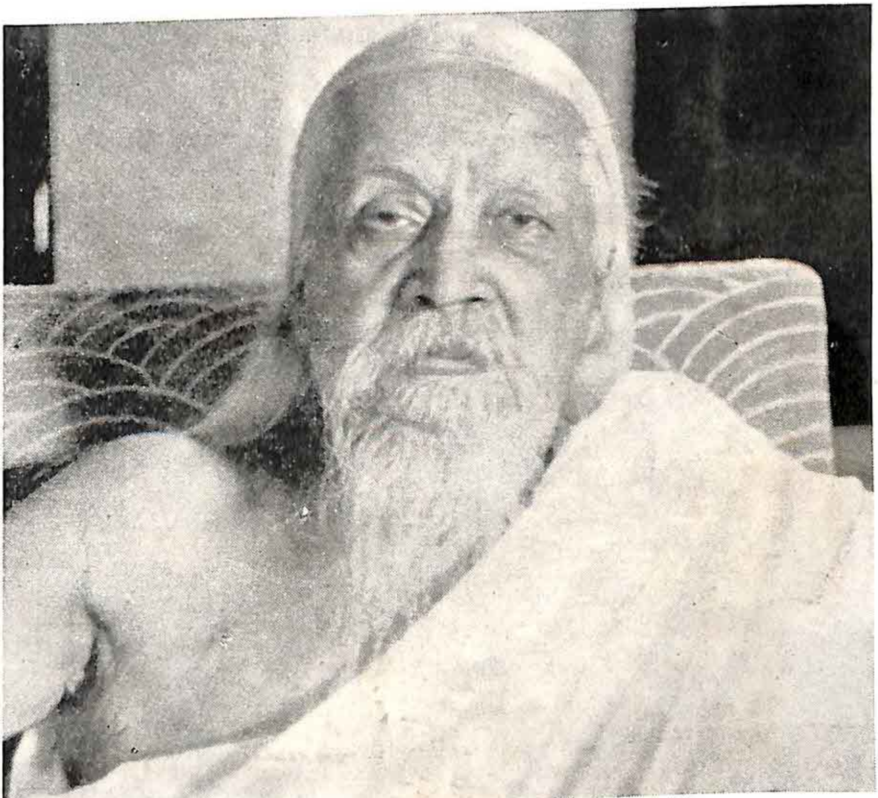
যোগাশ্রম ঃ আলীপুর জেল



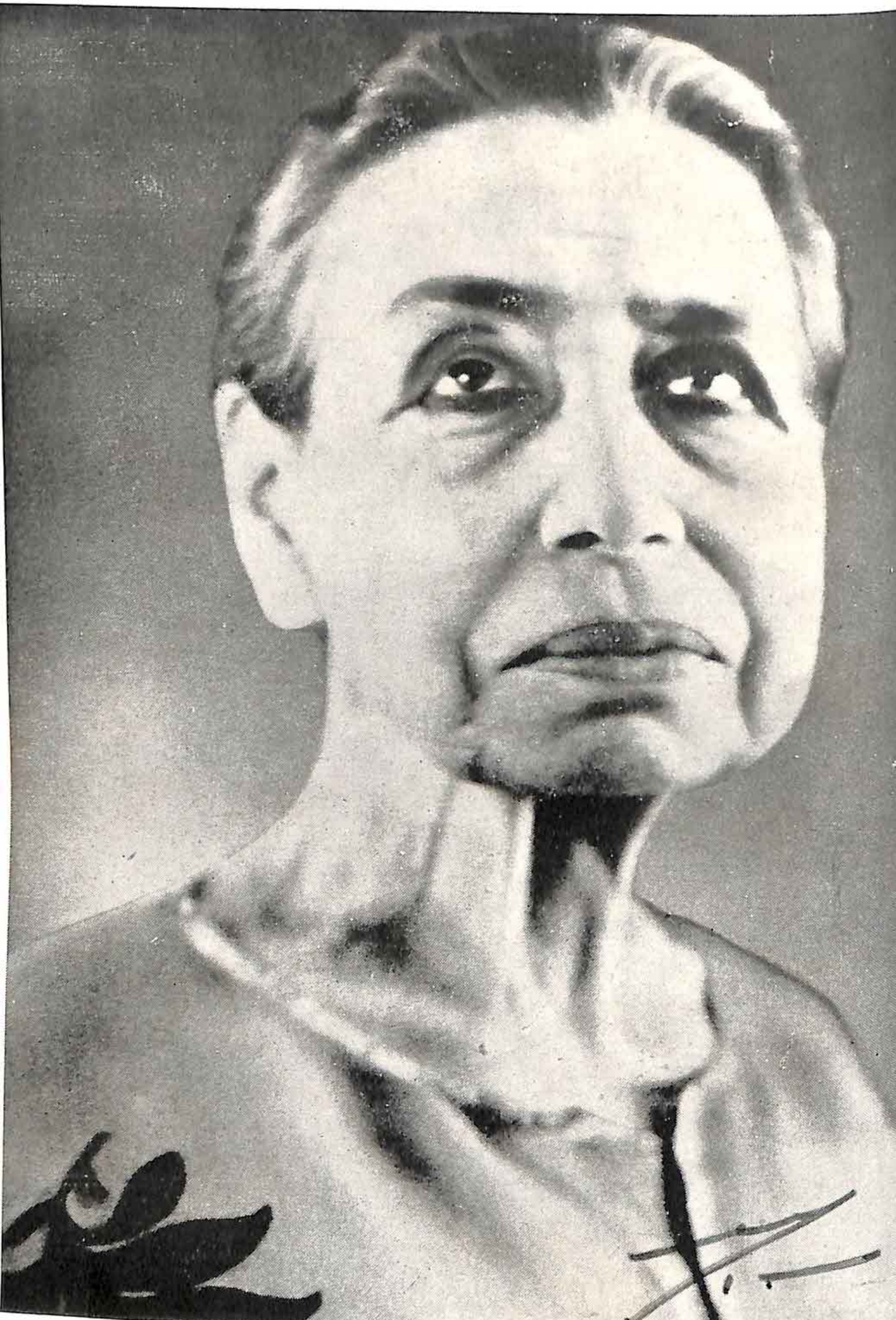
চিত্তরঞ্জন দাশ



ইয়ার্ডলে নর্টন



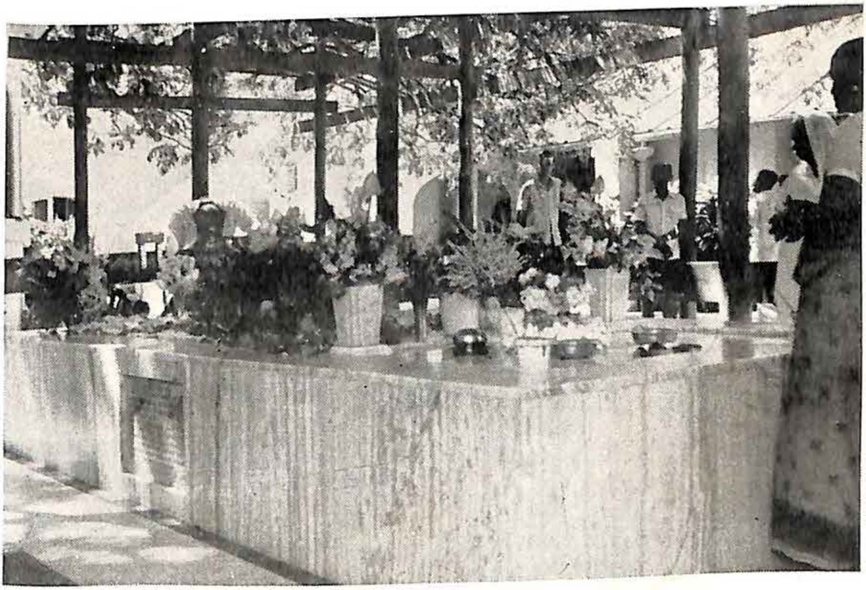
শ্রীঅরবিন্দ



জ্যোতির্ময়ী শ্রীমা



মহাপ্রয়াণ



সমাধি মন্দির



আরোভিল ঃ পণ্ডিচেরী

পণ্ডিচেরীতে উত্তর-যোগী শ্রীঅরবিন্দ

সর্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্বেষাং চ হিতে রতঃ।
কর্মণা মনসা বাচা স ধর্ম বেদ জাজলে ॥

—মহাভারত। শান্তিপর্ব

শ্রীঅরবিন্দ ভারতের উত্তর অঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চলে তাঁর 'পূর্ণযোগ' সাধনার তপোবন পণ্ডিচেরীতে এসে পৌঁছলেন।

তাঁর নিজের ভাষায়ঃ "পণ্ডিচেরীতে যখন এলাম, অন্তর থেকে একটি কার্যসূচির নির্দেশ পেলাম আমার সাধনার সম্পর্কে। আমার দিক থেকে তা পালন করে চললাম, কিন্তু তার সাহায্যে অন্যদের বিশেষ সাহায্য করতে পারছিলাম না; এমন সময়ে এলেন মীরা এবং তাঁরই সাহায্যে আমি বাঞ্ছিত পন্থাটি আবিষ্কার করলাম।... তাঁকে যখন দেখি, তখনই প্রথম বুঝলাম যে নিঃশেষে নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়া বাস্তবিকই সম্ভব এবং তাঁরই সাহায্যে আমার উদ্দিষ্ট যোগ সাধনা সম্ভব হয়ে উঠল এই পৃথিবীতে।"(১৯)।

ইতিহাস বলে, ঋষি অগস্ত্যও ঠিক এমনি ভাবেই দক্ষিণে এসেছিলেন। বিখ্যাত ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণা বলে, পণ্ডিচেরী এক সময়ে ছিল 'বেদপুরী' অর্থাৎ বেদচর্চার প্রাণকেন্দ্র। ইনি (Jouvean-Dubreuil) যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলির সাহায্যে সিদ্ধান্ত করা যায় যে—অতীতে যে স্থানে বেদ-বিদ্যালয়টি অবস্থিত ছিল সেই স্থানটিতেই শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমের প্রাণকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে আসার প্রায় ত্রিশ বছর আগে বিখ্যাত তামিল-যোগী নাগাই জাপতা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে সর্বজনবিদিত তিনটি বিশেষত্ব বা লক্ষণবিশিষ্ট কোনো এক যোগী

ভারতের উত্তরাঞ্চল থেকে এখানে আসবেন 'পূর্ণযোগ' সাধনার জন্যে এবং সেই যোগীর তপঃপ্রভাবেই ভারতবর্ষের মুক্তি সম্ভব হবে। শ্রীঅরবিন্দের জীবনের তিনটিই ব্রত ছিল যা তিনি মৃণালিনী দেবীকে লিখেছিলেন—"আমার তিনটি পাগলামী আছে"। সুতরাং যোগীর ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী শ্রীঅরবিন্দকেই 'উত্তরযোগী' বলা যায়। 'পূর্ণযোগ' সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত অনেক সারগর্ভ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। লেখকগণের প্রত্যেকেই শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে সুপণ্ডিত। 'পূর্ণযোগ' তত্ত্বটি শ্রীঅরবিন্দের একটি বিশেষ উপলব্ধি। মানুষের মুক্তির প্রয়োজনে যোগীর সাধনা পূর্ণযোগের সার কথা। তিনি মনে করতেন—"To discover the spiritual being in himself is the main business of the spiritual man and to help others towards the same evolution is his real service to the race; till that is done, an outward help can succour and alleviate, but nothing or very little more is possible." (২৪)।

"Satisfied in knowledge, having built up their Spiritual being, the Wise in the union with the spiritual self reach the Omnipresent everywhere and enter into the All." (২৫)। মুণ্ডক উপনিষদের (৩।২,৪,৫) এই বাণীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন পূর্ণযোগের গূঢ় রহস্য শ্রীঅরবিন্দের উপলব্ধিতে প্রাণ পেয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দের ধর্মচিন্তা পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে তিনি সমগ্র মানবজাতিকে ভাগবত ধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলকের মতে ভারতবর্ষে ভাগবত ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল খৃষ্টপূর্ব প্রায় ১৪০০ অব্দে অর্থাৎ বুদ্ধের প্রায় সাত-আটশো বৎসর পূর্বে। সেই সময়ে ভারতবর্ষে ব্রহ্মজ্ঞান এবং কপিলের সাংখ্য শাস্ত্র প্রচলিত ছিল। যে সাত্বৎজাতির মধ্যে ভাগবত ধর্মের সূত্রপাত হয়েছিল সেই জাতির মধ্যে সাত্যকি ছিলেন আদি ব্যক্তি, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পরাক্রমী, লোকসংগ্রহপটু, মূল প্রবক্তা, এবং ভীষ্ম

ও অর্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী পরম ভগবদ্ভক্ত। ভাগবত ধর্মের এই সব মূল নায়কগণের পদক্ষেপ এবং কর্মপ্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে শুধু বাসুদেবভক্তি ভাগবত ধর্মের মুখ্য লক্ষণ ছিল না। এঁদের প্রদর্শিত পথ ও আদর্শ অনুযায়ী প্রত্যেক ভগবদ্ভক্তেরই উচিত বৈরাগ্যযুক্ত বুদ্ধিতে সমস্ত ব্যবহারিক কর্মে লিপ্ত থাকা। বিংশ শতাব্দীর ভাগবত ধর্মের প্রবক্তা ও পথিকৃৎ শ্রীঅরবিন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে ভক্তি এবং সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের পথে পরমেশ্বর-জ্ঞান সম্পূর্ণ হবার পর ভগবদ্ভক্তকে পরমেশ্বরের আদর্শ-যন্ত্র হিসাবে (পরমেশ্বরের ন্যায়) জগতের বা সৃষ্টির সংধারণের কাজে (ধর্মের প্রকৃত অর্থ সৃষ্টির সংধারণ) জীবনের অবশিষ্ট অংশকে উৎসর্গ করতে হবে। সুতরাং যোগীর মুক্ত বা নির্বাণ-মুক্তি যোগের শেষ কথা হতে পারে না। যোগের শেষ কথা—নির্মাণ-মুক্তির সাধন পথে জীবন ক্ষেত্রে ভগবানকে মূর্ত করা—এই হোলো যোগের পূর্ণতা বা পূর্ণযোগ। পূর্ণযোগে যোগী সব সময়ে সকলের হিতকামনায় মগ্ন থাকেন।

পূর্ণযোগের ঋষি শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Yoga And Its Objects গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"The yoga we practise, is not for ourselves alone but for humanity. Its object is not personal *mukti*, although *mukti* is a necessary condition of the yoga, but the liberation of the human race. It is not personal *ānanda*, but the bringing down of the divine *ānanda* upon the earth. Of moksa we have no personal need ; for the Soul is nityamukta and bondage is an illusion. We play at being bound, we are not really bound. We can be free when god wills ; for He, our Supreme Self, is the master of the game, and without His grace and permission no Soul can leave the game,…it is God's play. The wise man is he who recognises this truth

and, knowing his freedom, yet plays out God's play waiting for His command to change the method of the game.

"The command is now. God always keeps for Himself a chosen country in which the higher knowledge is through all chances and dangers, by the few or the many, continually preserved, and for the present, in this *chaturyuga* at least, that country is India.……

"In modern language *Satyayuga* is a period of the world in which a harmony, stable and sufficient, is created and man realises for a time under certain conditions and limitations, the perfection of his being,…but afterwards it begins to break down and man upholds it, in the *Tretā*, by force of will,…in the *Dvāpara* by intellectual regulation and common consent and rule ; then in the *Kali* it finally colapses and is destroyed. But the *Kali* is not merely evil ; in it the necessary conditions are progressively built up for a new *Satya*, another harmony, a more advanced perfection." (২৬)।

শ্রীঅরবিন্দের দিব্যদৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত হয়েছিল বর্তমানের সঙ্কটময় যুগের মধ্যে লুক্কায়িত ভাবীকালের একটি নতুন সত্য যুগের সূচনা, এক অভিনব সমন্বয় যজ্ঞের ইঙ্গিত, ভারতবর্ষের নায়কত্বে বিশ্বমানবের পরা-চেতনার সঙ্গমে সম্মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে অধ্যাত্মবাদের দীক্ষা গ্রহণ। তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে এমনি এক ভাবীকালের রূপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যেদিন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে এই অধ্যাত্ম-স্নাতকের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা—বিশ্বসাম্য, বিশ্বমৈত্রী এবং বিশ্ব-বাসীর পূর্ণ মুক্তির আন্দোলনের এক অভিনব রূপায়ণের উদ্দেশ্যে। এই সময়ে আন্দোলনের সাফল্যের জন্যে সাহায্য করবে অতীতের ঋষিদের যুগযুগ ধরে অপেক্ষমান মুক্তি আন্দোলনের উদ্দেশ্যে অর্পিত তপস্যার ফল—তাঁদের আশীর্বাদরূপে। তাঁদেরই দিব্য প্রভাবে

সমগ্র বিশ্ববাসীর বুদ্ধি প্রভাবিত হবে। শ্রীঅরবিন্দের অন্তর্দৃষ্টিতে —এই বিশ্বমুক্তি আন্দোলনের পথ ভারতবর্ষই আবিষ্কার করতে পারবে।—অর্থাৎ ভারতই হবে পথিকৃৎ।

১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল বিকেল ৪টার সময় শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে এসে পৌঁছলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই মাহেন্দ্রক্ষণটি ছিল চতুর্থ মাসের চতুর্থ দিনের মধ্যাহ্নের চতুর্থ ঘণ্টা অতিক্রান্ত মুহূর্তে। প্রতিক্ষেত্রে এই চতুর্থ অঙ্কটির উপস্থিতি এক দৈব নির্দেশের সঙ্কেত দেয়। এই সঙ্কেতের গূঢ় অর্থ—উন্মেষিত বোধির মধ্যে দিব্য বোধির আবির্ভাব। এই আবির্ভাব অর্থে যোগীর জীবদ্দশায় মুক্তি বা জীবন্মুক্তি। জীবন্মুক্ত যোগী নিজের শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বরূপ উপলব্ধি করেন। জীবনমুক্তের এমন স্বস্তি ও শান্তি, যা সাধারণ মানুষের ধারণার বহু উর্ধ্বে "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈত্তিরীয় ২/৯)। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে আসবার আগেই এখানে যে কয়েকজন অসাধারণ ধী-শক্তি সম্পন্ন ভারতীয় মনীষী আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রসিদ্ধ তামিল-কবি সুব্রহ্মণীয় ভারতী, তামিল-সাহিত্যিক ডি. রামস্বামী আয়েঙ্গার, শ্রীনিবাসচারী, নাগস্বামী আয়ার এবং পূর্ণ-স্বরাজবাদী পণ্ডিত ডি. এস. আয়ার। এঁরা প্রত্যেকেই শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ সাধনার লীলা-সহচর হয়ে ছিলেন। ১৯১১ সালে চন্দননগর থেকে মতিলাল রায় এলেন পণ্ডিচেরীতে। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণে তিনি বলেছেন—"... আমি তাঁহার চক্ষে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিলাম।...দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।... বুঝিলাম, শ্রীঅরবিন্দ শুধু বিলাত-ফেরত, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত নানা ভাষাবিদ্ কূট রাজনীতিজ্ঞানে পারঙ্গম, বঙ্গের জাতীয় দলের নেতা নহেন, তিনি অহং-জ্ঞান-শূন্য, বিশ্বহিতের জন্য বিশ্বপ্রেম সাধনারত মহাযোগী।"

১৯১৪ সালের ২৯শে মার্চ শ্রীমা পণ্ডিচেরীতে এসে শ্রীঅরবিন্দের

চরণে প্রণাম জানালেন। "সত্যবান সাবিত্রীকে দেখলেন তাঁর ভবিষ্যৎ আশার আলোরূপে। স্বর্ণ-প্রতিমা সাবিত্রীর দ্বারাই তাঁর সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে এবং মনুষ্য হৃদয় অনন্ত-সূর্যের কাছে উন্নীত হবে।...তাঁদের এই মিলনের সঙ্গে এক নবযুগের সূচনা হলো।" (৮)।

এই মহা মিলন প্রসঙ্গে শ্রীমা লিখেছেন, "তোমাকে আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে, হে, পরাচেতনা, সনাতন ধর্ম !...শত শত জীব যদি গাঢ়তম অজ্ঞানের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, তাতে কিছু যায় আসে না। যাঁকে কাল আমরা দেখেছি তিনি পৃথিবীতে আছেন। তাঁর উপস্থিতিই যথেষ্ট প্রমাণ যে তমসালোকের অবসানে জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবেই, যখন তোমার" (অর্থাৎ অমৃতময়ের) "রাজত্ব পৃথিবীতে যথার্থই বিরাজ করবে।"(২৭)। এই অবস্থাকেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পূর্ণযোগপ্রসঙ্গে সত্যযুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আখ্যা দিয়েছেন।

শ্রীমায়ের প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, "অতিমানসকে নামিয়ে আনবার জন্যেই শ্রীমা নেমে এসেছেন, এবং এই অবতরণই ভগবানের পূর্ণ বিকাশ এখানে সম্ভব করে তুলেছে। শ্রীমা আজন্ম দিব্য প্রভায় ঋষির পর্যায়ভুক্ত। শ্রীমায়ের চৈতন্য আমার দিব্য-চেতনা থেকে ভিন্ন নয়। যিনি তাঁর অনুগামী হবেন তিনি আমার পূর্ণযোগের দীক্ষায় দীক্ষিত হবেন। তাঁর পবিত্র আধারের অবলম্বনই পৃথিবীতে অতিমানসের (বা পরাচেতনার) অবতরণের সুযোগ এসেছে এবং এই সুযোগ সেই অবতরণের উপযোগী একটা প্রাথমিক রূপান্তর ঘটাবে।"(২৮)। শ্রীমা কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Mother গ্রন্থে লিখেছেন : "The One whom we adore as the Mother is the divine conscious Force that dominates all existence, One and yet so many-sided that to follow her movement is impossible even for the quickest mind and for the freeest and most vast intelligence."।

শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-চেতনায় মাতৃমূর্তির যে অপরূপ রূপ পণ্ডিচেরীতে আসবার আগেই রূপায়িত হয়েছিল তাই দিয়েই শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমাকে বিভূষিত করেছিলেন। শ্রীমা শক্তির প্রতিমা, তিনি দেশমাতৃকার প্রতিমূর্তি। দেশবাসীকে শ্রীঅরবিন্দ খুব সহজভাবেই শেখাতে চেয়েছিলেন যে 'মা' এই নামটি যুগে যুগে সনাতন পদ্ধতিতে 'মা'-এর ভাবটিই বয়ে বেড়াচ্ছে—যে 'মা' কখনো ধরিত্রী, কখনো পালয়িত্রী, কখনো প্রকৃতি আবার সব সময়েই সেই অনন্ত অক্ষয় আদ্যাশক্তি। শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্যে এবং শিক্ষাপ্রণালীতে, অধ্যাত্ম-বিদ্যা রহস্যের কুজ্ঝটিকা কাটিয়ে তাই বিজ্ঞান-ভিত্তিক হয়ে উঠেছিল। তাঁর দিব্য-চেতনায় শ্রীমা ধরা পড়েছিলেন বহ্নি হিসাবে, শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের ধারক, বাহক এবং প্রবক্তা হবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত আধার হিসাবে। একথা অক্ষরে অক্ষরে প্রত্যক্ষ করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমজীবনের প্রথম পর্যায়ের প্রতিটি নিত্য-সহচর। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁর 'স্মৃতির পাতা' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "......মা এসে শ্রীঅরবিন্দকে শ্রীগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন যোগেশ্বর রূপে। আমরা তাঁকে বন্ধু হিসাবে, সখা হিসাবে দেখেছি —মনে প্রাণে তিনি গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাও ঠিক; কিন্তু আচার-ব্যবহারে আমরা তাঁকে প্রায় আমাদের সমগোত্রীয় করে রেখেছিলাম।.........শ্রীমা এসে শেখালেন, তাঁর কথায়, ব্যবহারে কার্যতঃ দেখালেন শিষ্য, ভক্ত কাকে বলে—আপনি আচরি তিনি অপরে শেখান। শ্রীঅরবিন্দের সামনে বা সঙ্গে সমানে চেয়ারে না বসে, মাটিতে বসে তিনি দেখালেন গুরুকে কি রকমে সম্ভ্রম করতে হয়—আদর্শ শালীনতা কি বস্তু! শ্রীমা-ই আমাদের চোখ খুলে দিলেন এবং আমাদের দিলেন সেই অনুভব যাতে আমাদের অর্জুনের মতই বলতে হল ঃ তুমি সখা এই মনে করে প্রগল্ভ হয়ে তোমাকে যা কিছু বলেছি,...রহস্য করতে গিয়ে তোমাকে যা-কিছু অসম্মান দেখিয়েছি—হে অপ্রমেয়, সে সব ক্ষমা কর।" ভারতীয় অধ্যাত্ম-বিদ্যা সিঞ্চিত শ্রীমায়ের দিব্য-চেতনায় 'গুরু' শব্দটি ধ্বনি হয়ে উঠল

এক অপরূপ ভাব-শক্তির মহিমায়। পণ্ডিচেরী আশ্রমের আশ্রম-বাসীদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হোলো গুরু-রূপী নারায়ণ। শুরু হোলো পূর্ণ যোগসাধনার নতুন পর্ব—সব কিছু শ্রীঅরবিন্দকে নিবেদন করে তাঁর মত ও পথ অনুসরণ।"

শ্রীঅরবিন্দের ৪২তম জন্মদিনে ১৯১৪ সালের ১৫ই অগস্ট শ্রীমা এবং পল রিচার্ডের সহযোগিতায় শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হোলো 'আর্য' মাসিক পত্রিকার সর্বপ্রথম সংখ্যাটি। আর্য পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডে পত্রিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন :

"১। জীবনের সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্যাগুলির বিজ্ঞানসম্মত নিরীক্ষণ।

"২। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন স্রোতের সমন্বয়ে একটি সর্বগ্রাহী অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সৃজন। যে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সর্বসাধারণের গ্রহণোপযোগী বা অভ্যাসের উপযোগী এবং যার পথ একান্তভাবে দর্শন, বিজ্ঞান ও দিব্যজ্ঞানের এক অপূর্ব সংমিশ্রণে রচিত হবে।

" 'আর্যের' গ্রাহকগণের কাছে যুক্তিবাদী-দর্শন, প্রাচীন শাস্ত্রের অনুবাদ ও ভাষ্য, প্রচলিত ধর্মমতগুলির বিষয়ে প্রবন্ধ এবং আত্মোন্নয়ণ ও আত্মোপলব্ধির অভ্যাস-পদ্ধতি পরিবেশিত হবে।" (২৯)।

পত্রিকার বিষয়বস্তু সবই শ্রীঅরবিন্দের একক প্রচেষ্টা—দিব্য-শক্তির নির্দেশে লিখিত হোতো, শ্রীঅরবিন্দের সেই এক ও অদ্বিতীয় লক্ষ্য নির্মাণ-মুক্তির উদ্দেশ্য—সমগ্র বিশ্ববাসীকে দিব্য-চেতনার জাগরণে এক প্রাণ, একতায় আবদ্ধ করা।

'শ্রীঅরবিন্দ-জীবন-কথিকা' গ্রন্থের লেখক প্রমোদকুমার সেন লিখেছেন, "পূর্ণ সাত বৎসর ধরিয়া মাসের পর মাস শ্রীঅরবিন্দ 'আর্য' লিখিয়াছেন, বলিতে গেলে একাই ইহার পাতাগুলি পূর্ণ করিয়াছেন।...বেদ-রহস্য, উপনিষদের ব্যাখ্যা, দিব্য-জীবনের আদর্শ, যোগ সমন্বয়ের প্রণালী, ভারত-সংস্কৃতির পরিচয়, মানবের মহামিলনের আদর্শ, মানব-সমাজের বিবর্তনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ—ইহা ছাড়া

সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে কত হৃদয়গ্রাহী আলোচনা।..সাধারণ রাজনৈতিক আলোচনা 'আর্য'-এ স্থান পায় নাই। কিন্তু তাহাতে আন্তর্জাতিক সমস্যার যে বিশ্লেষণ আছে তাহার তুলনা নাই।...সেই ইঙ্গিতগুলি আজকালকার বাস্তব ঘটনা।" আর্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে যেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, বহুল প্রচারিত, ও সমাদৃত সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

১। On Yoga, Vols. I and II ; ২। Secrets of the Veda ; ৩। Hymns to the Mystic Fire ; ৪। Essays on the Gita ; ৫। The Life Divine ; ৬। Eight Upanishads ; ৭। The Doctrine of Passive Resistance ; ৮। The Foundation of Indian Culture ; ৯। The Future Poetry ; ১০। The Hour of God ; ১১। The Human Cycle ; ১২। The Ideal of Human Unity ; ১৩। The Supramental Manifestations on Earth।

আর্য পত্রিকা ১৯২১ সালে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে প্রকাশ করা বন্ধ হোলো। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য ছিল, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির গুহ্য তত্ত্বের অনুধাবন জনসাধারণের বা পাঠক-বর্গের গ্রহণ ক্ষমতার গণ্ডী অতিক্রম করেছিল। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে দিব্য-শক্তির প্রভাবে তাঁর লেখনীতে যে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার আশ্রয় নিয়েছিল সেই ভাণ্ডার প্রতি মাসে পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোতে থাকলেও কোনো দিনই নিঃশেষ হোতো না।

১৯১৪ সালের মার্চ মাসে শ্রীমা পণ্ডিচেরীতে এসেছিলেন। প্রায় এক বছর পণ্ডিচেরীতে থাকার পর ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি ফ্রান্সে তাঁর পিতৃভবনে ফিরে গেলেন।

১৯১৫ সালে বাঙলাদেশের তদানীন্তন রাজ্যপাল লর্ড কারমাই-কেলের উদ্যোগে শ্রীঅরবিন্দের মেসোমশায় কৃষ্ণকুমার মিত্রের দৌত্যে শ্রীঅরবিন্দকে বাঙলা দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব এলো।

প্রস্তাবে জানানো হোলো যে শ্রীঅরবিন্দ যদি ফিরে আসেন তাহলে তাঁর উপর প্রযুক্ত সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে। শ্রীঅরবিন্দ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এই ঘটনার পর বৃটিশ সরকারের কোনো এক উচ্চ পদস্থ কর্মচারীকে পণ্ডিচেরী স্টেশনে পাঠানো হোলো। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে রেল স্টেশনে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ করলেন—এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হোলো। তখন সরাসরি ঐ রাজকর্মচারী শ্রীঅরবিন্দকে জানালেন যে বাঙলাদেশে ফিরে গেলে সরকারী উদ্যোগে দার্জিলিং শহরে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম-জীবনের উপযোগী সব কিছুই ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। শ্রীঅরবিন্দের দ্বারা এই অনুরোধটিও যথারীতি প্রত্যাখ্যাত হোলো। শ্রীঅরবিন্দকে বৃটিশ রাজত্বে নজরবন্দী করে রাখার প্রাথমিক কৌশলগুলি বিফল হবার পর বৃটিশ সরকার সরাসরি প্যারিসে ফরাসী সরকারকে অনুরোধ করলেন যে তাঁরা যেন শ্রীঅরবিন্দকে পণ্ডিচেরী থেকে বহিষ্কৃত করে দেন। এই অনুরোধ ফরাসী সরকার গ্রাহ্য না করায় বৃটিশ সরকার হতাশ হয়ে পড়লেন।

এই সব প্রতিকূলতা কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর সাধন পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। শ্রীঅরবিন্দের সাধনার গতি অপ্রতিহত রইল। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রম-জীবন পরিত্যাগ করে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সাদর আহ্বান জানালেন তাঁর অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু বালগঙ্গাধর তিলক। এই সময়ে তিলকের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে 'হোমরুল আন্দোলন' চলছিল। শ্রীঅরবিন্দ তিলকের আমন্ত্রণ গ্রহণে অক্ষমতা জানালেন।

১৯১৮ সালে তাঁর সঙ্গে বিশিষ্ট অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ সঞ্জীব রাও এসে সাক্ষাৎ করেন। সঞ্জীব রাওয়ের সঙ্গে আলোচনার সময় অন্যান্য কথাবার্তার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ একটি ভবিষ্যৎ বাণী করেন, "I see two alternative plans for the world. The first is the plan of an Indo-British Commonwealth in which India will be a free and equal partner with Britain and other Domini-

ons.” এই বছরেই ডিসেম্বর মাসে গুজরাটের অম্বুভাই পুরাণী শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ নিয়ে গুজরাটে বিপ্লবের কাজ করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি পুরাণীকে বলেছিলেন, “বিপ্লবের কাজ করার কোন প্রয়োজন নেই কারণ ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার পথে আর কোনো বাধা আসবে না।” পুরাণীর চোখে বিস্ময়ের আভাস ও জিজ্ঞাসা ফুটে উঠায় শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, “I give you the assurance that India will be free.…You can take it from me, the freedom of India is as certain as the rising of the sun tomorrow.”

এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। মৃণালিনী দেবীর পণ্ডিচেরী জীবনের সাধ ইহজীবনে পূর্ণ হয়নি। এই সম্পর্কে ‘শ্রীঅরবিন্দের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীর স্মৃতিকথা’ গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন ঃ “মৃত্যু দেহান্তর যখন অনিবার্য সেই বাহ্যচেতনা অবচেতনার কবলে থাকাকালীন অবস্থায় মৃণালিনীদি তাঁহার মা, বাবা, ও ভাইদের নির্দেশ দিলেন যে তাঁহার বাক্স ভর্তি শ্রীঅরবিন্দ লিখিত সমুদয় পূর্বাপর চিঠিগুলিকে তালাবদ্ধ করিয়া যেন গঙ্গা গর্ভে নিমজ্জিত করা হয়। তাঁহার সে অন্তিম ইচ্ছা পালিত হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি।… যোগীশ্বর শ্রীঅরবিন্দের সেই অনুপম তথ্য-সমৃদ্ধ পত্রগুলি আজ বিলুপ্ত হইয়া গেল…যিনি এই দুর্লভ বস্তুর অধিকারিণী ছিলেন একমাত্র তিনিই বলিতে পারিতেন, একাজ কেন তিনি করিয়া গেলেন।…দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই পণ্ডিচেরীতে তিরোধানের সংবাদ বহন করিয়া টেলিগ্রাম রওনা হইল। পণ্ডিচেরী হইতে দাদা (সৌরীন বসু) এই ঘটনার ঠিক পরেই দেশে (মেহেরপুর, যশোর) তাঁহার মাকে চিঠি দিয়া জানাইলেন—‘আজ পৃথিবীর নবম আশ্চর্য সন্দর্শন করিলাম—পাষাণেও জল দেখিলাম। দেখিলাম মেনুর (মৃণালিনীর) মৃত্যু সংবাদ বহন করা টেলিগ্রামখানি হাতে করিয়া শ্রীঅরবিন্দ বসিয়া আছেন আর তাঁহার চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা

জল নির্গত হইতেছে।'…পরে দাদার মুখে শুনিয়াছি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পাঁচদশ মিনিট বাদেই মৃণালিনী দেবী পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ সন্দর্শনে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। দাদা বলিয়াছেন, একথা শ্রীঅরবিন্দের মুখনিঃসৃত উক্তি।…যোগীশ্বর শ্রীঅরবিন্দের এক ফোঁটা চোখের জলে মৃণালিনী দেবীর জীবনের অক্ষয়পট সমুজ্জ্বল হইয়া রহিল।"

১৯২০ সালে মাদ্রাজ থেকে শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম ভক্তশিষ্য ডোরাই-স্বামী আয়ার পণ্ডিচেরীতে গুরুদর্শনে এলেন। তিনিও শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে শুনে গেলেন যে ভারতের স্বাধীনতা বিধিলিপি সুতরাং ভারত স্বাধীন হবেই। এই সময়ে অগ্নিযুগের নায়ক বারীন্দ্র-কুমার আন্দামান জেল থেকে মুক্তি পান। তিনি এসেই তাঁর প্রাণ-প্রিয় সেজদাকে পণ্ডিচেরীতে চিঠি লিখলেন, 'পূর্ণযোগের' দীক্ষা নেবেন বলে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পরম আদরের ছোটভাইটিকে উত্তর দিলেন—যা খুবই অপ্রত্যাশিত। "এই যে লিখতে বসেছি, সেটাও একটি miracle (আশ্চর্য কাণ্ড), কেন না আমার চিঠি লেখা হয় once in a blue moon (ক্ষুদে মঙ্গল বারে একবার); বিশেষ বাঙলায় লেখা, যা এই পাঁচ-সাত বৎসরে একবারও করিনি। শেষ করে যদি Post-এ (ডাকে) দিতে পারি, তাহলেই miracle-টা (অসাধ্য সাধনাটা) সম্পূর্ণ হয়।" (৩০)।

১৯২০ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখে বারীন্দ্রকুমারকে লিখিত শ্রীঅরবিন্দের এই চিঠিখানিতে সেই সময়ের বাঙলা দেশ, বাঙালী, এবং এই দুইয়ের প্রতি তাঁর চিন্তা সম্পর্কে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। চিঠিখানিতে শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে যোগের ব্যাপ্তি কতখানি এবং তাঁর সাধকজীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ নিখুঁত চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। চিঠির বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে ঐগুলি বর্ণনা করা অর্বাচীনতা হবে বলে চিঠিটির কয়েকটি অংশ সরাসরি উদ্ধৃত করছি।

"তুমি আমাকেই তোমার যোগের ভার দিতে চাও; আমিও

নিতে রাজী।...তাঁহারই দত্ত আমার যোগপন্থা—যাকে পূর্ণযোগ বলি—সেই পন্থায় চলতে হবে।...যোগ পন্থাটি কি, তা পরে লিখবো ; অথবা তুমি যদি এখানে এস, তখনই সেই কথা হবে। এ বিষয়ে লেখা কথার চেয়ে মুখের কথা ভাল।......

"পুরাতন যোগের দোষ এই ছিল যে সে...মনের মধ্যেই অধ্যাত্ম অনুভূতি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু মন খণ্ডকেই আয়ত্ত করতে পারে ; অনন্ত, অখণ্ডকে সম্পূর্ণ ধরতে পারে না।...কিন্তু লাভ কি ? ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ত আছেনই। ভগবান মানুষে যা চান সেটি হচ্ছে তাঁকে এখানেই মূর্তিমান করা, ব্যষ্টিতে, সমষ্টিতে— to realise God in life (জীবনক্ষেত্রে ভগবানকে মূর্ত করা)।...

"......বিজ্ঞান ভূমিতে না উঠলে জগতের শেষ রহস্য জানা অসম্ভব, জগতের সমস্যা solved (মীমাংসা) হয় না। সেখানেই আত্মা ও জগৎ, অধ্যাত্ম ও জীবন—এই দ্বন্দ্বের অবিদ্যা ঘুচে যায়। তখন জগৎকে আর মায়া বলে দেখতে হয় না, জগৎ ভগবানের সনাতন লীলা, আত্মার নিত্য বিকাশ। তখন ভগবানকে পূর্ণভাবে জানা, পাওয়া সম্ভব হয় ; গীতায় যাকে বলে 'সমগ্রং মাং জ্ঞাতুম্'। অন্নময় দেহ ; প্রাণ, মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান, আনন্দ এই হ'ল আত্মার পাঁচটি ভূমি।...বিজ্ঞানে উঠায় আনন্দে উঠা সহজ হ'য়ে যায়।...পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ আনন্দ বিকশিত হ'য়ে জীবনে মূর্ত হয়। এই চেষ্টাই আমার যোগ পন্থার central clue (মূল কথা)।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ঠিক এই সময়টিতে তাঁর নিজের ঊর্ধ্ব-গতি সম্পর্কে আগেই লিখেছেন (চিঠির তৃতীয় অনুচ্ছেদে), "...অন্তর্যামী জগদ্‌গুরু আমাকে আমার পন্থার পূর্ণ নির্দেশ দিলেন। তার সম্পূর্ণ theory (তত্ত্ব) যোগ শরীরের দশ অঙ্গ ; এই দশ বৎসর ধরে তারই development (বিকাশ) করাচ্ছেন অনুভূতিতে ; এখনও শেষ হয়নি, আর দুই বৎসর লাগতে পারে।...

"বাঙ্গলা যে ঠিক প্রস্তুত নয়, আমি জানি। অধ্যাত্মের বন্যা এসেছে, সে হচ্ছে অনেকটা পুরাতনের নূতন রূপ, কিন্তু আসল

রূপান্তর নয়। তবে এরও দরকার ছিল।···এটী নবযুগের শৈশবে, এমনকি embryonic (ভ্রূণ) অবস্থা। আভাস মাত্র, আরম্ভ নয়।···

"ভেদপ্রতিষ্ঠ সমাজ চাই না, আত্মপ্রতিষ্ঠ—আত্মার ঐক্যের মূর্তি—সংঘ চাই !···দেব সংঘ। সেইরূপ সংঘ এক জায়গায় স্থাপন করে পরে দেশময় ছড়িয়ে দিতে হবে। এইরূপ চেষ্টার উপর অহমের ছায়া যদি পড়ে, সংঘ দলে পরিণত হয়। আমাদের কারবার শুধু নিরাকার আত্মা নিয়ে নয়, জীবনকেও চালাতে হবে।...রাজনীতি, বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকলা, সাহিত্য সবই থাকবে ; এই সকলকে নূতন প্রাণ, নূতন আকার দিতে হবে।...সংঘ হবে প্রথম চড়ান রূপ ;......পরে spiritual commune-এর (অধ্যাত্ম সংঘ) মত রূপ দিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে সব কর্মকে আত্মানুরূপ, যুগানুরূপ আকৃতি দেবে। শক্ত বাঁধা রূপ নয়···স্বাধীন রূপ···নানাভঙ্গী লয়ে এটিকে ঘিরে, ওটিকে প্লাবিত করে সবকে আত্মসাৎ করবে ; করতে করতে spiritual community (দেবজাতি) দাঁড়াবে। এইটি হচ্ছে আমার বর্তমান (idea) ভাব, এখনও পুরো developed হয়নি। সবটা ভগবানের হাতে, তিনি যা করান।

"···আমাদের সভ্যতা হয়ে গেছে অচলায়তন, বাহ্য ধর্মের গোঁড়ামি, অধ্যাত্মভাব একটি ক্ষীণ আলোক বা ক্ষণিক উন্মাদনার তরঙ্গ। এই অবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন ভারতের স্থায়ী পুনরুত্থান অসম্ভব।

"বাঙ্গলা দেশেই এই দুর্বলতার চরম অবস্থা। বাঙ্গালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের capacity (সামর্থ্য) আছে, intuition (অন্তর্জ্ঞান) আছে ;···এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীর শক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তা হলে বাঙ্গালী ভারতের কেন, জগতের নেতা হয়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালী তা চায় না, সহজে সারতে চায়, চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে সিদ্ধি। তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞানশূন্য ভাবাতিশয্যই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ, তারপর অবসাদ,

তমোভাব। এদিকে দেশের ক্রমশঃ অবনতি,...খেতে পাচ্ছে না, পরবার কাপড় পাচ্ছে না, চারিদিকে হাহাকার, ধন-দৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি, চাষ পর্যন্ত পরের হাতে যেতে আরম্ভ করেছে।... প্রেম কোথায় বঙ্গদেশে? যত ঝগড়া, মনোমালিন্য, ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদলি, এদেশে আছে—ভেদক্লিষ্ট ভারতে আর কোথাও তত নাই।

"লাখ লাখ শিষ্য চাই না, একশ ক্ষুদ্র-আমিত্বশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে যদি পাই, তাই যথেষ্ট। প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই; আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, কেহ যদি ভিতর থেকে নিজের সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভগবৎ-জীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।" (৩০)।

এই বছরেই কলকাতা থেকে শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করবার জন্যে সরলা দেবীচৌধুরাণী পণ্ডিচেরীতে আসেন। মধ্যপ্রদেশ থেকে ডাক্তার মুঞ্জী এবং শ্রীহেজওয়ার শ্রীঅরবিন্দ সন্দর্শনে এলেন তাঁকে জাতীয় কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্বপদে বরণ করবার আমন্ত্রণ জানাতে। বিমুখ হয়ে ফিরে গেলেন। বোধহয় এঁরাও শুনেছিলেন সেই একই যুক্তি যা শ্রীঅরবিন্দ বছরের গোড়ার দিকে জোসেফ ব্যাপটিস্টাকে লিখেছিলেন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির মুখপত্রের সম্পাদক পদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে।

ঐ বছরের শেষের দিকে শান্তিনিকেতন থেকে কবিগুরুর সহকর্মী পিয়ারসন সাহেব পণ্ডিচেরীতে এলেন শ্রীঅরবিন্দের কাছে অধ্যাত্ম-জ্ঞান পিপাসু ছাত্র হিসাবে। পিয়ারসন সাহেব শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার কাছে সস্নেহ সাহচর্য পেয়েছিলেন। পিয়ারসন প্রসঙ্গে দর্শনাচার্য শিশিরকুমার মিত্র লিখেছেন যে পিয়ারসন ছিলেন প্রকৃত ভারত-প্রেমিক, ভারতের মুক্তি সাধনার ব্রতীপুরুষ, এবং ভারতের মহান ঐতিহ্যের একজন দরদী সমর্থক। ১৯২০ সালে শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম গুণমুগ্ধ সুহৃদ বালগঙ্গাধর তিলক দেহ রাখলেন।

শ্রীঅরবিন্দের কাছে তিনি ছিলেন, "One of the mightiest prophets of Indian Nationalism."

রাজনীতি সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ-চিন্তা পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মানুষের অন্তঃস্থ ভগবানকে বিস্মৃত হয়ে রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। রাজনীতিকে আশ্রয় করে ব্যক্তিপূজা তাঁর মতে স্বধর্মের বিকৃতি। মানুষ একমাত্র ভগবানের শ্রীচরণে বশ্যতা স্বীকার করবে—এই সত্যকে উপেক্ষা করে কোনো নেতার মতবাদ বা কোনো রাজনীতি ভারতের সনাতন ধর্মের পরিপন্থী। মানুষের অন্তঃস্থ ভগবানকে উপেক্ষা করে যদি মানুষের উপর জোর করে কোনো মতবাদ চাপানো হয় তাহলে মানুষের মধ্যে স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীনতার চেতনা বিকশিত হবার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। সংকীর্ণ রাজনীতিতে, দিব্য-প্রকৃতির আধার মানুষকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির যন্ত্রে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা মানুষকে বন্দীজীবনের আস্বাদ দেয়—মুক্তির দিব্য আস্বাদে বঞ্চিত হয়ে মানুষ অধোগতির পথে মুক্ত জীবনের পরিবর্তে উচ্ছৃঙ্খলতার আবর্তে সমাজকে দূষিত করে তোলে। শ্রীঅরবিন্দ-চিন্তা অনুযায়ী মানুষের হৃদয়ের, অন্তঃপুরের, শৃঙ্খলিত ভগবানকে মুক্ত করতে পারলে মানুষের মধ্যে দিব্য-ভাব আসবে—সেই দৈবী-ভাবাপন্ন মানুষ সমাজই গড়ুক আর রাজনীতিই করুক, তার মধ্যে মানুষের মুক্তির অভিযান অব্যাহত থাকবে—অব্যাহত থাকবে স্বস্তি, শান্তি, নিরাপত্তা, আনন্দ অথবা পূর্ণ স্বাধীনতা। মহান মানুষ, মহান সমাজ-চেতনা যে নীতি প্রণয়ন করবে সেই নীতি আপন মহিমায় মহান্ হবে।

১৯২১ সালের প্রথমের দিকে শ্রীঅরবিন্দের চরণে প্রণাম জানতে কলকাতা থেকে এলেন অগ্নিযুগের অন্যতম জ্যোতিষ্ক অবিনাশ ভট্টাচার্য। তাঁর কাছে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, বাঙলা দেশ উঠবে, জাগবে এবং বিশ্ববাসীর মন জয় করবে। বাংলার মনীষা অর্থাৎ বাঙালী হিন্দু, বাঙালী মুসলমান এক হয়ে দিকে-দিগন্তে প্রতিষ্ঠা পাবে। এই বছরেই পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দকে শ্রদ্ধা জানাতে বৃটিশ

পার্লামেন্টের সভ্য কর্নেল জস্থয়া ওয়েজউড্ এসে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে কিছুদিন ছিলেন।

১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে একটি চিঠি লিখে তাঁর ঐ সময়ের ধ্যান ও ধারণাগুলি জানতে চেষ্টা করেন। কারণ দেশবন্ধু এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে চিন্তা করছিলেন। চিত্তরঞ্জনকে শ্রীঅরবিন্দ পরম সুহৃদ্ হিসাবে ভালবাসতেন তাই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই নিজের সাধনপথে আত্মমগ্ন থাকার দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা চিত্তরঞ্জনকে জানিয়েছিলেন।

পরের বছর ভগ্নস্বাস্থ্য ও রাজনৈতিক সমস্যাপীড়িত মন নিয়ে চিত্তরঞ্জন নিজেই এসে উপস্থিত হলেন অন্তরের যোগসূত্র ধরে যোগীশ্বরের পণ্ডিচেরী আশ্রমে। এঁদের দু'জনের আলোচনা হয়েছিল নিভৃতে—১৯২৩ সালের ৫ই জুন বেলা সাড়ে তিনটার সময়। 'হৃষীকেশ' এবং 'গুড়াকেশ'-এর আলোচনার মতই এই মতের আদান-প্রদান ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। চিত্তরঞ্জনের জিজ্ঞাস্য ছিল—অধ্যাত্ম-জীবন এবং দিব্যলোকের পথ-সন্ধানের। কথা প্রসঙ্গে এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে চিত্তরঞ্জনকে বলেন—"Knit them close together."। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের অদ্বিতীয় পৃষ্ঠপোষক শ্রীঅরবিন্দ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে এই সংহতি অখণ্ড ভারতের জাতীয় সংহতির বুনিয়াদ। এই সংহতি আলাপ-আলোচনা বা আপসের ভিত্তিতে গড়তে গেলে ফল ক্ষণস্থায়ী হবে সুতরাং অন্তরের যোগসূত্রে দুই সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করতে হবে। কারণ শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-দৃষ্টিতে উভয় সম্প্রদায় সেই পরম-পিতার দুই প্রিয় সন্তান-সন্ততি গোষ্ঠী। উভয়েই নারায়ণের পবিত্র আধার, উভয়েই আদ্যাশক্তির সৃষ্ট ও পালিত। এই দুই সম্প্রদায়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠাকে সংকীর্ণ রাজনীতির আবর্ত থেকে মুক্ত করে জাতীয় সমৃদ্ধির পটভূমিকায় চিন্তা করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন।

১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে যোগীবর ব্রহ্মশ্রী সুব্বারাও শ্রীঅরবিন্দের দর্শন্‌ লাভের উদ্দেশ্যে পণ্ডিচেরীতে এসেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দ প্রেমময়, মহিমামণ্ডিত, বিংশ শতাব্দীর যোগীশ্বর।

১৯২৪ সালের ২৫শে জানুয়ারি তারিখের সকাল বেলায় প্রেম-ভক্তি-সঙ্গীত-সুধাকর দিলীপকুমার রায় শ্রীঅরবিন্দের শ্রীচরণ স্পর্শ করলেন। শ্রীগুরু তাঁর পরম আদরের দিলীপের দিকে চেয়ে রইলেন 'স্থির প্রেক্ষণে'। ভাববিহ্বল দিলীপকুমারের প্রার্থনা ছিল—'জ্ঞান ও আনন্দের দীক্ষা'। দিলীপকুমারের প্রার্থনার উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, দীক্ষা পেতে পারো, "যদি যোগের সর্তে তুমি রাজী থাকো এবং তোমার যোগতৃষ্ণা প্রবল হয়"। এর কয়েক বছর পরেই দিলীপকুমার শ্রীঅরবিন্দের শ্রীচরণে কেবলমাত্র আশ্রয়ই পেলেন না, পেলেন শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ স্নেহের সৌভাগ্য।

এই বছরে ২৮শে জুলাই স্বনামধন্য পণ্ডিত কপালী শাস্ত্রীজী পণ্ডিচেরীতে এসে শ্রীগুরুর শ্রীচরণে নিঃশেষে নিজেকে সঁপে দিলেন। শাস্ত্রীজীর হৃদয়ের ভক্তি-কুসুম দিয়ে গাঁথা 'সম্পত্তিসপ্তকম্‌' গ্রন্থ তাঁর বেদোজ্জ্বলা প্রজ্ঞার একটি সার্থক নিদর্শন—গুরুবন্দনার আকুতির মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে গুরু-শিষ্যের গুহ্য মিলনের নৈসর্গিক সুর।

১৯১৫ সালের ৫ই জানুয়ারি শ্রীঅরবিন্দের দর্শনাভিলাষী হয়ে ভারতের দুই দিক্‌পাল—লালা লাজপৎ রায় এবং পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন—পণ্ডিচেরীতে এলেন। লালাজীও এসেছিলেন ভারতের রাজনৈতিক দুরূহ কয়েকটি সমস্যার সমাধানে। লালাজীরও সেই এক আবেদন—"যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে"......"মাং ত্বাং প্রপন্নং"। লালাজী পথনির্দেশ পেয়েছিলেন। শ্রদ্ধামুগ্ধ লালাজীর ভাষায়, শ্রীঅরবিন্দ এক আশ্চর্য পুরুষ; ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব কিছু জ্ঞাতব্য তাঁর নখদর্পণে ছিল; এক অনন্যসাধারণ বোধশক্তি। —এই অসাধারণ ক্ষমতা যোগী মহাপুরুষের মধ্যেই থাকা সম্ভব।

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন ভারতের আকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

অস্তমিত হোলো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণে শ্রীঅরবিন্দ ভারতের অপূরণীয় ক্ষতির কথা ভেবে চিত্তরঞ্জনের বিয়োগ বেদনা স্বীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, "Chittaranjan's death is a supreme loss. ....he was the one man after Tilak who could have led India to Swaraj."

ক্রমশঃ ১৯২৫ সালের শেষ দিনটি পণ্ডিচেরীর বুকে রাত্রির শান্তিময় কোলে আশ্রয় নিয়ে অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। বছরের শেষ-রাত্রির কোলে আশ্রমবাসীর অগোচরে লালিত হোতে থাকল নতুন বছরের প্রথম দিনটির এক বৃহত্তর উষা। সকলের অলক্ষ্যে ভারতের দক্ষিণ উপকূলে নীরব নিস্তব্ধ পণ্ডিচেরীর তপোবনে যোগীশ্বর আত্মস্থ হয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছেন সেই অনন্ত-লোকে—যে অনন্তলোক থেকে কোনো এক শুভমুহূর্তে তিনি তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন মানবাত্মারূপে; এগিয়ে চলেছেন ঊর্ধ্বায়ণের পথে বিশ্বাতীত ভগবানের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে।

বিজ্ঞানময় পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ

বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি।
—(মণ্ডুক, ৩।২।৭)

ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে।
—(প্রশ্নঃ ৬।৫)

১৯২৬ সালের সোনালী উষা, ভাগবতী-শক্তির আবাহন বার্তা-সঙ্কেতে পণ্ডিচেরীর আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিলে। পরা-চৈতন্যের আবাহনে ধ্যানমগ্ন শ্রীঅরবিন্দের দেহমনের প্রতিটি অণু-পরমাণু জ্যোতির্লোকের অদৃশ্য তরঙ্গের ক্রমাগত আসা-যাওয়ার উচ্ছ্বাসে ভরে উঠল। তিনি ক্রমশঃ আশ্রমের বাস্তব-জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে শুরু করলেন। বছরের প্রথম থেকেই আশ্রমের এবং আশ্রমবাসীদের সমস্ত কিছুর ভার শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমার হাতে সমর্পণ করে দিলেন। শ্রীঅরবিন্দ যা গড়েছেন এবং যা গড়বেন সেই সৃষ্টিকে সংধারণ এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধনের দায়-দায়িত্ব নেবেন বলেই তো আদ্যাশক্তির প্রতিমা শ্রীমা এসেছেন পণ্ডিচেরীতে। দেখতে দেখতে বছরের ছ'টি মাস কেটে গেল।

সেই সময় তাঁর আলাপ আলোচনা থেকে আশ্রমবাসীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে উচ্চতম অতিমানস আর মনের স্তরের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টাই তিনি করছেন। তিনি এই মধ্যবর্তী স্তরের নাম দিয়েছিলেন অধিমানস। ১৯২০ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত এই ছ'বছর ধরে শ্রীঅরবিন্দ যে উর্ধ্বচেতনাকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনবার সাধনা করছিলেন সেই অবতরণই সংঘটিত হোলো ২৪শে নভেম্বর, ১৯২৬ সালে।

১৯২৬ সালের ২৪শে নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবন সাধন-পথের মহান সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হোলো। মানুষের মনে দিব্য-বিবর্তন ক্রিয়া স্বীয় সাধন-প্রতিভায় ত্বরান্বিত করে তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণ করলেন যে বিংশ শতাব্দীর মানুষের পক্ষে জীবদ্দশায় ব্রহ্মবিজ্ঞানী হয়ে অমৃতত্ব লাভ করা সম্ভব। এই চিরস্মরণীয় দিনে তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দময়ের অমৃত স্পর্শ উপলব্ধি করে জীবন্মুক্ত হলেন। তাঁর নির্মাণমুক্তি যজ্ঞের সাফল্যের একান্ত প্রয়োজনীয় সেই পরা-চেতনা বা অতিমানসের পৃথিবীতে অবরোহণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হোলো। দৃশ্য এবং অদৃশ্য সমস্তলোকে ঘোষিত হোলো—পৃথিবীর বুকে এই নতুন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের আবির্ভাব-বার্তা—মুখরিত হোলো আগতপ্রায় দেবজাতির জনক শ্রীঅরবিন্দের জয়গানে।

১৯২০ সালে ৭ই এপ্রিল শ্রীঅরবিন্দ নিজের সাধনার ঊর্ধ্বগতি সম্বন্ধে বারীন্দ্রকে লিখেছিলেন—"যত উঁচুতে উঠি, মানুষের spiritual evolution-এর (আধ্যাত্মিক বিকাশের) চরম সিদ্ধির অবস্থা ততই নিকট হয়ে আসে। বিজ্ঞানে উঠায় আনন্দে উঠা সহজ হয়ে যায়। অখণ্ড অনন্ত আনন্দের অবস্থায় স্থির প্রতিষ্ঠা হয়, শুধু ত্রিকালাতীত পরব্রহ্মে নয়—দেহে, জগতে, জীবনে। পূর্ণ সত্ত্বা, পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ আনন্দ বিকশিত হয়ে জীবনে মূর্ত হয়। এই চেষ্টাই আমার যোগপন্থার central clue (মূল কথা)। এরূপ হওয়া সহজ কথা নয়।" ঐ পত্রে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাধনার সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা সম্পর্কেও মন্তব্য করেছিলেন—"এই পনেরো বৎসরের পরে" (অর্থাৎ ১৯০৫ সালে মারাঠী যোগী লেলের কাছে দীক্ষা গ্রহণের পরে) "আমি এইমাত্র বিজ্ঞানের তিনটি স্তরের নিম্নতর স্তরে উঠে নীচের সকল বৃত্তি তার মধ্যে টেনে তোলবার উদ্যোগে আছি। তবে এই সিদ্ধি যখন পূর্ণ হবে, তখন ভগবান আমার through (মধ্য) দিয়ে অপরকে অল্প আয়াসে বিজ্ঞান-সিদ্ধি দেবেন, এর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তখন আমার আসল কাজের আরম্ভ হবে।"(১৭)।

১৯২০ সালের ৭ই এপ্রিল তিনি যে 'বিজ্ঞান সিদ্ধি'-র সাফল্যের

কথা লিখেছিলেন, ১৯২৬ সালের ২৪শে নভেম্বর তিনি সেই সিদ্ধি লাভ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিজ্ঞানময় পুরুষ হলেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়—শুরু ("তখন আমার আসল কাজের আরম্ভ হবে")। এই স্মরণীয় দিনটিকে তিনি 'বিজয়ের দিন' বলেছিলেন। তাঁর কথায়--"November 24, 1926, was the descent of Krishna into the physical. Krishna is not the Supramental Light. The descent of Krishna would mean the descent of the Overmind Godhead preparing, though not itself actually, the descent of Supermind and Ananda. Krishna is the Anandamaya; he supports the evolution through the overmind leading it towards the Ananda."

আজান-দেব* (বৃহদারণ্যক, ৪।৩।৩৩) শ্রীঅরবিন্দ তাঁর জীবনের ব্রহ্মচর্য পর্যায়ে বৈদিক ঋষিদের উচ্চারিত—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।" (ঋগ্‌বেদ, ১০।১৩।১)—বাণীতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি এক চিরন্তন প্রার্থনা নিয়ে জীবন যজ্ঞে আহুতি দিয়েছিলেন নিজেকে—"মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়"। তাঁর জীবনের নিরন্তর কামনা—"তত্র মাম্ অমৃতম্ কৃধি"—জীবদ্দশায় সফল হয়ে উঠেছিল ২৪শে নভেম্বর। তিনি অনুভব করেছিলেন সেই পরমজ্যোতিঃ এবং তাঁর অন্তঃস্থ জ্যোতিঃ অভিন্ন। তিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী হলেন। কারাজীবনে শ্রীঅরবিন্দ অনুভব করেছিলেন "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১) অথবা "বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি" (গীতা, ৭।১৯)। এখন তিনি জ্ঞানের গুহ্যতম তত্ত্ব উপলব্ধি করলেন: "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্ এতদ্ অপ্রমেয়ং ধ্রুবম্" (বৃহ, ৪।৪।২০), অর্থাৎ নানাত্ব তাঁর নিকট নিঃশেষে নিবৃত্ত হয়—তিনি সুস্থিত থাকেন। স্ফুলিঙ্গ-বিন্দু বিবর্তিত হয়ে যেমন অলাত-চক্র* রচনা করে ঠিক সেইভাবে এই বিশাল বিশ্বের নানাত্ব তাঁরই মায়ার বিবর্ত—এর নিবৃত্তি তাঁহাতেই।

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

নমঃ পরম ঋষয়ে। পরম-ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ২৪শে নভেম্বর জ্যোতিঃস্নান করে জীবন্মুক্ত হলেন। ঐ সময়ে তাঁর সন্নিকটে অম্বুভাই পুরানী, নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রমুখ যে ২৪ জন লীলা সহচর উপস্থিত ছিলেন তাঁদের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, সেই স্মরণীয় দিনে পণ্ডিচেরীর আশ্রমবাসীদের মধ্যে এক বর্ণনাতীত নৈসর্গিক সংবেদনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

ব্রহ্মে যে প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত, জীবে তাহা বীজভাবে স্থিত। সেই অর্ধব্যক্ত বা অঙ্কুরিত সম্ভাবনাকে সাধনার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করবার জন্যেই জীব-বীজকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে বপন করা হয়। সাধক তপস্যার পথে এই ক্রমাভিব্যক্তি—অব্যক্তের ব্যক্তিভবন—বা ক্রমবিবর্তনকে সম্পূর্ণ করে তোলেন। এই সম্পূর্ণতাই যোগ। যোগে যোগী ব্রহ্মবিজ্ঞানী হয়ে পরাগতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁকে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা তাঁর মধ্যে ঐ প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি ঘটিয়েছিল—তিনি সচ্চিদানন্দের ভাবে মহোজ্জ্বল হয়ে জীবন্মুক্তি লাভ করেছিলেন। জীবন্মুক্তের সামনে দুটি পথ দুই ভিন্নমুখে প্রবাহিত—একটি নির্বাণ-মুক্তির পথ, অন্যটি নির্মাণ-মুক্তির পথ। শ্রীঅরবিন্দের সামনে এই পথ নির্বাচনের প্রশ্ন আসবার আগেই তিনি মনস্থ করেছিলেন যে তিনি নির্বাণ-মুক্তি বরণ করে বিশ্বের মুক্তিকামী জীবগণকে পরিত্যাগ করিবেন না। প্রহ্লাদের মতোই তিনি স্ববিমুক্তিকামী না হয়ে বললেন, "নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো। নান্যং তদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥" (ভাগবত, ৭।৯।৪৩)। শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বের মুক্তিকল্পে নির্মাণ-মুক্তি বরণ করে নিলেন। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে ঐরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষকে 'আধিকারিক' আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ ঐ অধিকারী পুরুষ অধিকার-সমাপ্তি পর্যন্ত স্বীয় অধিকারের ভার বহন করবেন। শঙ্করাচার্য বলেছেন, জীবন্মুক্ত পুরুষ সাধনবলে ভগবানের জগদ্ব্যাপার কার্যে সাহায্য করছেন এবং যিনি যে কার্যের অধিকারে নিযুক্ত তিনি সেই

অধিকারের সমাপ্তি পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাবেন। যেমন বর্তমান কল্পে যে জীবন্মুক্ত পুরুষ বিশ্বমণ্ডলে উত্তাপ ও আলোকদানের গুরুভার নিয়েছেন, তিনি কল্প পরিসমাপ্তি পর্যন্ত সূর্যের জীবনীশক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার ভার বহন করবেন।

জীবন্মুক্ত পুরুষদের মধ্যে যাঁরা পরার্থনিষ্ঠ হয়ে নির্বাণের চরম সুখকেও অবহেলা করে জগতের হিতার্থে আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের তালিকা বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যায়। দেবগণও মুক্ত পুরুষ। পূর্বকল্পের সাধনায় তাঁরা সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা নির্বাণ তুচ্ছ করে জগতের হিতার্থে বিভিন্ন ভার বহন করছেন। অধিকার পরিসমাপ্তি পর্যন্ত তাঁরা ভার বহন করে যাবেন। তারপর অপর সিদ্ধ পুরুষ সেই ভার বহনে ব্রতী হবেন। তবে এঁদের কোনো প্রত্যাশা নেই। যেমন ভগবান গীতাতে নিজের কর্ম সম্পর্কে বলেছেন—"ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মনি ॥" (গীতা, ৩।২২)। কারণ তিনি যদি কর্ম না করেন তবে সৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাবে—"উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহং।" (গীতা, ৩।২৪)। বুদ্ধদেব পরিনির্বাণের অধিকারী হয়ে নির্বাণমুক্তির পথে যাবার উপক্রম করার সময়ে নিখিল বিশ্বের মর্মভেদী আর্তস্বর শুনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যতদিন একটি জীবও অমুক্ত থাকবে ততদিন তিনি জীবকল্যাণে রত থাকবেন।

আদ্যাশক্তির প্রতিমা শ্রীমা বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ কল্প পরিসমাপ্তি পর্যন্ত বিশ্বের পূর্ণমুক্তির অধিকার নিয়ে প্রয়োজন মত পৃথিবীতে আসা-যাওয়া করছেন এবং করবেন। তাঁর আবির্ভাব সেই পরম পুরুষের অবতরণ—যা ইতিহাস রচনা করবে এবং যার কীর্তি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই অবতরণ দিব্যলীলার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। যে পরিণামের মধ্যে সনাতন ধর্মের সংরক্ষণ রক্ষাকবচ অনন্তকাল ধরে আছে এবং থাকবে। তাঁর আবির্ভাব যুগে যুগে ঘটবেই কারণ এই ঘটনা পরা-চেতনা বা সচ্চিদানন্দময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত—এই ঘটনা তাই অপ্রতিরোধ্য।

প্রবীণ সাধক পবিত্রের ভাষায়, "অনেকের ধারণা হতে পারে যে শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন ব্রহ্মে অথবা নির্বাণে। কিন্তু শ্রীমা আমাদের বলেছেন, এবং আমাদের উপলব্ধিতেও তার সাড়া পাই যে শ্রীঅরবিন্দ আমাদের সঙ্গেই আছেন, থাকবেন, কেবলমাত্র প্রেরণার উৎসরূপে নয়, জীবন্ত সক্রিয় উপস্থিতির মাধ্যমে, আলো এবং শক্তির জনকরূপে (যতদিন না তাঁর অধিকার পরিসমাপ্তি হচ্ছে অর্থাৎ) যতদিন না অতিমানস চেতনা সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করছে এবং প্রকট হচ্ছে। শ্রীমা আমাদের বলেননি কত বছর বা কত শতাব্দী লাগবে···এবং তা নিয়ে মাথা ঘামানও অনর্থক যদি আমরা সব-কিছু বিশ্বজনীন অথবা মানব-বিবর্তনের মাপকাঠি দিয়ে দেখতে শিখি।"

আজান-দেব শ্রীঅরবিন্দ দিব্য-মহিমায় যে একজন 'আধিকারক বা অধিকার প্রাপ্ত পুরুষ' ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'কারাকাহিনী'-তে। তাঁর জন্ম বিশ্ব-কল্যাণের জন্য, বিশ্বমুক্তির জন্য, নির্বাণ লাভের জন্য নয়—এই সত্য তিনি কারাজীবনের শুরুতে না বুঝলেও পরে বুঝেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "আমি তখন লোকের সঙ্গে মিশিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, সেই সময়ে আমার সাধনা খুব জোরে চলিতেছিল। সমতা, নিষ্কামতা ও শান্তির কতক কতক আস্বাদ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তখনও সেই ভাব দৃঢ় হয় নাই। লোকের সঙ্গে মিশিলে পরের চিন্তা স্রোতের আঘাত আমার অপক্ক নবীন চিন্তার উপর পড়িলেই এই নবভাব হ্রাস পাইতে পারে। বাস্তবিক তাহাই হইল। তখন বুঝিতাম না যে আমার সাধনার পূর্ণতার জন্য বিপরীত ভাবের উদ্রেক আবশ্যক ছিল, সেইজন্য অন্তর্যামী আমাকে হঠাৎ আমার প্রিয় নির্জনতা হইতে বঞ্চিত করিয় উদ্দাম রজোগুণের স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন।" (৩১)

মহাসিদ্ধির পর বিশ্বমুক্তিকল্পে পরা চেতনার আবাহনে নিভৃতবাসে নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় মগ্ন পরাজ্যোতিঃ-স্নিগ্ধ 'ব্রাহ্মণ' শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন ব্রহ্মনিষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ—১৯২৮ সালের ২৯শে

মে পণ্ডিচেরী আশ্রমে। ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের নিভৃতবাসে এই সাক্ষাৎকার একটি ব্যতিক্রম। সকালবেলায় রবীন্দ্রনাথ একা যান শ্রীঅরবিন্দের কক্ষে। শ্রীমা উপস্থিত ছিলেন মহান দুই বন্ধুর সাক্ষাৎকারের সময়। বেশ কিছুক্ষণ রবীন্দ্রনাথ কথাবার্তা চালান। তারপর জাহাজে ফিরে যান।

কবিগুরু লিখেছেন, "প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম, ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন। সেই দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা ওঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরের আলো জ্বালবেন। ...আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী তিনি অনুভব করেছেন ঃ যুক্তাত্মান সর্বমেধাবিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে বলে এলুম, আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে ঃ শৃন্বন্ত বিশ্বে।...অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি— অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার। আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়, আজো তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।" (৩২)

এই সাক্ষাৎকারের পর কবিগুরু 'শ্যান্টিলি' জাহাজে পাড়ি দিলেন ইউরোপ। শ্রীঅরবিন্দ আবার আত্মস্থ হলেন পরা-চিন্তায়—অমৃতময়ের আবাহনে, বিশ্বমুক্তিযজ্ঞের অনলে আত্মাহুতির কাজে। অনেক কঠোর এক সংগ্রামের সেনাধ্যক্ষ হিসাবে ক্ষত্রতেজের বিলুপ্তি সাধনে পরশুরামের চেয়েও অনেক শক্ত এক অনন্য প্রতিজ্ঞা জেগে রইল শ্রীঅরবিন্দের চেতনায় ঃ "I am a deputy of the aspiring world. My spirit's liberty I ask for all."।

জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীঅরবিন্দের 'প্রারব্ধ' কর্মজীবন

নিরাশীর্যত চিত্তাত্মা ত্যক্ত সর্ব পরিগ্রহ ঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্‌বিষম্ ॥

গীতা-৪।১১

জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রারব্ধ কর্মের বিনাশ (আশ্লেষ) হয় না। জীবন্মুক্তকে ভোগের দ্বারা তার ক্ষয় করতে হয়—"ভোগেন তু ইতরে ক্ষপয়িত্বা সংপদ্যতে" (ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৯)। শঙ্করাচার্যের মতে, ইহ-জন্মের সব কিছু কর্মফল বিনষ্ট হলেও যে প্রারব্ধ কর্মের দ্বারা এই জন্মের শরীর নির্মিত হয়েছে, ভোগ ভিন্ন সেই শরীরের ক্ষয় হয় না। এই প্রসঙ্গে সংখ্যাসূত্র (৩।৮২-৩) বলে, "চক্রভ্রমণবৎ ধৃতশরীরঃ। সংস্কারলেশতঃ তৎসিদ্ধি ॥"—অর্থাৎ ঘট প্রস্তুত হয়ে যাবার পরও কুম্ভকারের চক্র যেমন (বেগাখ্য) সংস্কারের বশে ঘুরতে থাকে তেমনি জীবন্মুক্ত হবার পর জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহ এবং শারীর কর্ম প্রারব্ধ কর্মের সংস্কারের বশে চলে—এই কারণেই তিনি জীবিত থেকে দেহ ভোগের মাধ্যমে ঐ প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় করেন। প্রারব্ধের ক্ষয়ে যখন মুক্ত পুরুষের অন্তিম দেহের পতন হয় তখন তিনি যদি নির্মাণ-মুক্তি কল্পে 'স্বারাজ্য-সিদ্ধির' অভিপ্রায় করেন তাহলে তিনি ইচ্ছাগতি প্রাপ্ত হন। ইনি ইচ্ছা করলে সেই ইচ্ছা সফল করার জন্য দেবতারা নিমিত্ত কারণ হন। ব্রহ্মসূত্র বলে—"সঙ্কল্প এব তু তৎ শ্রুতেঃ" (৪।৪।৮)। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলে—"সর্বে দেবা বলিমারহন্তি", "আপ্নোতি স্বারাজ্যম্" (তৈত্তি, ১।৪-৫)। ছান্দোগ্যের ঋষিও জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের এই 'ইচ্ছাগতির' কথা স্বীকার করেছেন—"ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্তি এতান্ চ সত্যান্ কামান্ তেষাং সর্বেষু কামাচারো

ভবতি" (ছা, ৮।১।৬) এবং "যং যম্ অন্তমভিকামো ভবতি যং কামং কাময়তে সোহস্য সংকল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে" (ছা, ৮।২।১০)। তথাগতের দর্শনে বলে—ইচ্ছাগতি প্রাপ্ত পুরুষ হলেন 'সম্ভোগকায়'। সম্ভোগকায় পুরুষ নির্বাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সম্ভোগকায় যদি নির্মাণমুক্তির ব্রত গ্রহণ করেন তবেই তিনি শ্রেষ্ঠতম। এই শ্রেষ্ঠতম পুরুষ ব্রহ্মের মতই সর্বাধিকারসম্পন্ন, স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন; কেবলমাত্র জগতের সৃষ্টি-স্থিতি লয়ে তাঁর কোনো কর্তৃত্ব হয় না—এই কর্তৃত্ব সেই এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের। জীবন্মুক্ত পুরুষ নির্মাণমুক্তির ব্রতে বিধিলিপি অনুযায়ী 'অধিকার' পাবার পর 'অধিকার পরিসমাপ্তি' পর্যন্ত 'অধিকৃত মণ্ডল-এর' সীমা রেখায় ঈশ্বরের মতই সব অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। এই সময়ে তাঁর কোনো কর্মফলের সঞ্চয় হয় না এবং অধিকার পরিসমাপ্তি হলে সেই সত্যবান পুরুষ গুণাতীত সত্য বা সচ্চিদানন্দময়ের মধ্যেই লীন হয়ে যান। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বা ব্রাহ্মণ যখন বিশ্বকল্যাণের অধিকার প্রাপ্ত হয়ে দেবতা হন তখন তাঁর দেহধারী হয়ে থাকা অথবা না-থাকা সম্পূর্ণভাবে তাঁর ইচ্ছাধীন। ব্রহ্মসূত্রের বাদরায়ণ ভাষ্য বলে—"শরীরের থাকা না-থাকা জীবন্মুক্তপুরুষের ইচ্ছাধীন। যদি শরীর থাকে তবে জাগ্রদ্‌বৎ ভোগ হয় ; যদি না থাকে, তবে স্বপ্নবৎ ভোগ হয়।" সমস্ত বিষয়ে স্বতন্ত্র, স্বাধীন, এবং স্বরাজ্যের অধীশ্বর মুক্তপুরুষ ইচ্ছাবশে কায় ব্যূহ রচনা করে ঐ কায়ায় অনুপ্রবেশ করতে পারেন।

১৯৭২ সাল। প্রারব্ধ কর্মের ফলে প্রাপ্ত দেহ মন্দিরে শ্রীঅরবিন্দের প্রজ্ঞা পরা-চেতনার আবাহনে নিযুক্ত। শ্রীমার দিব্য-শক্তির প্রভাবে বিশ্বমুক্তির প্রাণকেন্দ্র পণ্ডিচেরীর আশ্রম-জীবন, স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ, গতিতে নিঃশব্দে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আশ্রমবাসীরা সাধনার মাধ্যমে অতিমানসের অবরোহণের বুনিয়াদ গঠনে আত্মনিয়োগ করেছেন। এই নৈসর্গিক আশ্রম-জীবনের একটি নিখুঁত বর্ণনার উল্লেখ করছি।

"দৈনন্দিন কর্মের মধ্য দিয়ে বাসনা ত্যাগ ও আত্মনিবেদন সাধনার

একটা অপরিহার্য অঙ্গ বলে গণ্য হত। প্রত্যেকের কর্ম শ্রীমা নিজে ঠিক করে দিতেন। কর্মের মধ্যে উঁচু-নীচু, শ্লাঘ্য হেয় বলে কিছু ছিল না। বাড়ি-ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, সেলাই করা থেকে আরম্ভ করে পঠন-পাঠন, গান-বাজনা, ছবি আঁকা প্রভৃতি সব রকমের কাজ ভগবানের সেবারূপে করবার দিকে সকলেরই একান্ত চেষ্টা ছিল। কর্ম বাদ দিয়ে ধ্যান-ধারণা স্বাধ্যায় প্রভৃতি নিয়ে থাকলে শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ-যোগের যা লক্ষ্য, মানুষের স্থূল প্রকৃতির দিব্য রূপান্তর, তা কখনই সম্ভব হবে না—এ-তথ্য কারো অবিদিত ছিল না। কিন্তু এ বিষয়েও কোন নিয়ম, কোন বাহ্য বিধানের অনড় বাধ্যবাধকতা বা কঠোর শাসন ছিল না। সবাই স্বেচ্ছায় শ্রীমায়ের কাছে কাজ চেয়ে নিত ও প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁর সেবা রূপে, 'যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্' এই ভাব নিয়ে নিখুঁত ভাবে সম্পাদন করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করত। লক্ষ্য ছিল পরম্পরাগত ধ্যান-ধারণায় সমাধিতে আসক্ত না থেকে গীতোক্ত ব্রহ্ম-কর্মসমাধিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করা, কারণ জীবনের সমস্ত কর্ম নিষ্কাম ও অনাসক্তভাবে ভগবদ্দুদ্দেশে করতে না পারলে কর্মের মধ্যে মুক্তি ও ভগবানের সঙ্গে তাদাত্ম্য বোধ সম্ভব নয়। এই নিয়মশৃঙ্খলাহীন সাবলীল জীবনপ্রবাহের পেছনে দেখতে পেলাম এক অমোঘ ঐশ নিয়ন্ত্রণ, মাতৃশক্তির প্রেমাপ্লুত, হর্ষোজ্জ্বল, অদৃশ্য পরিচালন; যা মানুষের অগোচরে, কিন্তু মানবাত্মার উল্লসিত সহযোগে এই বহু-ভঙ্গিম সঙ্ঘজীবনকে সুষম সুবিন্যস্ত করে পুরুষোত্তমের পূর্ণতার দিকে নিয়ে চলেছে।"(১৯)

পণ্ডিচেরীর আশ্রমবাসীদের প্রত্যেকের কাছেই শ্রীমা ই সেই সাধনার গুরু ছিলেন। জীবন্মুক্ত শ্রীঅরবিন্দের দিব্য সত্তার এক অপূর্ব প্রতিমা শ্রীমা অহর্নিশি দেবসংঘের সংঘনায়কদের মধ্যে মধ্যে জ্যোতিস্নানের উপযুক্ততা আনবার কাজেই ব্যস্ত থাকতেন।

'লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি' (গীতা, ৩।২০)। কর্মযোগের সমর্থনে অর্জুনকে ভগবান শেষ ও গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটি

বলেছিলেন। সমস্ত জগতের পালন-পোষণ করে লোকসংগ্রহের এই যে অধিকার, সেটি জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রাপ্ত হন। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন যে, 'লোকসংগ্রহকারক সূক্ষ্ম ধর্মার্থনিরত সাধুদিগের উত্তম চরিত্র, বিধাতারই বিধান'। যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠদেব রামকে বলেছেন—'যে পর্যন্ত লোকের পরামর্শ নেবার কাজ এতটুকুও বাকী থাকে, অর্থাৎ শেষ না হয়, সে পর্যন্ত যোগারূঢ় পুরুষের অবস্থা নির্দোষ বলা চলে না। ভগবান নিজে (সাধুদের সংরক্ষণ, দুষ্টদের নাশ ও ধর্মসংস্থাপন) লোকসংগ্রহের কাজে অবতার হন সুতরাং মমত্ববুদ্ধিরহিত জীবন্মুক্ত পুরুষের পক্ষেই লোকসংগ্রহের কাজ সাজে। "গীতাকালে চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থা জারী ছিল এবং উহা গোড়ায় লোকসংগ্রহ করিবার জন্যই প্রবৃত্ত হয়, ইহা নির্বিবাদ। তাই চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থা অনুসারে নিজ নিজ প্রাপ্ত কর্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে যেরূপ করিতে হইবে তাহার প্রত্যক্ষ শিক্ষা-নির্দেশ করাই গীতার এই লোক-সংগ্রহ পদের অর্থ। ইহাই এখানে মুখ্য বক্তব্য। জ্ঞানীপুরুষ সমাজের শুধু চক্ষু নহেন, সমাজের গুরুও বটে। তাই ইহা স্বতঃই সিদ্ধ হয় যে উক্তপ্রকার লোকসংগ্রহ করিবার জন্য তিনি আপন কালের সমাজব্যবস্থায় যদি কোনো ত্রুটি দেখেন, তবে তিনি তাহা শ্বেতকেতুর ন্যায় দেশকালানুরূপ পরিমার্জিত করিবেন এবং সমাজের ধারণ-পোষণ শক্তিকে হ্রাস হইতে না দিয়া, তাহা যাহাতে বর্ধিত হইতে পারে এইরূপ উদ্যোগ করিবেন।...পরমেশ্বরের জ্ঞান অর্জন করাই এই জগতে মানুষের ইতিকর্তব্য—ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত। কিন্তু পরে গীতার বিশেষ উক্তি এই যে নিজের আত্মার কল্যাণেই সমষ্টিরূপ আত্মার কল্যাণার্থ যথাশক্তি চেষ্টারও সমাবেশ হয় বলিয়া লোকসংগ্রহ করাই ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের প্রকৃত পর্যাবসান।...প্রত্যেক মনুষ্যে ঈশ্বরসৃষ্ট প্রকৃতি, স্বভাব ও গুণের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতাকেই অধিকার বলা হয়। 'ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ' এই অধিকার অনুসারে নির্দিষ্ট কর্ম করিয়া যাইবে, কর্মত্যাগ করিবে না—এইরূপ বেদান্ত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ লোকসংগ্রহ না করিলে

সঙ্ঘশক্তি কমিয়া যায়"—'নারায়ণে'র অবতার শ্রীকৃষ্ণ 'নরে'র অবতার অর্জুনকে এইরূপ উপদেশই করিয়াছিলেন।"(৩৩)

১৯৩০ সাল। বিশ্ববাসীর কল্যাণ এবং মুক্তির ব্রতে ব্রতী-পুরুষদের সংঘ-কেন্দ্র পণ্ডিচেরী থেকে অধ্যাত্ম-শক্তির অদৃশ্য রশ্মি বিকিরিত হয়ে চলেছে। সংঘ-কেন্দ্রের প্রাণ-পুরুষের এবং প্রাণ-প্রকৃতির দিব্য-শক্তির আকর্ষণে 'লোকসংগ্রহের' কাজ বিধিনির্দিষ্ট স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পাদিত হচ্ছে। এই সময়ে, ব্রহ্মক্ষুধার নিবৃত্তি সাধনের সংকল্প নিয়ে এলেন পরম ভক্ত ও সেবক (ডাক্তার) নীরদবরণ। "শ্রীমায়ের অনুমতি নিয়ে ১৯৩৩ সালে তিনি পাকাপাকি চলে আসেন পণ্ডিচেরীতে। শ্রীঅরবিন্দ তখন খুলে দিয়েছিলেন কাব্যপ্রেরণার নির্ঝর: দিলীপ রায়, অমল কিরণ (K. D. Sethne), রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ সাহানা দেবী, কবি নিশিকান্ত, কবি হারীন চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর ভাই), আর্যব (J. A. Chadwick), জ্যোতির্মালা প্রভৃতি এই প্রেরণারই মুক্তধারায় অবগাহন করে ইংরাজি ও বাংলা কাব্য-জগতে শ্রীঅরবিন্দ প্রদর্শিত নতুন পন্থার পথিক হন। ডাঃ নীরদবরণও বাদ গেলেন না: mystic কিছু, কিছু surrealistic কবিতায় তিনি দেখালেন সহজ দখল।"(১৯)। ঐ সময়ে বিখ্যাত ফরাসী কবি মোরিস মাগ্র্ দিব্য-জীবনের জিজ্ঞাসা নিয়ে পণ্ডিচেরীতে আসেন। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার কাছে তিনি যা পেয়েছিলেন তারই ভিত্তিতে তিনি লিখেছিলেন 'A La Poursuite De La Sagesse' গ্রন্থটি।

১৯৩৪ সাল। পরাচেতনার আবাহনে যোগস্থ মহাপুরুষ বললেন, "সৎ, শুভ ও মঙ্গলময় শক্তির আগমন যতই সম্ভাবনায় ভরে উঠছে, অশুভ ও অমঙ্গলময় শক্তি সরোষে ততই পুঞ্জীভূত হচ্ছে।...পরা-চেতনা (যা নির্গুণ) এবং প্রকৃতি-চেতনা (যা সগুণ)—এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে ঈশ্বরের লীলা অভিব্যক্ত হচ্ছে, সুতরাং লীলার গতি অব্যাহত রাখার প্রয়োজনেই ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রণীত হয়—মানুষের স্বার্থান্ধ প্রয়োজনে সেই পরিকল্পনার পরিবর্তন হয় না"।

"The Supramental Force," he said, in 1934, "is descending, but it has not yet taken possession of the body or of matter—there is still much resistance to that. I know this Descent is inevitable—I have faith in view of my experience that the time can be and should be now and not in a later age." (Sri Aurobindo on Himself)। এর পরের বছর তিনি একটি চিঠিতে ইঙ্গিত দিলেন—"হার মেনে নিলে যদি জয়ের ভবিষ্যৎ পথ প্রশস্ত হয় তবে সেই হার মেনে নেওয়াই বিধি-নির্দেশ বলে বুঝতে হবে"। শুভ শক্তির দিগ্‌বিজয়ের সেনাপতির মনে সেই সময়ে অশুভ শক্তিকে পরাজিত করবার এই বিচিত্র রণ-কৌশল ভাবীকালের একটি মহান পরিণতির আভাস দিয়েছিল। "সব দিক বিচার করে দেখলে মনে হয়, শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে ব্যাধিবৈকল্যে স্থূলতঃ দেহত্যাগ তখনই একটা অপরূপ কৌশল।" (১৯)। আরও এক বছর বাদে ১৯৩৬ সালে উনি ওঁর এক শিষ্যকে লিখেছিলেন: "না, আমি স্বর্গ নিয়ে ব্যস্ত নই…এ বরং ঠিক উল্টো প্রান্ত নিয়ে রয়েছি, আমাকে নামতে হবে পাতালে, যাতে গড়তে পারি দুয়ের মধ্যে সেতু। আমার কাজের জন্য এরও প্রয়োজন আছে, এর সম্মুখীন হতেই হবে।"

শ্রীঅরবিন্দ-চিন্তার অন্যতম প্রবক্তা পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ অনুযায়ী—'এই নিমজ্জনের পথে নিগূঢ় নিশ্চেতনা স্তরের পর স্তর যেমন দীর্ঘ করে ধরা হয় আর তার মধ্যে নামিয়ে আনা হয় অতিমানসের আলো, তেমনি সেই সঙ্গে আবার ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা সবও—আসতে পারে ভিতরে আঘাত এবং শরীরের উপর দারুণ নির্যাতন'। পরের বছরে, ১৯৩৭ সালে, এক শিষ্যের পত্রোত্তরে শ্রীঅরবিন্দ সুস্পষ্ট ভাষায় জানালেন, "here there are any number of people who have had experiences which could be highly prized outside. There are even one or two who have had the Brahman realisation in a single year." (৩৪)।

প্রারব্ধ কর্মে জীবন্মুক্ত পুরুষের একটি যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। 'ইচ্ছাগতি'-র অধিকারী জগতের কল্যাণে নিষ্কামভাবে একটির পর একটি প্রয়োজনীয় সংকল্প নিয়ে চলেছেন। দেবসজ্ঘের সজ্ঘনায়কত্বের যোগ্য হবার প্রস্তুতি চলেছে আশ্রমবাসীদের মধ্যে। শুভময়ের আবির্ভাব আসন্ন। এমন সময় অশুভ শক্তির পুঞ্জীভূত রোষ প্রবল ও প্রকট হয়ে উঠলো। অশুভ শক্তি সার্থকভাবে রূপ পারগ্রহ করলে হিটলারের বিশ্বগ্রাসের সর্বনাশা ক্ষুধাকে অবলম্বন করে। নির্মাণ-মুক্তিনিষ্ঠ শ্রীঅরবিন্দ বললেন······"the peril of black servitude and a revived barbarism threatenig India and the world."। পশু-শক্তির পতন ঘটাবার সংকল্প করলেন শ্রীঅরবিন্দ সৃষ্টির সংধারণে, বিশ্বের কল্যাণে—সংকল্পমাত্রেই প্রযুক্ত হল ব্রহ্মতেজে বলীয়ান ব্রহ্মাস্ত্র। এর পরিণাম সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে দর্শনাচার্য শিশিরকুমার মিত্রের লেখনীতে ঃ "these forces of Darkness which were out not only to destroy human civilisation with all its higher values but also to frustrate the Divine work of Sri Aurobindo and the Mother—the work of liberating man from bondage to there forces into the freedom and power of a New Light from above that would transform man into his destined divine perfection. When these hostile forces found that their sovereignty over the earth was challanged, they attempted, said Sri Aurobindo, an attack on the Mother's body. But as he concentrated exclusively on repelling it without even allowing a shade of the black force to fall on the Mother, the attack came on him."। যেমনটি আভাস দিয়েছিলেন ১৯৩৬ সালে—"আসতে পারে ভিতরে আঘাত এবং শরীরের উপর দারুণ নির্যাতন"।

১৯৩৮ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখে সেই অশুভ শক্তির পুঞ্জীভূত রোষ আঘাত হানলো শ্রীঅরবিন্দের দেহে—ডান পায়ের

উপরের দিকের হাড় ভেঙে গেল। ঠিক বারো বছর আগে যে পরা-চেতনার সঙ্গে তিনি নিজে সংযুক্ত হয়েছিলেন সেই পরা-চেতনার জ্যোতিঃস্নান আরও ব্যাপকভাবে হওয়ার পথে অশুভ শক্তি প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করলেও সুবিধে করতে পারলে না—বিংশ শতাব্দীর নীল-কণ্ঠ নিজে সেই বিষ টেনে নিলেন। অন্ধকারের প্রভাবে আলো নিষ্প্রভ হলো না বরং আলোর মাঝে হোলো অন্ধকারের মৃত্যু। এই ভাবে হিটলারের মদোন্মত্ততার যূপকাষ্ঠে দেশমাতৃকার অকাল মৃত্যুকে প্রতিরোধ করলেন শ্রীঅরবিন্দ এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের সেই অশুভ শক্তিকে সমূলে বিনাশ করার নিয়তিকেও নির্ধারিত করলেন। এই নিয়তির সঙ্গেই অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা। এই ঘটনার পরের বছরই হিটলারের বীভৎস রূপ প্রকাশ পেল, ক্রমশঃ বিশ্বকে বিপর্যস্ত করলো কিন্তু নিয়তির অমোঘ নির্দেশে হিটলার নিশ্চিহ্ন হলেন। এই ঘটনাচক্রে বৃটিশের প্রভুত্বের উন্মাদনায় ভাটা পড়লো, ফলে ভারতের স্বাধীনতার সম্ভাবনা আকস্মিকভাবেই ত্বরান্বিত হলো।

১৯৩৯ সালে পণ্ডিচেরীতে এলেন বিশ্বভারতীর চীনা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অধ্যাপক তান্ য়ুন্ শান্। দর্শন করলেন দিব্য-পুরুষকে এবং আদ্যাশক্তিকে। উপলব্ধি করলেন এবং বললেন, "জীবনের সুসাধ্য এক দর্শনের বিবর্তন করেছেন শ্রীঅরবিন্দ, মানুষের আধ্যাত্মিক সিদ্ধির ইতিহাসে যা অদ্বিতীয়, এবং তার চরম লক্ষ্যের…সিদ্ধিও অবধারিত।"

১৯৪০ সাল। শ্রীঅরবিন্দের দেহে দেখা দিল শেষ-ব্যাধির প্রথম লক্ষণ। কলকাতার বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক প্রভাত সান্যাল গুরুদেবের দেহ-বৈকল্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে সব সময়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে উপদেশ দিলেন। কিছুদিন পর আবার ডাক্তার সান্যাল এলেন গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শনে। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ নিজেই তাঁকে বলেছিলেন, 'অসুখ আর নেই, আমি রোগ সারিয়ে ফেলেছি'।

এই সময়ে 'সাবিত্রী' মহাকাব্য লেখার কাজ পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চলেছে। বই লেখা ছাড়া আশ্রম সম্পর্কিত পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈ-মাসিক কাগজের (বিভিন্ন ভাষায় লিখিত) প্রবন্ধ শোনা, চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া, পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখা, ভক্তশিষ্যদের উপদেশ দেওয়া, ইত্যাদি বহুবিধ কাজ ছিল তাঁর দৈনন্দিন তালিকাভুক্ত। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য এবং একান্ত-সচিব ডাক্তার নীরদবরণ লিখেছেন: "এ সমস্ত ভারী বোঝা বইবার সময় ছিল মাত্র দেড় কি দু' ঘণ্টা।...অনেকে অবাক্ হয়ে ভাবত এত অল্প সময়ের মধ্যে কলের মত দ্রুতগতিতে কাজের স্তূপ নিঃশেষ হতো কি করে। কলের মতই বটে, শ্রীকৃষ্ণের যাদুশক্তির মতও বটে। কারণ, এ সময় তাঁর কার্যক্ষমতার একটা অদ্ভুত নিদর্শন চোখে পড়ে।...এ সব কর্মকৌশল—যোগঃ কর্মসু কৌশলং—আমরা দেখতে পাই,—বুঝতেও পারি কিছু, কিন্তু অদৃশ্য। জগতকে তাঁর মহাশক্তির লীলাখেলা বুঝাবার ক্ষমতা কোথায় আমাদের?"

ঠিক এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো বিরাজ করছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব পরোক্ষভাবে ভারতকে প্রভাবিত করেছে। রামগড় কংগ্রেসের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস তিনি ব্যক্ত করেছেন—'ইহাই স্বাধীনতার দাবি ও সংগ্রামের উপযুক্ত সময়'। ১৯৪০ সালের প্রথম ভাগে সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি আবার কারারুদ্ধ হবেন। তিনি পরিকল্পনা করলেন—যেভাবেই হোক ভারতের বাইরে যাবেন। সেই পরিকল্পনা তিনি কার্যকরী করলেন ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এলগিন রোডের বাড়ীতে অন্তরীণ থাকার সময়ে। ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি রাত্রি ১-২৫ মিনিটে সুভাষচন্দ্র ছদ্মবেশে এলগিন রোডের গৃহ ত্যাগ করেন। ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে সুভাষচন্দ্র বার্লিনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রধান দফতরের উদ্‌বোধন করেন। নভেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের দফতর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

পায়। ডিসেম্বর মাসের ৭ই ভারতবাসী সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শুনলেন ঃ—"আমি সুভাষ ;...আমি যেভাবে বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে ভারতবর্ষ থেকে চলে এসেছি, ঠিক তেমনি করেই উপযুক্ত সময়ে আপনাদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হবো।... নিজেরা জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে অবিলম্বে সংঘবদ্ধ হোন—চাই ঐক্য ও একাগ্রতা।" 'জয় হিন্দ্' সম্ভাষণ প্রচারিত হলো। সুভাষচন্দ্র হলেন 'নেতাজী'। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃতি পেল কবিগুরুর লেখা 'জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা'।

১৯৪২ সাল। শ্রীমা আশ্রমের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। দিব্যশক্তির প্রভাবে আশ্রমের জীবন এগিয়ে চলেছে স্বতঃস্ফূর্ত গতিতে বিধিনির্দিষ্ট পথে। "সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে কর্নেল হাণ্ট ৪০,০০০ ভারতীয় সৈন্য জাপান গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধি ফুজিহারার হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলেন।...এদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগ দিতে চাইল তাদের নিয়ে আই. এন্. এ. গঠনের চেষ্টা চললো। প্রায় চার হাজার যুদ্ধবন্দী ভারতের স্বাধীনতার জন্যে অগস্ট মাসের মধ্যে আই. এন্. এ.-ভুক্ত হয়ে গেল।...ব্যাঙ্কক অধিবেশনে একটি কর্ম পরিষদ্ গঠন করে শ্রীরাসবিহারী বসু তার সভাপতি ও মোহন সিং সভ্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন।...১৯৪২ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি য়্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি অফ্ স্টেট্স ভারতের বর্তমান অবস্থায় করণীয় কি হতে পারে এই মর্মে এক স্মারকলিপি পাঠালেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি চিয়াং কাইশেক প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে জানালেন আসন্ন জাপ অভিযানের মুখে ভারতের সঙ্কটময় অবস্থা।...আমেরিকা ও ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার জন্যে ভারতের নেতাদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের একটা মীমাংসা করা একান্ত প্রয়োজন। ১লা মার্চ লক্ষ্ণৌয়ে বীর সাভারকার...বললেন যে ভারত চায় পূর্ণ স্বাধীনতা এবং...উদার-নৈতিক দলের পক্ষে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু মিস্টার চার্চিলের কাছে একটা স্মারকলিপি পাঠালেন।...চার্চিল তখন কোন কিছু শুনতে রাজী নন্...। ১৯৪২

সনের ৭ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন হলো।…রেঙ্গুনের পতনের পর বৃটিশ পার্লামেণ্টের শ্রমিক ও সোস্যালিস্ট সদস্যেরা মিঃ চার্চিলের উপর চাপ দিতে লাগলেন। একদিকে রুজভেল্ট অন্যদিকে চিয়াং কাইশেক ও রাশিয়া সমানে মিস্টার চার্চিলকে জানাতে লাগলেন যে ভারতবাসীর সহাযোগিতা না পেলে জাপানের বিরুদ্ধে দেশ রক্ষা করা অসম্ভব। কাজেই ভারতের নেতাদের সঙ্গে একটা মীমাংসা করা অবিলম্বে প্রয়োজন। মিঃ চার্চিল অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত ১১ই মার্চ ঘোষণা করলেন যে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির অন্তর্বিরোধ অবসানের জন্যে ক্যাবিনেট সদস্য স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রীপ্স ভারতে যাবেন।…১৯৪২ সনের ২৩শে মার্চ এলেন স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রীপ্স— নিয়ে এলেন draft declaration…বললেন তাঁর প্রস্তাবের অর্থ— পূর্ণ নিরঙ্কুশ স্বায়ত্ত শাসন ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। তবে সব কিছুই যুদ্ধের শেষে, আগে নয়।…'ক্রীপ্স-প্রস্তাব' কংগ্রেস গ্রহণ করতে পারল না।…গান্ধীজী ক্রীপ্স-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন… 'a post dated cheque on a crashing bank?'। কংগ্রেস বললো —Cripps is an agent of British re-action'। পণ্ডিত নেহেরু বললেন, "It is sad beyond measure that a man like Sir Strafford Cripps should allow himself to become a Devil's Advocate." (৩৫)।

ক্রীপ্সের প্রস্তাব ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীঅরবিন্দের চিন্তায় সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছিল। ভারতের উত্থান-পতনের নিয়তির সঙ্গে জড়িত এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তিনি উদাসীন না থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ক্রীপ্সকে তাঁর মত লিখে জানালেন: "I welcome it as an opportunity given to India to determine for herself, and organise in all liberty of choice, her freedom and unity and take an effective place among the world's free nations. I hope that it will be accepted, and right use made of it, putting aside all discords and divisions. I hope too that friendly relations

between Britain and India replacing the past struggles, will be a step towards a greater world union in which, as a free nation, her spiritual force will contribute to build for mankind a better and happier life." তিনি স্বতন্ত্রভাবে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতাদের পত্র লিখলেন এবং দিল্লীতে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে তাঁর শিষ্য ডোরাইস্বামী আয়ারকে দূত হিসাবে তাঁর বক্তব্যের পক্ষে যুক্তিগুলি পেশ করবার জন্য পাঠালেন। শ্রীঅরবিন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে ক্রীপ্সের প্রস্তাব মেনে নিলে ভারতের শিল্প ও অর্থনৈতিক কাঠামো সুঠাম হয়ে উঠবে এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় যুবকেরা সামরিক শিক্ষা গ্রহণের অভূতপূর্ব সুযোগ পাবেন। এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলে ভারতের অখণ্ডতাও বজায় থাকবে—এই গুহ্য তত্ত্বটিও শ্রীঅরবিন্দ উপলব্ধি করেছিলেন। প্রস্তাবটি এসেছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসাবে কংগ্রেসের কাছে। কিন্তু কংগ্রেসের নেতাদের অন্ধ-আবেগ সেই সময়ে তাদের দূরদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাই ক্রীপ্সের দৌত্য ফলপ্রসূ হল না। এই প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "I have done a bit of *Nishkama karma* (disinterested work)".

দেশবাসীর বিমূঢ়তায় নির্মাণ-মুক্তির ঋত্বিক বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ভারতের তথা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত অগণিত মানুষের কল্যাণে তাঁর তপোবল প্রয়োগ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা না গেলেও বিধাতার করুণায় অনেক অঘটন ঘটে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের প্রজ্ঞা দিব্য গতিতে প্রভাবিত করলো বিশ্বের বৃহত্তর শক্তিগোষ্ঠীর শুভ বুদ্ধিকে এবং বিভ্রান্ত করলো অসুর শক্তিতে বলীয়ান যুদ্ধোন্মত্ত জাতির কর্ণধারদের। শুভবুদ্ধি জাগ্রত হওয়ার ফলে রণনীতি পরিবর্তিত হলো এবং অসুর-শক্তির কর্ণধারদের বিভ্রান্তির ফলে লালসার বহ্নি তাদের বিচক্ষণতাকে তমসাবৃত করে দিলে। এই প্রসঙ্গে দর্শনাচার্য শিশিরকুমার মিত্রের বিশ্লেষণ সর্বাঙ্গ-সুন্দর মনে হওয়ায় উল্লেখ করছি: "What force worked in

them ? The leader of the people, the chosen instrument of the Divine, in one of his famous speeches on that occasion, had to admit—'I feel an unseen hand guiding me.' The British king also expressed a similar experience in a thanks-giving speech. The result ? The tide of Hitler's uninterr-upted victories, taken at its full flood, was now turned back on himself and his forces to the complete ruin of Nazism and to the decisive victory of the allied powers. So sure was Hitler of his victory over England that he had actually fixed August 15 as the day when he would celebrate it with a dinner at the Buckingham Palace. Little did the mad denizen of the under world know that August 15 is God's day, the day of celebration of God's Truth, over which no dark Force could ever east even a shadow. As regards Japan, when her intention to conquer India became clear, Sri Aurobindo directed his spiritual force against her and she too shared a similar fate." (৩৬)।

প্রজ্ঞাসুন্দর শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-শক্তি সম্ভবত জার্মানীতে ক্ষত্র-তেজাধিপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চেতনায় এনে দিয়েছিল অপূর্ব দূর-দৃষ্টি। নেতাজী বুঝতে পারলেন অসুর-নাশিনী শক্তির হাতে অসুর-শক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তিনি জার্মান Admiral Canaric-কে বললেন, "You know as well as I do that Germany cannot win this war. But this time victorious Britain will lose India."

"...১৯৪৩ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারি নেতাজী ও তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী আবিদ হাসান একটি জার্মান সাবমেরিনে গোপনে কিয়েল ত্যাগ করলেন...মাদাগাস্কারের চারশো মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছলেন...সেখান থেকে ২৮শে এপ্রিল রবারের ডিঙিতে চড়ে তাঁরা গিয়ে উঠলেন জাপানী আই-২৯ নম্বর ডুবো জাহাজে।

ভারত মহাসাগর পার হয়ে সুমাত্রার উত্তর প্রান্তে সবং থেকে কর্নেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে বিমান পথে ১৩ই জুন পৌঁছুলেন টোকিও।… পরদিন জাপানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ তোজোর সঙ্গে দেখা করলেন। প্রধানমন্ত্রী তোজো, নেতাজীকে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠন ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দিলেন। জাপানীদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় এলাকা অস্থায়ী সরকারের অধীনে আসবে বলে জানালেন তিনি। জাপ পার্লামেণ্টে মিঃ তোজো ঘোষণা করলেন, 'ভারতীয় জনগণের শত্রু প্রভুত্ব মদোদ্ধত অ্যাংলো-স্যাক্সনদের দুঃসহ দর্প ভারতের মাটি থেকে উৎখাত করে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্যে জাপান সকল রকমে সাহায্য করবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে'।…১৯৪৩ সনের ২৪শে জুন নেতাজী বেতার ভাষণে বললেন, 'ভারতের স্বাধীনতা লাভের আর দেরি নেই' …২রা জুলাই এলেন সিঙ্গাপুরে।…২৫শে অগস্ট বললেন,…'স্বাধীনতা সকলেরই জন্মগত অধিকার। পৃথিবীতে আজ এমন আর কোনো শক্তি নেই, যে সেই অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে পারে'।…৩১শে ডিসেম্বর পোর্ট ব্লেয়ারের স্বাধীনতা সহস্তে গ্রহণ করে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের যথাক্রমে নাম দিলেন 'শহীদ' ও 'স্বরাজ' দ্বীপ…।

"১৯৪৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তাঁর সদর দপ্তর ও মন্ত্রীসভার প্রধানদের নিয়ে রেঙ্গুন পৌঁছুলেন। ভবিষ্যৎ রণনীতি নিয়ে জাপ প্রধান সেনাপতি জেনারেল কাওয়াবের সঙ্গে আলোচনার সময় নেতাজী কলকাতার অসামরিক অধিবাসীদের উপর বোমাবর্ষণের যুক্তি বাতিল করে দিলেন। নেতাজী চাইলেন আই. এন্. এ.-র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং শক্তি পরীক্ষার উপযোগী রণক্ষেত্র। স্থির হলো আই. এন্. এ. স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধ করবে আর ভারতের যতটুকু জায়গা অধিকার হবে ততটুকু শাসনের ভার ছেড়ে দিতে হবে আই.এন্.এ.-র হাতে। অধিকৃত জায়গায় উড়বে ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত ভারতের স্বাধীনতার পতাকা। …৩রা ফেব্রুয়ারি রণাঙ্গনে যাবার সময় নেতাজী বললেন, '…শত্রুপক্ষের ব্যূহ দীর্ণ করে আমরা আমাদের জয়ের পথ করে

নেবো। আর যদি ভগবান চান যে আমরা মৃত্যু বরণ করে শহীদ হবো, তবে আমাদের সৈন্যেরা যে-পথে দিল্লী যাবে, মরণের কোলে শুয়ে আমরা সেই পথ চুম্বন করবো। দিল্লী চলো।'...অসামান্য সাফল্যের খবর এসে গেল...মার্চ মাসে মণ্ডডেকের পতন হলো।... স্বাধীনতা যুদ্ধের নির্ভীক সৈন্যদের প্রথম পদচিহ্ন পড়লো ভারতের বুকে —সগৌরবে আকাশে উড়লো ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা, শত কণ্ঠে গাওয়া হলো জাতীয় সঙ্গীত।...নেতাজী তাঁর ভাষণে বললেন, 'যতদিন না ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ একেবারে উৎখাত হয় ততদিন এ যুদ্ধ চলবে।'...মে মাসের শেষে আই.এন্. এ-র সৈন্যেরা পৌঁছুল কোহিমায়। কোহিমার উন্নত গিরিচূড়ায় উড়লো ভারতের স্বাধীনতার ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা।...স্থানীয় নাগা সর্দাররা বললেন...শত্রু ইংরেজকে চাই না, বন্ধু জাপানীও আমাদের কাম্য নয়...আমরা চাই সেই আমাদের একান্ত আপনার জন পরমাত্মীয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে। ৪ঠা জুলাই নেতাজী সৈন্যদের বললেন, 'রক্তদানই স্বাধীনতার উপযুক্ত মূল্য। আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেব।'...

"২৬শে জুলাই, বাস্তববাদী যুক্তিনিষ্ঠ মানুষ মিঃ তোজো মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করলেন।...১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।...৪ঠা মে ইংরেজ রেঙ্গুন পুনরুদ্ধার করলো। নেতাজী বর্মা ছাড়লেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'বীরের মত পরাজয় মানো, পরম সম্মান ও শৃঙ্খলার সঙ্গে ব্যর্থতা বরণ কর। তোমাদের জীবনাদর্শ আত্মত্যাগের অপার্থিব মহিমায় উদ্ভূত—এর ক্ষয় নেই।'...৬ই অগস্ট অ্যাটম বোমা পড়ার ফলে সেই মাসের মাঝ বরাবর জাপান বশ্যতা স্বীকার করলো। নেতাজী সাইগন থেকে একটি দু-ইঞ্জিন বিশিষ্ট বোমারু বিমানে কয়েকজন জাপ অফিসারের সঙ্গে মাঞ্চুরিয়ার দাইরেন হয়ে চললেন টোকিও। ফরমোজার তাইহোকু বিমান বন্দরে ১৮ই অগস্ট নামলেন বেলা দুটোর সময়। সেখান থেকে মধ্যাহ্নভোজ সেরে তাইহোকু ত্যাগ করলেন। তারপরের সঠিক সংবাদ আজও অজ্ঞাত ও রহস্যাবৃত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলো।…ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৪২ সনের আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। তার আগে বিপ্লব আন্দোলনও ব্যর্থ হয়ে যায়। কংগ্রেস তখন দলাদলি, ঈর্ষা ও ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ, কর্মে মুমূর্ষু।…যুদ্ধে জিতলেও ইংরেজের শক্তি তখন অবনমিত, সূর্যাস্তের মত।…

"১৯৪৫ সালের ২১শে অগস্ট ইংলণ্ডের সম্রাট ঘোষণা করলেন যে ভারতকে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হবে আর তার জন্য নির্বাচন শীতকালের মধ্যে শেষ করতে হবে।…সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ভারতের বিভিন্ন দলের ঐক্য কামনা করে বেতার ভাষণ দিলেন।……নির্বাচনের আগে হিন্দু ও মুসলমান দুই দলই সরাসরি প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লো।…আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের বিচারের ব্যবস্থা করতে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ১৯৪৫ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত সময় লাগলো।…কংগ্রেস…শ্রীবুলাভাই দেশাইয়ের নেতৃত্বে একটি ডিফেন্স কমিটি গড়ে তুললো।…বিচারে শাহ নওয়াজ, সায়গল ও ধীলনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম হলো।…ভারতের প্রধান সেনাপতি ফিল্ডমার্শাল অকিন্‌লেকের চেষ্টায় এঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মুকুব হলো।…এটাই হয়ে দাঁড়ালো কংগ্রেসের পক্ষে মোক্ষম রাজনৈতিক অস্ত্র, আর এ অস্ত্র কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়ে দিল। ইতিমধ্যে নির্বাচনের ফলে দেখা গেল কংগ্রেস আশাতীতভাবে জয়লাভ করেছে…কেবলমাত্র বাংলা ও সিন্ধুতে হয়েছে মুসলীম লীগের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য।

"১৯৪৬ সালের ২৮শে জানুয়ারি বড়লাট ঘোষণা করলেন যে তিনি নতুন কর্মসংসদ স্থির করবেন আর খুব শীঘ্র গড়ে তুলবেন একটি সংবিধান রচনাকারী পরিষদ।…পার্লামেণ্টারি ডেলিগেসনের সামনে মিঃ জিন্না পাকিস্তানের দাবি তুলে স্পষ্ট ভাষায় জানালেন যে পাকিস্তান বৃটিশ গভর্নর জেনারেলের অধীনের বৃটিশ সাম্রাজ্যের তাঁবেদার হয়েই থাকবে।…স্থির হলো সংবিধান রচনা না হওয়া পর্যন্ত

মধ্যবর্তীকালীন সরকার দেশের শাসন পরিচালনা করবেন।…বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারত বিভাগের পক্ষপাতী না হলেও মিঃ জিন্নার প্রস্তাব-মত বললেন যে মধ্যবর্তীকালীন সরকারে বারোজন সদস্য থাকবেন, কংগ্রেস ৫, লীগ ৫, শিখ ১, এবং দেশী খৃষ্টান ১।…বড়লাটের মুসলিমদের প্রতি অযৌক্তিক পক্ষপাতিত্বের নিদর্শনের লিখিত প্রমাণ পেয়ে ২৫ শে জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মধ্যবর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে দিলেন…১৯৪৬ সনের ৬ই জুলাই নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনে বিপুল ভোটাধিক্যে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান (কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট) গ্রহণযোগ্য বলে প্রস্তাব গৃহীত হলো। …মিঃ জিন্না এক রকম নিরুপায় হয়েই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান স্বীকার করেছিলেন।…২৯ শে জুলাই মিঃ জিন্না (কংগ্রেস সভাপতি নেহরুর মন্তব্যের ভিত্তিতে) বোম্বাইয়ে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে পাস করালেন ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান প্রত্যাখ্যানের প্রস্তাব ধার্য হলো ১৬ই অগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন।…এমনি করেই পাকিস্তান সৃষ্টির উপক্রমণিকা রচিত হলো।…

"১৬ই অগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শুরু হলো।…অনেক জীবন পড়লো বলি, সভ্রম নষ্ট হয়ে গেল বহু হিন্দু নারীর। আরম্ভ হয়ে গেল হিংসার অন্তহীন উন্মত্ততা—আর্ত নরনারীর মর্মন্তুদ হাহাকার উঠলো অভ্র ভেদ করে।…ইংরেজ গভর্নর নিক্রিয় হয়ে বসে রইলেন।…তিন দিনে ৬০০০ লোক নিহত, ২০,০০০ আহত ও প্রায় এক লক্ষ লোক গৃহহীন হলো বাংলায়।…মৌলানা আজাদ বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে অবস্থা জানালেন। তিনি শুনলেন সব, বুঝলেন সব, তবুও তখনকার মত কাজে থাকলেন নিষ্ক্রয়। বাংলার রাজধানী নরকে পরিণত হলো।…বড়লাট কলকাতায় এলেন…দেখেশুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন…২৭শে অগস্ট দিল্লী ফিরে গিয়ে গান্ধীজী ও পণ্ডিত নেহরুকে ডাকলেন।…মধ্যবর্তীকালীন সরকারের সদস্যদের ২রা সেপ্টেম্বর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হলো। মধ্যবর্তীকালীন সরকার কিছুদিন জোড়াতালি দিয়ে চলবার পর ১৯৪৩ সনের

অক্টোবরের মাঝামাঝি নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় হিন্দুদের উপর আবার লীগ গভর্নমেণ্টের সুপরিকল্পিত অত্যাচার আরম্ভ হয়ে গেল।…কংগ্রেস কিছু করতে পরলে না।…লর্ড ওয়াভেল কোন কথাই বললেন না…। গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্যে নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে সফর করলেন।…মানুষের বেদনার বহ্নি শিখায় তিনি দিতে চাইলেন অমৃত প্রলেপ।…

"১৯৪৭ সনের ২রা মার্চ তিনি চার মাস সফর শেষ করে ফিরে এলেন।…আবার অশান্তি আরম্ভ হলো…ঐক্যের আবেদন বার বার ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। ইতিমধ্যে ওয়াভেল চলে গেছেন। ১৯৪৭ সনের ২৭শে মার্চ লর্ড মাউন্টব্যাটেন বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করলেন। …লর্ড মাউন্টব্যাটেন কাজের লোক। তিনি ৩১শে মার্চ থেকে ৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচদিন গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ করলেন। গান্ধীজী ঠিকই বুঝেছিলেন যে বড়লাট ভারত বিভাগের পক্ষপাতী।…কংগ্রেসের সেই চরম দুর্দিনে তিনি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে এমন কথা বললেন যা সারা ভারত তার প্রকৃত অর্থ না বুঝে, বিস্ময়ে চমকে উঠলো। তিনি ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বললেন, 'মিস্টার জিন্নার হাতে গভর্নমেণ্ট গঠনের ভার দেওয়া হোক। তিনি ইচ্ছা করলে সব কয়জন মুসলমান বা কিছু হিন্দু কিছু মুসলমান মন্ত্রীসভায় নিতে পারবেন—আর বড়লাটের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।' …তারপর বড়লাট মিঃ জিন্নার সঙ্গে আলাপ করলেন। বুঝলেন গান্ধীজীর মতই মিঃ জিন্না কঠিন লোক।…বড়লাট সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করলেন। সর্দার প্যাটেল স্বীকার করলেন যে পাঞ্জাব ভাগ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।…পণ্ডিত নেহরু প্রথম থেকেই দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন…সর্দার প্যাটেলের অনুরোধে পণ্ডিত নেহরু শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর সঙ্গে কোনো রকম পরামর্শ না করে দেশ বিভাগে সম্মতি দিয়েছিলেন। …গান্ধীজী বললেন, 'যতক্ষণ আমি জীবিত ততক্ষণ আমি কিছুতেই সম্মতি দেবো না—যদি পারি ত কংগ্রেসকেও দিতে দেবো না।'…গান্ধীজী

প্রতিদিন তাঁর প্রার্থনা সভায় দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে বলতে লাগলেন।

"১৯৪৭ সালের ৪ঠা জুন বড়লাট গান্ধীজীকে তাঁর প্রার্থনা সভায় যাবার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করলেন।...সেদিন থেকে প্রার্থনা সভার সুর বইতে লাগলা অন্য খাতে। তিনি বললেন, '...আমরা হিন্দু মুসলমান একমত হতে না পারি ত বড়লাটের অন্য কোনো উপায় নেই।'...গোপনে যে এত ব্যাপার হয়ে গেছে দেশের লোক তা মোটেই জানতো না। তাদের ধারণা যে কংগ্রেস তার আদর্শ থেকে কিছুতেই বিচ্যুত হবে না এবং দেশ বিভাগের পক্ষে কিছুতেই মত দেবে না—গান্ধাজী ত নয়ই।...সংহতি রক্ষা তলিয়ে গেল সর্বনাশের অতলে। তাঁরা বাধ্য হয়ে করে বসলেন সংহতি সংহারের এক দুঃসাহসিক সূচনা। সেদিনের নেতারা গোপনে ভারত বিভাগ মেনে নিতে বাধ্য হলেন।...গান্ধীজীও কোনো প্রতিবাদ করলেন না।...বৃদ্ধ সাজাহানের মত কোনোখান থেকে তিনি কোনো ভরসা পেলেন না।...মিঃ জিন্না তাঁর অভিলষিত পাকিস্তান, দুজাতি তত্ত্ব ও অনৈক্যের দাবি প্রতিষ্ঠিত করলেন। কংগ্রেস দেশ বিভাগে সম্মত আছে জেনে মিঃ জিন্না পাঞ্জাব ও বাংলার সবটাই পাকিস্তানের জন্য চেয়ে বসলেন।...সেদিন হিন্দু মহাসভা ও শ্রীশরৎচন্দ্র বসু (নেতাজীর অগ্রজ) চেষ্টা না করলে হয়ত সমগ্র পাঞ্জাব ও বাংলা বা তার অধিকাংশটাই পাকিস্তানে চলে যেত।...শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ হয়ে পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম বাংলা ভারতে এল।...

"১৯৪৭ সনের ৪ঠা জুলাই ভারতের স্বাধীনতা বিল হাউস অফ কমন্সে উত্থাপিত হলো।...১৮ই জুলাই সম্রাটের অনুমোদন লাভ করে ১৯৪৭ সনের ভারতের স্বাধীনতা আইন বলবৎ হয়ে গেল।...ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীকে বড়লাট জানিয়েছিলেন যে, তিনি ১৯৪৭ সালেই ১৫ই অগস্টের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর পর্ব শেষ করবেন।...দেশ বিভাগ মেনে নেবার পর দেখা দিল দু'দেশের সীমারেখা নির্ধারণ কমিটির সভাপতি হিসেবে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের (বর্তমানে লর্ড র‍্যাডক্লিফ)

নাম প্রস্তাব করলেন।…তিনি ১৯৪৭ সনের ৮ই জুলাই দিল্লী এলেন। …সেদিন সন্ধ্যায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।… বুঝলেন, দেশ বিভাগ হলে কি করতে হবে এবং দেশকে বাঁচাতে গেলে কি কি প্রয়োজন তার কোনো সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা এদেশের নেতাদের নেই। এঁদের কাছে কর্তৃত্বই বড়, দেশ বা দেশবাসীর সুখসুবিধা নগণ্য…তিনি কাজ শেষ করে ১৫ই অগস্ট ইংলণ্ড রওনা হলেন—পরে দুঃখ করে বলেছিলেন, "অদ্ভুত দেশের লোক, কাণ্ডজ্ঞান হীন— 'Strange chaps. Just didn't do their home work.'।… ধর্মান্ধতার কাঁধে চড়ে রক্ত কলুষিত বীভৎসতার মধ্যে ১৫ই অগস্ট হলো ভারতের স্বাধীনতার সূর্যোদয়। যুদ্ধোত্তর যুগের সভ্যতাভিমানী ইংরেজের কলঙ্ক পশরা মাথায় নিয়ে রয়ে গেল খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষ। নির্বিকার মহাকাল শুধু চেয়ে রইল অনাগত ভবিষ্যতের দিকে…অহল্যার মত শাপমোচনের নিদ্রাহীন প্রতীক্ষায়।" (৩৫)।

১৯৪৭ সালের ১৫ই অগস্ট ত্রিকালজ্ঞ শ্রীঅরবিন্দ বললেন, আঞ্চলিক ব্যবচ্ছেদে বিভক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অঞ্চল বাইরের এবং ভিতরের বহু বিপদের মুখে পড়ে রইল। তাঁর তপোবল অখণ্ড ভারতের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত থাকবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তাঁর সংকল্প "in a great and united future as the destiny of this nation and its peoples" সাধিত হচ্ছে এবং যতদিন না "a free and united India is there and the Mother gathers around her her sons and welds them into a single national strength in the life of a great and united people." (৩৭)। বিশ্বের প্রয়োজনে সমগ্র মানব জাতির কর্ণধার হিসাবে ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত। স্বাধীনতার তাৎপর্য ব্যাখ্যায় শ্রীঅরবিন্দ জাতিকে অভ্যুত্থানের বাণী শোনালেন। ১৯৪৭ সালের ২০শে অগস্ট অমৃতবাজার পত্রিকায় সেই বাণী প্রকাশিত হলো। দেশবাসী জেনে আশ্বস্ত হলো যে, "স্বীয় বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি ব্যতিরেকে ভারত জেগে উঠেছে—পরস্বাপহরণ না করে অথচ জাতীয় সম্প্রসারণ, শক্তি, সমৃদ্ধি

এবং প্রাধান্য বজায় রেখে—ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠা পাবে তার অধ্যাত্ম সম্পদ নিয়ে, বিশ্বের প্রয়োজনে সমগ্র মানবজাতির কর্ণধার হিসাবে"। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "ভারত সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য, সত্যের জয়মাল্য অর্জন করবার জন্য সাধনা করছে এবং যতদিন না অখণ্ড ভারত পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন ধরে করবে কারণ ভারতবর্ষের সত্যরূপ অবিভাজ্য। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার শুভ লগ্নে সত্যদ্রষ্টা পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন ঃ

"১৫ই অগস্ট স্বাধীন ভারতের জন্মদিন। এই দিন ভারতের ইতিহাসে একটি বিগত যুগের অবসান এবং একটি নতুন যুগের সূচনা চিহ্নিত করে। কেবল আমাদের কাছে নয়, সারা এশিয়া তথা বিশ্বের কাছে এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই দিনটিতে অব্যক্ত সম্ভাবনায় ভরা এমনি একটি শক্তি বিশ্বের অন্যান্য শক্তির সঙ্গে গোষ্ঠিবদ্ধ হোলো যা মানব সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক ভবিষ্যৎকে নির্ধারণ করবে। এই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিনটি আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবেও স্মরণীয়—কারণ ১৫ই অগস্ট আমার জন্মদিন, যারা আমার দর্শনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে তারা বৎসরের এই দিনটি উৎসবের মাধ্যমে বিশেষভাবে পালন করে। আমার অধ্যাত্ম-চেতনায় এই দুটি ঘটনার একত্র সমাবেশ নিছক ঘটনাচক্র নয় ; যে দৈব-শক্তি আমার জীবনের গতি নির্দিষ্ট করেছিল সেই শক্তির অমোঘ বিধানে এই সমাবেশ সংঘটিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে স্বপ্ন বা অবাস্তব মনে হলেও, আমার জীবদ্দশায় যে সমস্ত সার্বভৌম আন্দোলনগুলি সফল হবে বলে আশা করেছিলাম আজ অনুভব করছি সেগুলি বাস্তবের স্পর্শ পেয়েছে অথবা রূপায়িত হবার পথে এগিয়ে চলেছে।

"এই পরমলগ্নে আমার বাণী আমন্ত্রণ পেয়েছে কিন্তু আমি—কি বাণী শোনাব। তবে আমার শৈশবে এবং যৌবনে যে লক্ষ্য এবং আদর্শকে উপলব্ধি করেছি, আজ সেগুলি সম্ভাবনার পথে অপেক্ষমান, কারণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পটভূমিকার সঙ্গে ঐগুলি

সংশ্লিষ্ট, ঐ সমস্ত লক্ষ্য এবং আদর্শের মধ্যেই ভারতের ভবিষ্যৎ কর্মসংকল্পের বীজ লুক্কায়িত রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এই বীজের অঙ্কুরোদ্গম্ এবং বিকাশ ভারতকে বিশ্বনেতৃত্বের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কারণ সব সময়েই আমার মনে হয়েছে—ভারত জেগে উঠ্ছে স্বীয় বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি ব্যতিরেকে—পরস্বাপহরণ না করে অথচ জাতীয় সম্প্রসারণ, শক্তি, সমৃদ্ধি এবং প্রাধান্য বজায় রেখে—ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠা পাবে তার অধ্যাত্ম সম্পদ নিয়ে বিশ্বের প্রয়োজনে সমগ্র মানবজাতির কর্ণধার হিসাবে।

"অতীতের উপলব্ধ সেই লক্ষ্য এবং আদর্শ তাদের স্বাভাবিক ক্রমানুসারে বিন্যস্ত ঃ

একটি বিপ্লবের মাধ্যমে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা লাভ পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত এশিয়ার নবজাগরণ এবং মানব সভ্যতার অগ্রগতির জয়যাত্রায় একটি বিরাট ভূমিকাসহ ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। মানবজীবনের একটি বৃহত্তর, উজ্জ্বল, মহিমময় অধ্যায়ের উন্মেষিত ভিত্তিতে গড়ে উঠবে একটি সার্বভৌম ঐক্য—ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন জাতি তাদের স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে একতাবদ্ধ হয়ে থাকবে—একের মধ্যে সার্থক হয়ে উঠবে বহুর প্রকাশ। অধ্যাত্ম-চেতনা এবং জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগ পদ্ধতি বিশ্ববাসীর কাছে ভারতের অবদান হবে। এই অবদান, অভ্যুত্থানের একটি নতুন সোপান হিসাবে বিশ্বমানবের চেতনাকে উন্নততর স্তরে উন্নীত করে জীবনের যে সমস্যাগুলি মানবতাকে সঙ্কটগ্রস্ত, বিপর্যস্ত করে তুলেছে সেগুলির সমাধান করবে, ফলে মানুষের ধ্যানে, জ্ঞানে আত্মশুদ্ধি এবং সমাজশুদ্ধির চেতনা বা সৎ-চেতনার স্ফুরণ হবে।

"খণ্ডিত ভারত স্বাধীন হয়েছে কিন্তু অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা এখনো অসম্পূর্ণ। এক সময় প্রতীয়মান হয়েছিল বুঝি বা ভারতবর্ষের মাটিতে আবার প্রাক্-বৃটিশ যুগের মত আন্তঃরাজ্য কলহের সূচনা হবে। সৌভাগ্যবশতঃ বর্তমান শুভলগ্নের উত্তরকাল ঐ কলহের পুনরাবৃত্তির পরিপন্থা হবে। সংসদীয় বিধান সভার যুক্তিপূর্ণ নীতির

মাধ্যমে দেশের অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলিকে পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে রেখে সমাধান করা সম্ভব হবে। কিন্তু একটি রাজনৈতিক সীমারেখায় বিভক্ত ভারতবর্ষের চিত্রণ জাতায় জীবনে হিন্দু-মুসলমানের সেই পুরাতন সাম্প্রদায়িক বিরোধকে ক্রমশঃ সুদৃঢ় করে তুলছে। আশা করা যায় যে কংগ্রেস এবং দেশবাসী এই দেশ বিভাগকে চিরস্থায়ী হিসাবে গ্রহণ না-করে একটি অস্থায়ী সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করবেন। কারণ ইহা চিরস্থায়ী হলে ভারতবর্ষ শুধু দুর্বল নয়, পঙ্গু হয়ে পড়বে, গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা সব সময়েই থাক্‌বে এমন-কি বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা বিদেশী শক্তির নিকট পরাজয়ের সম্ভাবনাও যথেষ্ট থাকবে।

"সমবেত চেষ্টার নিয়ত চিন্তা এবং শান্তি ও সহাবস্থানের উন্নত-সম্পর্কের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনা প্রশমিত করে খণ্ডিত ভারতের অস্তিত্ব লুপ্ত করতে হবে। এই পথেই অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনা মূর্ত হবে। লক্ষ্যে উপনীত হওয়াই মূলতঃ প্রয়োজন, সুতরাং মত বা পথের ব্যবহারিক মূল্য বিচার্য হলেও এগুলির মৌলিক গুরুত্ব কিছুই নেই। যে কোনো উপায়েই হোক্, একটি ভূখণ্ডের এই চিত্রিত বিভেদ দূর হবেই হবে। কারণ ইহার ব্যতিক্রম ঘটলে ভারত পথভ্রষ্ট হবে, নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হবে। কিন্তু ইহা বিধিলিপি নয় বা হতে পারে না।

"এশিয়ার জাগরণ হয়েছে এবং এই মহাদেশের অধিকাংশ আজ পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত এবং কিছু অংশে এখনো চলেছে স্বাধীনতার সংগ্রাম। কর্তব্য কর্মের অল্পই বাকী আছে এবং সেই কর্তব্য সম্পাদনের সুযোগ যে মুহূর্তে আসবে সেই মুহূর্তেই শেষ করতে হবে। এই কর্তব্য সম্পাদনে ভারত বিশিষ্ট ভূমিকা নেবে—বিপুল প্রাণশক্তি এবং সামর্থ্য নিয়ে সে তার পারদর্শিতার পরিচয় দেবে 'জাতিসংঘের' অন্যতম সদস্য হিসাবে।

'মানবজাতির একাত্মবোধ স্ফুরণের পথে, যদিও ইহা একটি সংস্কার-সাপেক্ষ প্রস্তুতিমাত্র, সুসংবাদ হলেও ইহা পর্বত প্রমাণ বাধা-বিপত্তি কবলিত। কিন্তু এ কথা স্বীকার্য যে শক্তির স্ফুরণ

হয়েছে, জোয়ার এসেছে। ইতিহাসের অতীত ঘটনা ইঙ্গিত দেয় শক্তি পুঞ্জীভূতা হবে—অভিষ্ট সাধনে। এই আন্দোলনেও ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এবং যদি সে দিব্য-দৃষ্টি প্রভাবে ভবিষ্যৎ বুঝে, বর্তমান ঘটনাস্রোতে বিহ্বল না হয়ে, বৃহত্তর নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হয়, তবেই তার দ্বারা শৈথিল্য এবং দৌর্বল্যকে সরিয়ে দ্রুত শ্রীবৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। হয়তো কোনো দুর্যোগ বা সঙ্কট ঐ সম্ভাবনাকে ব্যাহত বা বিনষ্ট করিতে পারে—তা করুক—কিন্তু এই জন্য আভিষ্ট সাধন বিঘ্নিত হবে না। কারণ একাত্মবোধের আন্দোলন প্রাকৃতিক লীলার নিরবচ্ছিন্নতার পক্ষে প্রয়োজন, এই আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী, ইহার নিশ্চিত সাফল্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে। বিভিন্ন জাতির পক্ষে এই একাত্মবোধের প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট, কারণ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বাধীনতাকে উপেক্ষা করে বৃহৎ এবং শক্তিশালী গোষ্ঠী নিরাপদ হতে পারে না। ভারতবর্ষ যদি সাম্প্রদায়িকতার চক্রান্তে খণ্ডিত থাকে তবে তার নিরাপত্তাও রাহুমুক্ত হবে না। সুতরাং বৃহত্তর স্বার্থের জন্যই অখণ্ডতা প্রয়োজন। মানুষের নির্বুদ্ধিতা এবং স্বার্থান্ধতা কেবলমাত্র ইহার বিরোধিতা করতে পারে। বিধাতার অনভিপ্রেত কোনো পরিণতি ঘটাবার সম্ভাবনা থাকলেও প্রকৃতির প্রয়োজনে এবং দিব্য-ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই অবাঞ্ছনীয় পরিণতি স্থায়ী হতে পারে না।

"জাতীয়তাবাদ আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু আন্তর্জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে হবে, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানেরও প্রয়োজন আছে। এমন কি দুইটি বা ততোধিক নাগরিকত্ব গ্রহণের সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করতে হবে যার মাধ্যমে ভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ স্বাভাবিক উপায়ে সম্ভব হতে পারে। জাতীয়তাবাদের উগ্রতা হ্রাস পেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহাবস্থান সম্ভব হবে এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে একাত্মবোধ জাগ্রত হবে।

"ভারত ইতিমধ্যে তার আধ্যাত্মিক সম্পদ বিশ্বের সর্বত্র বিতরণ

শুরু করেছে। আধ্যাত্মিক পথে সে ইউরোপ এবং আমেরিকার গভীরে প্রবেশ করেছে। এই আন্দোলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে। কালচক্রের অশান্ত ঘূর্ণিপাকে ক্লিষ্ট, নিপীড়িতের দল ক্রমশঃ ভারতের দিকে অনেক আশা নিয়ে আকৃষ্ট হচ্ছে, কেবলমাত্র ভারতের দর্শন এবং দিব্য-বাণীর আশ্রয়ে নয়, তার মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার উপর ক্রমেই এদের আস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

"অবশেষে, আমার ব্যক্তিগত আশা, ধারণা এবং আদর্শ অনুযায়ী ভারত এবং পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল মানুষ সংবদ্ধ হতে শুরু করেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় এক্ষেত্রে অসুবিধা দুস্তর হলেও সেগুলিকে অতিক্রম করতে হবে এবং সেই 'পরাৎপর ঈক্ষা' প্রভাবে ঐ সমস্ত অসুবিধা অতিক্রান্ত হবে। এক্ষেত্রেও, যদি অভ্যুদয় ঘটে আত্মিক এবং চৈতন্যময় কোষের স্ফুরণের ফলে—তবে সেই উদ্দীপনা আসবে ভারতবর্ষ থেকেই ; যদিও এই সনাতন শক্তি কারো কুক্ষিগত নয় তবুও এই আন্দোলনের সূত্রপাত ভারতবর্ষেই হবে।

"ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার দিনে আমার এইটুকুই বক্তব্য। আমার বক্তব্য কবে মূর্ত হয়ে উঠবে অথবা আদৌ হবে কিনা—তার সবটুকু নির্ভর করছে এই নতুন এবং স্বাধীন ভারতের উপর।" (৩৮)।

ইতিমধ্যে প্রজ্ঞাসুন্দর শ্রীঅরবিন্দের শ্রীহস্তপ্রসূত বেদান্ত-ভাষ্য 'দিব্য জীবন' ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ বিশ্বের সর্বত্র বিতরণ শুরু করেছে। পাশ্চাত্যের বহু জ্ঞানতপস্বী স-সম্ভ্রমে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক রাজসূয় যজ্ঞের দিব্যশক্তিস্নাত যজ্ঞাশ্ব 'দিব্য জীবন'কে। আধ্যাত্মিক পথে ভারত প্রবেশ করছে দিগ্‌বিজয়ীর মতো ইউরোপ ও আমেরিকার হৃদয়ের গভীরে, এক অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে, যেখানে তাদের আত্মার পরমাত্মীয়কে তারা অজ্ঞানতাবশত বন্দী করে রেখেছে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পরাগতির দূত অবধ্য সুতরাং বিনা বাধায় সে প্রবেশ করছে বিশ্বমুক্তির বার্তা নিয়ে তাদের হৃদয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সংস্কৃত করতে। 'দিব্য জীবন' সেই পথেই এগিয়ে

চলেছে যে পথের নক্সা সর্বপ্রথম এঁকে গিয়েছিলেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের তপোবলের ধারক ও বাহক স্বামী বিবেকানন্দ ; যাঁর উদাত্ত কণ্ঠে পশ্চিমের আকাশে-বাতাসে ভরে উঠেছিল ভারতের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সার্বভৌমত্ব। তাঁর কাছে সর্ব প্রথম পাশ্চাত্যের জ্ঞান-তপস্বীরা শুনেছিল যে ভারতীয়েরা তাদের সভ্যতার বেদপর্ব থেকেই জানে—সমগ্র বিশ্ববাসী তাদের আত্মার আত্মীয়, তাদের ভাই। তারা জানে—বিশ্বের প্রত্যেকেই সেই অমৃতময়ের সন্তান হিসাবে মুক্তি-পথযাত্রী। সেই মুক্তি-পথের পথ প্রদর্শক ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষই বিশ্বমুক্তি যজ্ঞের পুরোহিত।

১৯৪৭ সালে পণ্ডিচেরী আশ্রমে এলেন আমেরিকার কর্ণেল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক বার্ট। ভারতের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে 'দিব্য জীবন'কে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠচক্রের তালিকাভুক্ত করলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যক্ষ পি. এ. সোরোকিন শ্রীঅরবিন্দের দর্শন সম্পর্কে অবহিত হয়ে বললেন যে বর্তমান সময়ে ব্যক্তিমানসের আদর্শ বিন্যাসের জন্য 'দিব্য জীবন' একটি অপরিহার্য পাঠ্য। সাইরেকাস বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের আচার্য, ডক্টর পাইপার শ্রীঅরবিন্দের মনীষাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের মধ্যে লুক্কায়িত ব্রহ্ম বিজ্ঞানের অনন্য সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতার কথা লিখলেন তাঁর The Hungry Eye গ্রন্থে। ইংলণ্ডেও প্রতিধ্বনিত হোলো এক সুর—ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। মনীষী রেভারেণ্ড হিল সাহেবের ভাষায় শ্রীঅরবিন্দ হলেন, "the living embodiment of all the past spiritual achievement of India and also the Master-Leader of her future spiritual destiny."। তিনি লিখলেন, "Because Aurobindo is in this world, the world is becoming able to express progressively Unity in Diversity instead of Division, Love instead of Hatred, Truth-consciousness instead of Falsehood, Freedom

instead of Tyranny, Immortality instead of Death ; it is becoming progressively that which it is : a movement of the Spirit in itself." (৩৯)। বৃটিশ বুক নিউজ বিংশ শতাব্দীর ব্রহ্ম বিজ্ঞানের ভাষ্যকার শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে লিখলে—"Aurobindo promises to outshine all the latter-day prophets."। এইভাবে নির্মাণমুক্তির ঋত্বিক ভারতবর্ষের সনাতন বাণীকে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের হৃদয়ে প্রবেশ করালেন তাঁর প্রজ্ঞার বিকিরণে। শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের উপর গবেষণা করে সর্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী পেলেন হরিদাস চৌধুরী। ১৯৪৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীঅরবিন্দকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিলেন সুবিদিত 'কাট্টামাঞ্চি রামলিঙ্গ জাতীয়-পুরস্কার' নিবেদন করে।

১৯৪৯ সালে 'দিব্য জীবন' গ্রন্থের (The Life Divine) প্রাণ-পুরুষকে চাক্ষুষ দেখার জন্যে ক্যালিফোর্নিয়ার স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পণ্ডিচেরীতে এসে পৌঁছলেন ডক্টর ফ্রেড্‌রিক স্পীজেলবার্গ। এই সময়ে ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে পণ্ডিচেরী আশ্রম সম্পর্কে বিশ্বের কৌতূহল প্রকাশিত হোলো। সবাই জানতে চায়, আসতে চায় বিশ্ববাসীর এই অনন্য পীঠস্থানে। ১৯৪৯ সালের ২৪শে এপ্রিল —দর্শনের পবিত্র দিন এগিয়ে এলো। শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দকে দেখলেন সমাগত ব্রহ্মবন্ধুরা। ঐ সময়ে বিদেশী অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত ফরাসী আলোকচিত্র শিল্পী হেনরি কার্টিয়ার ব্রেসন। তিনি এক অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব করলেন—যা আশ্রমে নিষিদ্ধ ছিল—দর্শনের সময়ে তিনি শিব ও শক্তির দুই প্রতিমূর্তিকে আলোকচিত্রে ধরে রাখবেন। বিগত চল্লিশ বছরের প্রথা অনুযায়ী সবাই জানত যে এই প্রস্তাব প্রত্যাখাত হবে। কিন্তু সবাইকে বিস্মিত করে প্রস্তাব সর্বজ্ঞের অনুমোদন লাভ করল। বিস্মিত হলেও কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে এই আলোকচিত্র গ্রহণ প্রথম এবং শেষ—আগামী বছরের এই দিনে আশ্রমের প্রাণপুরুষ আলোকচিত্রের সীমিত গণ্ডির বাইরে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি পর্বে ব্যস্ত থাকবেন। ঐ বছরের

বিজয়া দশমীর দিনে শ্রীমার বাণীতে এই প্রস্তুতি পর্বের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল : "It is the devil of depression and despondency that we shall slay to-night—so that all those who have the sincere will to get rid of this disease will receive the necessary help to conquer."—'depr ession' আর 'despondency' এই দুটি অসুর যে আশ্রমবাসীদের এবং শিষ্যভক্তদের খুব শীঘ্র আক্রমণ বা আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা করবে সেদিন কেউই কল্পনা করেনি।

১৯৫০ সাল। পৃথিবীর সব দেশের জ্ঞান তপস্বীরা ভারতের বিজ্ঞানময় পুরুষের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছেন। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্যে শ্রীঅরবিন্দের নাম প্রস্তাব করলেন সুইডেনের নোবেল পুরস্কার কমিটির কাছে চিলির নোবেল-লরিয়েট গ্যাব্রিয়েল মিস্ত্রাল। প্রস্তাবটি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে পাঠালেন আমেরিকার নোবেল-লরিয়েট পার্ল বাক্। প্রস্তাবটি নির্দ্বিধায় গ্রহণীয় বলে সারা ভারত একবাক্যে সমর্থন-পত্র পাঠাল। কিন্তু বিজ্ঞানময় পুরুষ তখন প্রারব্ধ কর্মের শেষ পর্বে এসে নিরাকার জ্যোতির্লোকের পথে যাত্রার প্রস্তুতি কর্মে নিমগ্ন। যেখান থেকে তিনি পৃথিবীর অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রাণশক্তিকে মুক্ত করে, জাগ্রত করে মহাপ্রাণের মধ্যে লীন করে দেবার চেষ্টা করবেন—যে প্রচেষ্টার সাফল্য পর্বের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে রয়েছে বিশ্ববাসীর দেবজাতিতে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা, মর্ত্যলোকের স্বর্গলোকে রূপান্তর হওয়ার সম্ভাবনা। যেখান থেকে মানুষের মনে পরা-চেতনার আলোর স্পর্শ এনে মানুষকে তিনি দেবভাবে আনতে পারবেন। তিনি অমৃতের আস্বাদ পাবার পরে তৃপ্ত হননি, তাই জ্যোতির্লোক থেকে তিনি বিশ্বমানবকে অমৃতের আস্বাদ দেবার কাজ করে যাবেন যাতে পৃথিবীর মানুষ যোগ্যতা অনুযায়ী নিজেদের অমৃতের সন্তান বলে বুঝতে পারে।

স্রষ্টার সঙ্গে একাত্মবোধে সৃষ্টির লীলা বৈচিত্র্যের মূল সূত্রটি উপলব্ধি করেছিলেন বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানময় পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ। বিধিলিপির প্রতক্ষ্যদ্রষ্টা হিসাবে তিনি বুঝেছিলেন যে নির্মাণমুক্তি-

কামী স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের প্রদর্শিত পথ অনুসরণে ব্রহ্ম-ক্ষুধাকে জাগ্রত, প্রজ্জ্বলিত এবং পরিতৃপ্ত করে আগামী দিনের মানুষ দেবত্ব অর্জন করতে পারে। বিংশ শতাব্দীর মানুষ ধ্যানশক্তির অধিকারী সুতরাং ধ্যানের পথে তারা শরীর থেকে উর্ধ্বতন সূক্ষ্ম কোনো কিছুর দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম ; এই অগ্রগতি বা উর্ধ্বগতি মানুষকে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এনে দেবে। কিভাবে উর্ধ্বগতি হবে সে পথ দেখাবার জন্যেই তো নির্মাণমুক্তিকামী স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। শান্ত, সমাহিত, অব্যক্ত, নির্গুণ পরা-চেতনা স্বতঃস্ফূর্ত, আলোড়িত হোলো। এই আলোড়িত চেতনাতেই জন্ম নিলে স্বতঃআলোড়নশীল পরমাণু। গড়ে উঠল অনু। সৃষ্টি হোলো গতিশীল। পৃথিবী মূর্ত হোলো—উদ্ভব হোলো জড় এবং জীব। সৃষ্টির আদি লীলায় পরা-চেতনা স্বেচ্ছায় বন্দী হলেন। এই বন্দী হওয়ার মধ্যেই সুপ্ত হয়ে রইল সৃষ্টির পরাচেতনায় প্রত্যাবর্তনের অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনা। পরা-চেতনা ব্যক্ত হলেন, মূর্ত হোলো প্রকৃতি। প্রকৃতির রহস্যময় লীলার মাঝেই লুকিয়ে রইল বিধিনির্দিষ্ট মুক্তির নিয়তি। সেই পথে সৃষ্টি পরিক্রমারত বিবর্তনের ছন্দে। ক্রমবিবর্তনের ফলে যা কিছু অবাঞ্ছিত তা চলে যাচ্ছে বা চিরতরে লুপ্ত হচ্ছে এবং যা কিছু বাঞ্ছিত তা থেকে যাচ্ছে ; উন্নীত হচ্ছে, অগ্রগতি পাচ্ছে সেই চিরবাঞ্ছিত ও বিধিনির্দিষ্ট মুক্তির পথে। বিবর্তনের পথেই মানুষ এসেছে। মানুষের মধ্যে ব্রহ্ম-ক্ষুধা এসেছে। মানুষের মধ্যে সেই ক্ষুধা প্রজ্জ্বলিত করার স্পৃহা এসেছে। মানুষের মধ্যেই জন্ম নিয়েছেন সেই ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করবার পদ্ধতি যাঁরা দেখাবেন তাঁরা। তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেই মানুষ এগিয়ে যাবে ধারণার সীমা অতিক্রম করে অধিমানসে, অতি-মানসের গভীরে। যেখানে যাবার সময়েই বিবর্তনের গণ্ডিকে সে অতিক্রম করবে, তার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হবে ; বিবর্তনের গণ্ডি ছাড়িয়ে নিবর্তনের রাজ্যে গিয়ে সে অজ্ঞ থেকে সর্বজ্ঞ হয়ে উঠবে এবং মুক্ত পুরুষ হিসাবে সে লীন হয়ে যাবে সেই সৎ-চিৎ-আনন্দময় পরা-চেতনায়—যেখান থেকে কোন এক অতীত মুহূর্তে তার জীবনের

যাত্রা শুরু হয়েছিল। "মনে হয় আমরা নিবর্তন-বিবর্তনের হাইপার-বোলিক বাঁকের সঙ্কীর্ণতম মোহনায় এসে পড়েছি প্রায়, এবং আকস্মিকভাবেই, মোড় ঘোরামাত্র, উর্ধ্ব পানে উঠে চলব অপ্রতিহত দ্রুতগতিতে।...বিংশ শতকেই সর্বপ্রথম মানুষ উপলব্ধি করল বিবর্তনের ভবিষ্যৎ এক নূতনতর পর্যায়ের আবশ্যকতা; এবং তা-ই আমাদের চেতনার ও সঙ্কল্পের একনিষ্ঠ উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে আজ। ইতিপূর্বে আর কখনো প্রকৃতিকে তার নিজের পদক্ষেপ সম্বন্ধে এভাবে ভাববার সুযোগ দেওয়া হয়নি, এবং নিজের অন্তর্নিহিত এই সুদিব্য পরিণতির দিকে ত্বরান্বিত গতিতে অগ্রসর হবার অবকাশও সে পায়নি। প্রকৃতির উর্ধ্বমুখী এই অভিযান সম্পর্কে আমরা যে ভাবতে শিখেছি এবং আমাদের মনেও পাচ্ছি তারই সমর্থনে তীব্র এক আস্পৃহা, এবং তার সহযোগিতা করবার সুযোগও—এ-ই তো স্পষ্ট লক্ষণ যে আমরা বিবর্তনের পথে যথেষ্ট নিবর্তিত হয়েছি অনেক বেশি শক্তিশালী এবং দ্রুততর পদক্ষেপে, ইতিহাসে এই প্রথম। কাজেই এই প্রক্রিয়ার সিদ্ধি আসতে যে শত-শত বছর লেগে যাবে না, তা নিশ্চিত। এমন কি, কে জানে, হয়তো বা রূপান্তরিত সেই জ্যোতির্ময় মানবের সূচনা আমাদের মধ্যে ইতিপূর্বেই সম্ভব হয়েছে?...অনেকেই বিশ্বাস করেন, শ্রীঅরবিন্দই স্বয়ং পরমজ্ঞানের জ্যোতির্ময় সেই মহামানবদের প্রথম জন, তাঁর পণ্ডিচেরী আশ্রম এক গবেষণাগার যেখানে অতিমানবের বিবর্তন চলেছে।... শ্রীঅরবিন্দ কোনদিন বলেননি যে সমগ্র মানবতাই হঠাৎ করে একদিন রূপান্তরিত হয়ে যাবে সেই জ্যোতির্ময় মানবতায়। সমস্ত পরমাণুই কি 'ইন্‌ফিউজোরিয়াল প্লান্টে' পরিণত হয়, না সমস্ত বানরই মানুষে? তেমনি, সব মানুষই হতে পারবে না অতিমানব। মানুষ থাকবেই, এবং তারাই পরবর্তী জীবজাতির প্রতিভূরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে।" (১৯)।

"...দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে বিরাট সাধনার সূত্রপাত করেছিলেন, বিবেকানন্দের পর, শ্রীঅরবিন্দই তার পরিপূর্ণ সম্ভাবনাকে

প্রকট করে গেলেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে মানব সাধনার চরম সংকটের লগ্নে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মানব সভ্যতার গতির যে পথ নির্দেশ করে গেলেন, তাঁর প্রিয়তম শিষ্য সেই পথ অনুসরণ করে সেই আদর্শকেই বিশ্বমানবের চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট করে দিয়ে গেলেন, বিবেকানন্দের সেই অসমাপ্ত কাজকেই সম্পূর্ণ করে গেলেন শ্রীঅরবিন্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ থেকে আরম্ভ করে বিবেকানন্দ—শ্রীঅরবিন্দের জীবনে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা বিশেষ অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করলো। ভারতের ইতিহাসের মধ্যে মানবতার চরম অভিব্যক্তির যে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিল, এই তিন জন মহাপুরুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতায় তা অখণ্ডভাবে পরিপূরিত হয়েছে। বাইরের হীনবল অসহায় ভারতবর্ষের বাস্তবতার আড়ালে যে অবিনাশী শাশ্বত ভারতবর্ষ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, ভারত ধর্মতত্ত্বের ত্রিমূর্তির মত এই তিনজন মহাপুরুষ সেই শাশ্বত ভারতবর্ষকে আবার বিশ্বচেতনার মানচিত্রে চিরদীপ্যমান করে দিয়ে গেলেন। এবং একদিন সমগ্র জগৎকে যে ভারতবর্ষের কাছে মাথা নত করে আসতে হবে, আমাদের চরম সৌভাগ্য, আমাদের চোখের সামনে দেখলাম, শ্রীঅরবিন্দের জীবনে সেই অমর ভারতবর্ষের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্রবাণীতে শুনলাম, সেই ভারত-যজ্ঞে বিশ্বমানবের আমন্ত্রণ-লিপি—বেদে-উপনিষদে ছিল ভারত-ঋষির অমৃতত্বের যে প্রতিশ্রুতি, শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবনে পেলাম তার পরিপূর্তি···ভারতবর্ষের যে যোগবিজ্ঞান সাধনহীনতার অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, শ্রীঅরবিন্দের অপরূপ মানবীয় সাধনায় দিয়ে গেলেন তাকে দিব্যজ্ঞানের মর্যাদা, তপস্যায় উত্তীর্ণ হলেন মানবীয় ক্রমবিবর্তনের অনিবার্য পরবর্তী স্তরে···মনের উর্ধ্বে অতিমানস-লোকে···এবং সেই অতিমানসের বিচ্ছুরিত আলোর ইঙ্গিত দৈব-অনায়াসে রচনা করে গেলেন, মানব মনের মহাকাব্য 'সাবিত্রী' ···মনের উর্ধ্বে সেই অতিমানসের আলোকে লেখা অপরূপ মহাকাব্য।" (৪০)

১৯৫০ সালের ১৫ই অগস্ট চলে গেল। শ্রীঅরবিন্দ হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'সাবিত্রী' মহাকাব্য শেষ করতে হবে। দেহে ব্যাধির প্রাধান্য প্রকাশ পাবার চেষ্টা করছে কিন্তু যোগীশ্বরের উপেক্ষা ব্যাধিকে সংযত করে রেখেছে। 'সাবিত্রী'-র তুটি সর্গ তখনো বাকী— 'The Book of Fate' এবং 'The Book of Death'। উনি বলে যান এবং ডাক্তার নীরদবরণ শ্রুতিলেখকের কাজ করেন। গুরুদেব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের 'Book of Fate' রচনা শেষ করবার জন্যে। এই ব্যস্ততার মধ্যে কিসের ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল তা সঠিক কেউই বুঝতে পারেনি—অবশ্য শ্রীমার কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ মানুষ দিব্য-দৃষ্টির অভাবে যে অনন্ত জিজ্ঞাসা বুকে নিয়ে জন্ম-জন্মান্তর ধরে এগিয়ে চলে তার অভ্রান্ত উত্তর থাকবে এই রচনার মধ্যে। দেবী সরস্বতী গুরুদেবের জিহ্বাগ্রে আশ্রয় নিলেন— অলকানন্দার মত প্রবাহিত হতে থাকল কাব্যস্রোত। সেই মহাকাব্য রূপান্তরণের ধৃষ্টতা না করে সেই দিব্যবাণীর ছায়াশ্রয়ে কয়েকটি ছত্র লেখা হোলো।—

অভ্যুত্থান।
মানুষের মনে—
জ্যোতিধারা স্নানে—
দিব্যভাব,—সুপ্ত, অর্ধ-বিকশিত—
হবে প্রস্ফুটিত।
হবে মুক্ত গুহাদ্বার—হৃদয়ের—
জাগে পদধ্বনি—দিব্য-জীবনের।
মহাদ্যুতি বিকিরণে,
সঞ্জীবন প্রাণে প্রাণে।
প্রজ্ঞার বোধনে হবে নব জাগরণ।
দীর্ণ তমো-আবরণ—নামে প্রজ্ঞার প্লাবন।

* * *

রিপু-ভস্মে শুভ্রদেহ অমৃত-সন্তান—

অঙ্গে সাম্য-সজ্জা, হাতে একতা-নিশান—
সেই মৌন দিব্য-যন্ত্র,
জপে পরা-মন্ত্র,—
'মুমুক্ষু জীবের মুক্তি, বিশ্বের কল্যাণ'—
কামনা-বিহীন কর্মে আত্ম-বলিদান।

* * *

নারায়ণ—স্থাবরে-জঙ্গমে বন্দী।
পরম-ব্রাহ্মণ—ঈক্ষা-চক্রে,
প্রকাশে সগুণ।
বিবর্তনে ব্যক্ত বিভু।
দিব্য-লীলা—
অস্তে যাবে অন্তকালে।
পরা-ব্রহ্মে পূর্ণ লীন—নিবর্তনে,
কল্প-অন্তে—প্রতি-আবর্তনে।

* * *

কার ইন্দ্রজালে—
বিশ্ব-বিবর্তন উর্ধ্বপথে চলে?
ধরাধামে, স্বর্গের সুষমা নামে?
ধূসর-ধরণী শোভে, অপরূপ-শুভ্র-সাজে?
ভরে মধুগন্ধ—অণু-পরমাণু-মাঝে?
দিব্য-রেণু স্পর্শে, দিব্য-শিহরণে
এ কোন প্রস্তুতি আসে প্রকৃতির প্রাণে?
আসন্ন বুঝি বা—সেই শুভক্ষণ —
যবে বিধি-বরে মূর্ত হবে অভীষ্ট রতন—
সৎ-এর চেতনা ভরা সে দিব্য-জীবন।

* * *

ভূমার কল্যাণে নামে কল্যাণ-সুন্দর—
জ্যোতির্ময়, প্রেমময়, শান্তির নির্ঝর।

সাজে পরা-কন্যা—
সগুণ-প্রকৃতি—আলোর কিরীটে,
আলোর বাহনে চড়ি' যায় ঊর্ধ্ববাটে।
জগতের চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিকিরিত
—পরা-তেজ—
প্রাণেতে প্রাণেতে,
অণুতে অণুতে যেন শুভ্র-উপবীত।
অনন্য সজ্জায় বিশ্ব সাজে।
মূর্ত বুঝি নন্দন-কানন,
ধরণীর বৈকুণ্ঠের মাঝে।

* * *

ভ্রান্ত-প্রগতির পথ ছাড়ি
ব্যক্ত-চরাচর ব্যস্ত তাই জানাতে প্রণাম—
অবিজ্ঞাত আণমায়—
অদ্বিতীয়ে—
সেই তৎ-সৎ-এ।
স্থাবরে-জঙ্গমে ঘেরি' দিব্য-প্রতিচ্ছবি,
আনন্দ করুণা, ঘেরা অপূর্ব প্রগতি।

* * *

জাগে সগুণ প্রকৃতি।
তৃপ্তির জোয়ার আসে মনে—
ব্রহ্মক্ষুধা উপসম —প্রাণে।
নিষ্প্রাণের মাঝে, প্রাণের স্পন্দনে—
শত শত অহল্যারা জাগে—
চলে অনন্তের টানে—
সাযুজ্য-সন্ধানে।
ছিন্ন মায়া আচ্ছাদন-
বিবস্ত্রা পৃথিবী।

নাশি মোহ-আবরণ—
বিজ্ঞাত মানব।
নাহি অন্য ধ্বনি—
সোহং শুশ্রুত।
কোথা ভিন্ন প্রাণী—
সবই অরূপ প্রসূত।
ব্রহ্মময় রূপ—
আত্মার দর্পণে
দিব্য দরশন।
সমাধিতে মুক্তি আস্বাদন।

* * *

মনোভূমি হতে উর্ধ্বে—
বিকশিত পারিজাতে—
অধিমানসের দিব্যমঞ্চে—
কাঁদে আত্মার অদৃশ্য দূত।
যেন ভগীরথ—
মূর্তিমান নীরব আকুতি—
কাঁদে কার পদ চুমি।
'দাও সাড়া'—হে সৎ-চেতনা,
অমৃত আধার।
ওগো পরম করুণা—
সাড়া দাও, সাড়া দাও
জীবনের পণে।
কোন উর্ধ্বলোক হতে নামে
মহাস্রোত। নামে
অতিমানসের আলো—
অধিমানসের দিব্যমঞ্চে।
আলোর জোয়ারে হোলো

পরম-সম্ভব। ভগীরথ অর্ঘ্য দিল—
মনোভূমি সিক্ত হোলো—তমসার অবসান
জ্যোতিস্নানে।

* * *

প্রজ্ঞার নির্ঝর নামে —
ব্রহ্মাণ্ডের উৎস হতে—
ধরণীর বুকে, মানবের মনে—
স্থাবরে-জঙ্গমে—
প্রকৃতির মুক্তিস্নান লাগি।
নির্মলা প্রকৃতি হাসে
সংবর্ধিতে নবীন জীবন।
জ্যোতি বিকিরণে—
অবিদ্যার নিশি-অবসানে—
আসিবে নতুন উষা—
সত্যযুগে করিতে বরণ
একাত্মের সুরে গাওয়া
অযুত আত্মার গানে—
হবে সমবেত দেব সংঘে—
পৃথিবীর অমৃত-নন্দন।
কোষে কোষে,
তন্তুতে তন্তুতে,
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
করণে ভাষণে—
প্রবাহিবে দিব্যশক্তি—
দিব্য-শিহরণ।
মূর্ত হবে দিব্য-বরে বরীয়ান
সে দিব্য জীবন।

* * *

পরা আকর্ষণে মুক্ত হবে দিব্যশক্তি—
ধরাধাম হতে।
অধোমুখী বিশ্ববিবর্তন হবে উর্ধ্বমুখী—
হতে লীন অমৃত-সঙ্গমে—
মহা উত্তরণে। যাবে অস্তাচলে—
দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, ভেদ নানাত্বের বিচিত্র-বিন্যাস—
যত কিছু দিব্য পরিহাস।
সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর—সত্য-শক্তি—
বিজ্ঞান-ভাস্কর, আনন্দ-আকর।
সেই এক পিতৃ-পরিচয়, দীপ্ত রবে ধ্রুবতারা সম
—'সেই এক', 'সেই তৎ-সৎ'—ক্রম-বিবর্তনে।

* * *

অবতরণ। বিশ্বের মুক্তির তরে—
নরে নারায়ণ।
বিধাতা-লিখন—
ঘুচাইতে মোহ-অন্ধকার নামে অবতার।
শিখাইতে ব্রহ্মের বিজ্ঞান আসে সত্যবান।
আত্মায় আত্মায় জাগরণ—
সেই দিব্য-উত্তরণ।
পাঞ্চজন্যে আসে আমন্ত্রণ।
'উঠ, জাগ, মুক্ত কর'—
সুপ্ত যাহা আছে অন্তঃপুরে।
শোন ধ্বনি, অন্তরে তোমার—
তোমারি কল্যাণে কাঁদে—তোমারি হৃদয়ে বন্দী—
সেই সৎ-চিৎ, সেই আনন্দ-আধার।
মুক্ত করি—যেতে দাও তারে অনন্তের পানে।
করো আত্ম দরশন।

* * *

কোটি জীবনের মাঝে,
অণুতে অণুতে বন্দী—সতের চেতনা।
মুক্ত করো তারে—ওহে মুক্ত কচ্ছ,
নির্বাণেরে করি তুচ্ছ—
নির্মাণের হও অধিকারী—বিধাতার বরে।
বিশ্বজনে করি নিরঞ্জন—
দিব্য-কর্ম কর সম্পাদন।
সুপ্ত দেব-ভাব ব্যক্ত হোক—নীতি-আচরণে।
অনেকের দলে, কিছু পাক্ ঊর্ধ্বগতি—
কিছু রহস্যের সমাধান —
মূহূর্তের জ্যোতিঃস্নানে।
মধুভাবে মউ-মউ মনোবন—
নিসর্গ-দ্যোতনা মাঝে, জীবনের মহা-উত্তরণ।

* * *

ঊষার বোধন। নব সূর্যোদয়ে—
চেতনার স্তরে স্তরে—জ্যোতির পরশে—
হৃদয়ের অরবিন্দ মেলে দল—দিব্য-জাগরণ।
জ্যোতির্ময় নামে—ভূমার কল্যাণে।
তরঙ্গের সমুত্থান—
স্থাবরে-জঙ্গমে, অণু-পরমাণু মাঝে—
এ কোন প্রগতি! কোন ঊর্ধ্ব অভিযান—
কোন নিয়তি-লিখনে!
কর্মযোগী, ধর্মব্রতী, প্রজ্ঞাবান দেবজাতি
—সব নারায়ণ।
জাগে সুপ্ত ভগবান।
দেব-সংঘে কর্মরত অমৃত-সন্তান।
নিসর্গ সৌন্দর্যে ভরা—
অপরূপ মধুক্ষরা—সে দিব্য জীবন।

"রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তম্ সংজ্ঞকে—"
হবে প্রতি আবর্তন—
কল্পান্তের কালে—নিয়তি লিখন।

সাবিত্রী মহাকাব্যের সর্গ ছুটি শেষ হলো। পরিতৃপ্তির হাসি হাসলেন মহাপুরুষ। ডাক্তার নীরদবরণ প্রশ্ন করলেন, "Book of Death and Epilogue" এই ছুটি যে লেখা বাকি রয়েছে? "Oh that? We shall see about it afterwords"—উত্তর দিলেন, প্রসন্ন হেসে শ্রীঅরবিন্দ। নভেম্বর মাস পড়ল। শীতের সঙ্গে দেহযন্ত্রের বৈকল্য ধীরে ধীরে আশ্রমবাসীদের চিন্তিত করে তুলল। দেখতে দেখতে এসে পড়ল নভেম্বর মাসের দর্শনের দিন। কলকাতা থেকে এলেন বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক সত্যব্রত সেন পণ্ডিচেরীতে। গুরুদেবকে পরীক্ষা করে বললেন, "Prostatic enlargement" সুতরাং অপারেশন প্রয়োজন। নিদেনপক্ষে, Catheter দেওয়া যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সর্বজ্ঞ পুরুষ মত দিলেন না। রোগের প্রকোপ আসা-যাওয়া করতে লাগল। দর্শনের দিন অসুস্থতা সত্ত্বেও গুরুদেব ভক্তদের বিমুখ করলেন না। দর্শনও শেষ হলো সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল রোগের খারাপ লক্ষণগুলো। ২৯শে নভেম্বর কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক প্রভাত সান্যাল পণ্ডিচেরী থেকে টেলিগ্রাম পেলেন—"Fly Urgent, Mother."। ৩০শে নভেম্বর সন্ধ্যে ছ'টার আগেই তিনি আশ্রমে গেলেন। শ্রীমা ব্যস্ত রয়েছেন—১লা ও ২রা ডিসেম্বর আশ্রমের বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবের আয়োজনে। এই উৎসবও নির্বিঘ্নে শেষ হোলো। উৎসব শেষ হয়েছে শুনে তাঁর মুখে ফুটল তৃপ্তির হাসি। ৩রা ডিসেম্বর রোগের লক্ষণগুলো হঠাৎ যেন দুর্দমনীয় হয়ে উঠল। প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষায়, "তাঁর রোগের ইতিহাস অনুধাবন করলে একটা জিনিস চোখে পড়ে। 'সাবিত্রী'-র কাজ, দর্শন ও উৎসব এই তিনটি ঘটনার সঙ্গে ব্যাধির শেষ তিনটি নিম্নমুখী স্তরের নিকট সম্বন্ধ। শেষ স্তরে এসে পৃথিবীর প্রয়োজনের সঙ্গে তাঁর মরদেহের যে যোগসূত্র অবশিষ্ট

ছিল, তা ছিন্ন করে দিয়ে তিনি ডুব দিলেন গভীরে, শরীরের বিকল-যন্ত্রের প্রতি তিলমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে। ৪ঠা তারিখে সন্ধ্যাবেলা।···হঠাৎ তিনি সম্পূর্ণ বহিশ্চেতনায় ফিরে এলেন ; কারও কোনও আপত্তি না শুনে বিছানায়, পরে চেয়ারে ঘণ্টাখানেক বসলেন। আশ্চর্যের বিষয়, রোগের সমস্ত কষ্ট-লক্ষণ কোন্ যাদু-স্পর্শে অদৃশ্য হয়ে গেছে।"···এই সুবর্ণ সুযোগে তাঁকে তাঁর একান্ত সচিব ডাঃ নীরদবরণ জিজ্ঞাসা করলেন, "Are you not using your Spiritual Force? 'No!' সংক্ষেপে উত্তর দিলেন।···সাহস সঞ্চয় করে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'No? তাহলে এই দুরন্ত ব্যাধি কি করে সারবে?' উত্তরে দুটো কথা—'Can't explain; you won't understand.' ... এক ঘণ্টা পরে বিছানায় যখন ফিরে এলেন, দ্বিগুণ জোরে দেখা দিল সমস্ত পূর্বলক্ষণ; আর তিনিও শেষ নিমগ্ন হলেন অতলে।" রাত্রি ১২টা কেটে গেল: ৫ই ডিসেম্বর শুরু হলো—উষা তখনও অনাগত। "আস্তে আস্তে অবস্থা খারাপ হতে হতে সেই নিদারুণ ১-২৫ মিনিট উপস্থিত হলো নিয়তির বিধান নিয়ে।"

১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর উষাপূর্ব ১-২৫ মিনিটে বিজ্ঞানময় পুরুষের প্রারব্ধ কর্মের শেষে দেহ পরিবর্তনের নিয়তি-নির্দেশ ছিল। এর পর কি বিদেহ-কৈবল্য?* না। উনি বিশ্বের কল্যাণে স্বেচ্ছায় নির্বাণের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে নির্মাণমুক্তির পথ নিয়েছিলেন। প্রারব্ধ কর্মের শেষে, দেহত্যাগে **মনস্পতি*** শ্রীঅরবিন্দ সমস্ত বিষয়ে মুক্ত, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হলেন। ব্রহ্মসূত্র অনুযায়ী জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যতীত যাবতীয় ব্যাপারে তিনি কর্তৃত্ব লাভ করলেন। নশ্বর দেহের অস্তিত্ব রইল না কিন্তু তিনি রইলেন পূর্ণ-যোগের কাজ সম্পূর্ণ করবার জন্যে আমাদের মধ্যে—কায়ব্যূহ রচনা করে।

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

মনস্পতি শ্রী অরবিন্দ

"ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্তি এতান্ চ সত্যান্ কামান্
তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামাচারো ভবতি।"

—ছান্দোগ্য ৮।১।৬

১৯৫০ সালের ৬ই ডিসেম্বর। জনস্রোত প্রবাহে আশ্রম প্লাবিত। বিজ্ঞানময় পুরুষ যে দেহ পরিত্যাগ করে গেছেন সেই দেহে তখনো ছড়িয়ে রয়েছে অতিমানসের জ্যোতি। ডাক্তার প্রভাত সান্যালের ভাষায়, "বিজ্ঞানের কল্যাণে মৃত্যুর যে-সব লক্ষণ আয়ত্ত করেছিলোম, তার একটিও খুঁজে পেলাম না গুরুদেবের অঙ্গে, তিলমাত্র বিবর্ণ হয়নি কোথাও, সামান্যতম পচনের চিহ্নও চোখে পড়ল না: শ্রীমা চাপা গলায় বললেন 'As long as the supramental light does not pass away, the body will not show any signs of decomposition, and it may be a day or it may take many more days.।' আমিও অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় সেই আলো, মা,—যার কথা তুমি বলছ? আমার পক্ষে কি তা দর্শন করা অসম্ভব?' শ্রীঅরবিন্দের শয্যার পাশেই শ্রীমায়ের চরণতলে নতজানু হয়ে বসেছিলাম; হেসে মা অনন্ত করুণার সঙ্গে তাঁর হাতখানি আমার মাথায় রাখলেন। আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল—নীলাভ সোনালী জ্যোতির্মণ্ডিত গুরুদেবের সর্বাঙ্গ।"

৭ই ডিসেম্বর এলো—তখনও সেই পরিত্যক্ত দেবদেহে বিকৃতির লেশমাত্র দেখা যায়নি। এই দিন আদ্যাশক্তিরূপিণী মায়ের মুখ থেকে ভক্ত শিষ্যেরা শুনতে পেলে ভাবীকালের নির্দেশ: "ভগবান, আজ

প্রাতে তুমি আমায় বরাভয় দিয়েছ যে যতদিন তোমার কাজ অপূর্ণ থাকবে ততদিন তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে—শুধু নিয়ন্ত্রী চেতনার আশ্রয়ে নয়—আমাদের সকল গতির ছন্দে। তোমার বরাভয়ে অভ্রান্ত আশ্রয় পেয়েছি যে পৃথিবী দিব্যভাবে রূপায়িত না হওয়া পর্যন্ত তুমি ভূমণ্ডলেই থাকবে আমাদের সঙ্গে। আশীর্বাদ কর, তোমার কৃপায় আমরা যেন তোমার এই অপরূপ ব্যাপ্তির উপযুক্ত ধারক বাহক হিসাবে কায়মনোবাক্যে তোমার দিব্য-কর্ম উদ্‌যাপনে নিজেদের উৎসর্গ করতে পারি।" আরও একটা দিন কেটে গেল। ৮ই ডিসেম্বরে সেই অবিকৃত দেহত্যাগের মধ্যে দিব্যশক্তির কি লীলা প্রচ্ছন্ন রয়েছে? কেনই বা তিনি আত্মবিসর্জন দিলেন? এর উত্তর সেই দিনই শ্রীমা দিয়েছিলেন—"The lack of receptivity of the earth and men is mostly responsible for the decision Sri Aurobindo has taken regarding his body..." অসুর শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে স্থূল দেহের বাধা অনেক সুতরাং সূক্ষ্মদেহের আশ্রয়ে যুদ্ধ করা এক অনন্য দিব্য-কৌশল। সাধক কবি অমল কিরণ এই মহাপ্রয়াণের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন,... "শ্রীঅরবিন্দের দেহত্যাগ তাঁর নিজের কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে নয়। এ হলো বিবর্তমান পৃথ্বী-চেতনাতে এক মহাদুর্যোগ—ভগবানের দ্বারা আক্রান্ত অচেতনার বিশৃঙ্খল বিদ্রোহ অভিযান তাঁর নিজের উপরই তাঁকে নিতে হলো শেষে, জীবন সংশয়ের বিপদ স্বীকার করে মূত্রবিষাচ্ছন্ন মূর্চ্ছার ছলে, যাতে তাঁর কাজের গোপনে সাহায্য হয়— সে কাজ তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধির চেয়েও সর্বদাই যে তাঁর কাছে বড় ছিল।...এ কাজ ভবিষ্যতের অনুকূল নিয়তির অঙ্গ।" (৪১)।

৯ই ডিসেম্বর বিকাল ৫ টার সময় শ্রীমা অনুমতি দিলেন সেই পরিত্যক্ত দেবদেহকে সমাধিস্থ করবার। সমাধির জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা ছিল; "under the '*Service tree*' in the place where the giant maidenhair plants are arranged"। এক অনাড়ম্বর সমাবেশের মধ্যে কয়েকজন তাঁদের সংস্কারমুক্ত এবং নির্লিপ্ত মন নিয়ে

'রোজ উডে'-র আধারে সেই পরিত্যক্ত দেবদেহকে মহাসমাধিতে, অনন্ত-শয়ানে শায়িত করল। সমাধি ফলকে লেখা রইল শ্রীমার রচিত এক পবিত্র দেব বন্দনার মন্ত্রে ঃ

"হে সচ্চিদানন্দময়, অবতরণে তুমি আমাদের গুরুদবের অন্নময় দেহের কারণ স্বরূপ হয়েছো; হে সচ্চিদানন্দময়, তোমার কাছে আমরা চিরঋণী রইলাম। সেই সচ্চিদানন্দময়ের কাছে, যিনি আমাদের জন্য সব কিছুই করেছেন, সঙ্কল্প নিয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন, যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, অনেক আশা নিয়ে সব কিছু সহ্য করেছেন, সেই সচ্চিদানন্দময়ের কাছে আমাদের কল্যাণে এই সবই যাঁর ইচ্ছা, যাঁর প্রচেষ্টা, যাঁর নির্মাণ, যাঁর অভিষ্ট সিদ্ধি, সেই পরম পুরুষের কাছে আমরা আনত মস্তকে প্রার্থনা জানাচ্ছি—যেন কোনদিন আমরা তাঁকে বিস্মৃত না হই, এমন কি মুহূর্তের জন্যও নয়, হে তৎ-সৎ আমাদের সব কিছুর জন্যই তোমার কাছে আমরা ঋণী।"।

পণ্ডিচেরীর আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল সেই দিব্য বাণী যে বাণী শ্রীমা শুনেছিলেন ঃ "I have left this body purposely. I will not take it back. I shall manifest again in the first supramental body built in the supramental way."। (৪২)। মনস্পতি পুরুষ সম্পর্কে ব্রহ্মসূত্র এই কথাই বলেছেন।

অগণিত ভক্ত-শিষ্যের চোখের সামনে দিব্যশ্রী শোভিত হয়ে পরিস্ফুট হোলো গুরুদেবের লিখিত বাণী ;

"One day I will return, a bringer of the light,
Then I will give to thee, the mirror of God."

বিজ্ঞানময় পুরুষের লীলাসহচরদের হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হতে থাকল সেই অভয় বাণীঃ

"I am here, I am here."

শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে যাঁরা তাঁদের সত্তাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন দেব-সংঘের সেই ব্রতী পুরুষেরা পূর্ণ যোগের শেষ অঙ্কের জন্য কাজ

করে চল্লেন জগদ্ধাত্রী শক্তির নির্দেশে। যোগ ঐশ্বর্যের সব কিছুর উত্তরাধিকারিণী সব সময়েই সঙ্গে রয়েছেন গুরুর প্রতিমূর্তিরূপে সুতরাং তিনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন গুরুদেবের স্বপ্ন সম্ভবের শেষ অঙ্কে।

১৯৫১ সালের ২৪শে এপ্রিল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে শুরু হলো শ্রীঅরবিন্দ মেমোরিয়াল্ কন্ভেন্শনের দুদিন ব্যাপী অধিবেশন। উদ্‌বোধনী ভাষণে শ্রীমা প্রস্তাব করলেন—শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সংকল্প। তিনি বললেন, "শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন যে এই উপায়েই ভবিষ্যতের মানুষকে সুন্দরভাবে অতিমানসের জ্যোতি গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। যে জ্যোতির ধারায় মানুষ রূপান্তরিত হবে দিব্য-জীবনের আধার রূপে এবং সেই মানব-সংঘের সহায়তায় পৃথিবীতে প্রকাশ পাবে নতুন আলো, নতুন শক্তি, নতুন জীবন।" উপস্থিত সুধীজনের আন্তরিক সমর্থনে সভাপতি দ্বিতীয় দিনে তিনটি সংকল্প গ্রহণ করলেন এবং সমাপ্তি ভাষণে বললেন, "আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা করছি এই উদ্দেশ্যে যে এখানে মহত্তম আদর্শ অনুসারে শিক্ষিত হয়ে উঠবে নরনারী, অংশ নেবে তা নব মানবজাতি সৃষ্টির মহাব্রতে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সফল হতে পারে না যদি তেমন নরনারী আমরা না পাই, যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের আদর্শের উপর শুধু ভক্তিই রাখবেন না, তাকে কাজে ফলিয়ে ধরতেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবেন। এ রকম লোকবল আশ্রমেই রয়েছে—তাঁরা এই গুরু দায়িত্ব নিতে পারবেন। যে আদর্শের প্রতীক হয়ে উঠবে এই বিশ্ববিদ্যালয়, আশা করি তা উদ্‌বুদ্ধ করবে সমস্ত বিশ্বের নরনারীকে।...শ্রীমা যখন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তখন আমাদের মনে অনুমাত্র দ্বিধা নেই যে এই বিশ্ববিদ্যালয় দিনে দিনে বিস্তারলাভ করবে এবং শুধু ভারতের নয়, সমগ্র সভ্য জগতের এক গৌরবের সামগ্রী হয়ে উঠবে।...একদিন এখানে যে বাণী ধ্বনিত হবে তা সমগ্র জগৎকে শুনতেই হবে।...

শ্রীঅরবিন্দ দিয়ে গেছেন সেই বাণী। একদিন পৃথিবীর সকল লোক চলবে শ্রীঅরবিন্দের প্রদর্শিত এই পথে।" (৪৩)। ১৯৫২ সালের ৬ই জানুয়ারি শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রের দ্বারোদ্‌ঘাটন করলেন শ্রীমা। দিব্যযন্ত্রেরা কাজ করে চলেছেন দিব্য-নির্দেশে এবং দিব্য-উদ্দেশ্যে।

"ভগবান, পৃথিবীতে আমরা আছি তোমরই—রূপান্তরের—কর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে। তা-ই আমাদের একমাত্র সঙ্কল্প, আমাদের একমাত্র অভিনিবেশ। আমাদের প্রার্থনা—তা-ই যেন হয় আমাদের একমাত্র জীবনবৃত্তি, এবং যেন আমাদের সমস্ত কাজই আমাদের সহায় হয় এই লক্ষ্যের পথে।"—শ্রীমার বাণী পথ বেঁধে দিল।

১৯৫৩ সালে সাধক অম্বুভাই পুরাণী পরিব্রাজক প্রচারক হিসাবে পূর্ব এবং মধ্য আফ্রিকার দেশগুলিতে বহন করে নিয়ে গেলেন গুরুদেবের পূর্ণ যোগের বীজমন্ত্র; অভূতপূর্ব উদ্দীপনার মধ্যে সেই ভূখণ্ডের আকাশে, বাতাসে, জনগণের মনে ছড়িয়ে দিয়ে এলেন বীজ। ১৯৫৪ সালে সুদূর চীনের হংকং শহরে শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের পাঠ-চক্রে শ্রীমায়ের আশীর্বাণী সেখানকার প্রকৃতিতে দিব্য আলোর বিকিরণ ঘটালে: "Let the eternal Light dawn on the eastern horizon—Mother"। রোমের Italian Institute for the Middle and the Far East সংস্থার উদ্‌যোগে ১৯৪৪ সালে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও দর্শনের উপর আলোচনাচক্রে ভারতের অধ্যাত্মবাদ সেই মহাপুরুষের বাণী অবলম্বনে ইতালীয় সুধীজনের অন্তরে প্রবেশ করল। নিখিল বিমানে সর্বব্যাপী সূক্ষ্মদেহ, পণ্ডিচেরীতে জীবন্ত প্রতিমা, এবং তাঁদের সংকল্পে ধীরে ধীরে বিশ্বচরাচর এগিয়ে চলেছে প্রগতির পথে দিব্য-জীবনের সন্ধানে। অন্যতম বাহক হিসাবে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের Spalding Lecturer in Indian Philosophy and Religion দর্শনাচার্য আনন্দমোহন বসুর নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৫ সাল। শ্রীমা বাণী দিলেন: "No human will can finally prevail against the Divine's Will. Let us put ourselves

deliberately and exclusively on the side of the Divine, and the Victory is ultimately certain." ডারউইনের বিবর্তনবাদের ভাবে অনুপ্রাণিত বিজ্ঞানীদের মনে জীবন্ত প্রাতমার এই বৈপ্লবিক বাণী চিন্তার আলোড়ন এনে দিল। নতুন ধারার বিবর্তনবাদকে বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করলেনঃ সৃষ্টির মূলকথা হোলো সিসৃক্ষা—যার গতি নিয়ন্ত্রণ করছেন স্বয়ং বাসুদেব—স্থাবরে, জঙ্গমে, বিশ্বলীলায় নিজে আত্মগোপন করে থাকবেন বলে। সৃষ্টির মধ্যে বিভেদের দৃষ্টি এসেছে অজ্ঞানতার ফলে—দেখা দিয়েছে সৃষ্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রাম। জ্ঞানের অভাবে এই দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রাম প্রাণের সংহারের কারণ হয়ে ওঠে কিন্তু প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে এই দ্বন্দ্ব নানাত্বের অবসান ঘটিয়ে প্রাণকে সংধারণ করে দিব্যাশ্রয়ী করবার জন্যে; সংগ্রাম চলে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভময়কে জীবনে মূর্ত করবার জন্যে। এই সংগ্রামে জয়ী হয় দিব্যভাবে দীক্ষিত মানবজাতি। দিব্য-চেতনার জাগরণে যাঁরা এককে উপলব্ধি করেন, প্রাণের সংধারণে অমিত শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠেন তাঁরা—ব্রহ্মতেজে বলীয়ান হয়ে। বিধিলিপি বলে, এই ব্রহ্মতেজে বলীয়ান মানব সন্তানের দলই বাঁচবেন—শেষ পর্যন্ত। দিব্য-জীবনের আশ্রয় ব্যতীত প্রাণের সংরক্ষণ বা সংধারণ সম্ভব নয়। সুতরাং 'Survival of the fittest'-এর 'fittest' শব্দটি তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—যাঁরা দিব্য-কর্মের দক্ষতা নিয়ে দিব্য-জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে সংগ্রামে জয়ী হবেন সত্যের কারণে, সত্যযুগ প্রতিষ্ঠার জন্যে। কারণ নিয়তি লিখনে দিব্য-ঈক্ষাই জয়ী হবে, মানুষের ইচ্ছা নয়।

এই জয় আসবে নিঃশব্দে। ১৯৫৬ সালে প্রজ্ঞাবতী বাণী দিলেনঃ "The greatest victories are the least noisy. The manifestation of a new world is not proclaimed by beat of drum."। এই জন্য প্রয়োজন পৃথিবীতে প্রজ্ঞা-স্রোতের প্লাবন—অতিমানসের অবতরণ —যে প্লাবনে ধরণী শুভ্র হবে। এর জন্যই বিজ্ঞানময় পুরুষ দেহ পরিবর্তন করেছেন। এর জন্যই পণ্ডিচেরীতে জীবন্ত প্রতিমা

এখনও দিব্য-কর্মে রত। এর জন্যই আশ্রমের দেব-সংঘের ব্রতী পুরুষেরা নিঃশব্দে কর্মযোগে মগ্ন। যার জন্য চলেছে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানযজ্ঞ—বিশ্বের ভূখণ্ডে সেই যজ্ঞের যজ্ঞাশ্বের প্রতীক হিসাবে ছুটে চলেছেন ব্রতী পুরুষেরা, একের পর এক জ্ঞান পীঠস্থানে, উত্তোলন করছেন ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞানের বিজয় পতাকা।

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দের সংকল্পের রশ্মি বিশ্বের চিন্তা-নায়কদের মনে নতুন চিন্তাধারা সৃষ্টি করলে, যে চিন্তাধারার আদ্যে এবং অন্তে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কেউ উড়িয়ে দিয়ে গেছে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির বিজয় পতাকা।

বিশ্ব বিশ্রুত মনীষী জুলিয়ান হাক্সলের উপলব্ধিতে উপস্থিত হলো এক নতুন পৃথিবী—কল্পনাতীত শুভ সম্ভাবনায় ভরা—যেখানে নরে মূর্ত হবেন নারায়ণ। ধীমান কোয়েসলার উপলব্ধি করলেন এক অভিনব দিব্য-চেতনার উদ্ভব। দার্শনিক সার্ডিন তাঁর দূরদৃষ্টিতে বিবর্তনবাদের নব-বিশ্লেষিত রূপ দেখতে পেলেন—বিবর্তনের মূল লক্ষ্য ঊর্ধ্ব পথে সেই পরা-চেতনায় উত্তরণ। প্রথিতযশা লাকোমতে দু' ন্যুয়ে দেখতে পেলেন বিবর্তনের এক নতুন পর্যায়ের ঘোষণায় আগত এক নবীন ঊষার পদক্ষেপ। বেন ফিঙ্গার এবং পিটিরিম সোরোকিন প্রমুখ চিন্তানায়কদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠল বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম-বিদ্যানিষ্ঠ এক শান্ত সৌম্য মানবজাতি, সাম্যের জয়গানে মুখরিত ধরণী, বিশ্বময় সেই একের বিজয় পতাকা। বিশ্বব্যাপী দেখা যাচ্ছে পরিবর্তনের শুভ সূচনা। জ্যোতির্ময়ী প্রতিমা ভারতবর্ষের এক প্রান্তে নিঃশব্দে কাজ করে চলেছেন যেমনটি শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন সাবিত্রী মহাকাব্যে সাবিত্রীর উক্তির মাধ্যমে—"…আমি চুপ করে বসে নেই। দেবতাদের পৃথিবীতে আমি নামিয়ে আনছি, নিরাশার বুকে আশা এনে দিচ্ছি, উচ্চ-নীচে সকলকে সমানভাবে শান্তি দান করছি, মূর্খ ও জ্ঞানীর উপর সমভাবেই করুণা বিকিরণ করছি। পৃথিবী যদি উদ্ধার হতে চায় ত আমি তাকে উদ্ধার করব। তখন এই মর্ত্যধামেই প্রেম অক্ষত চরণে বিচরণ করবে, মানুষের মন

সত্যকেই সম্রাট বলে মেনে তার বিধানেই চলবে এবং 'শরীর বহিবে গুরুভার তুরীয়ের, অবতীর্ণ তার মাঝে যবে ভগবান'।"

১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি ধরণীর উপর অতিমানস অবতীর্ণ হলেন। এপ্রিল মাসে জ্যোতির্ময়ী প্রতিমা তাঁর বাণীতে বললেন, "এই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। যখন ধরণীর সব কিছুতে পরা-চেতনার ধারা বিকিরিত হয়েছে—যা ছিল স্বপ্ন তা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। এখন থেকে পৃথিবী এবং আমরা সবাই আর কখনই সেই পরা-চেতনার ধারা থেকে বিযুক্ত হব না—সব সময়েই যুক্ত থাকব। আমাদের মধ্যে সেই দিব্য-প্রভাব ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে উঠবে। আমরা ক্রমশঃ এগিয়ে যাব উত্তরণের পথে, দিব্য-জীবনের প্রতিষ্ঠায়। যে জীবনে থাকবে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ—থাকবে নিসর্গ-সুষমা, সত্য এবং আনন্দঘন চেতনা।"

১৯৫৮ সালে শ্রীমা বললেন, "বিশ্বের সর্বত্র অতিমানসের তেজে পবিত্র হয়েছে এবং অতিমানসের আধার হওয়ার উপযুক্ততা আসতে শুরু করেছে পৃথিবীতে—এক অভ্যুত্থানের মধ্যে মানুষের সীমিত মনোভূমিব্যাপী নতুন চেতনা জাগছে নতুন সৃষ্টিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে।" এই প্রসঙ্গে শ্রীমা বলেছিলেন যে এই (আধার) প্রস্তুতির একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়ের সূচনা হবে ১৯৬৭ সালে। ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীমার বাণীতে ঘোষিত হলো—"দিব্য-ক্ষণের মধ্যেই আমরা এখন এসে গেছি"—এই দিব্য-লগ্নেই তো গুরুদেবের কথামত দিব্য-জীবনে উত্তরণের কাজ ত্বরান্বিত হবে। গুরুদেবের লীলাসহচর নলিনীকান্ত গুপ্তর ভাষ্য অনুযায়ী ঃ "বিংশ শতাব্দীর এই পর্যায়েই পৃথিবীর মানুষ (অবশ্য সকলেই নয়) প্রথম অধিমানসের দিব্য-মঞ্চে অবস্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং অতিমানসের ধারা স্নানের যোগ্যতা অর্জন করেছে। বিবর্তনের চক্রে এ এক নতুন ঊষার সূচনা—যখন মানুষ উন্নীত হলো ঊর্ধ্বতর স্তরে। অধিমানসের দিব্য-মঞ্চে অবস্থানের সময় সেই মানুষ সর্বপ্রথম উপলব্ধি করতে পারল পরা-আকর্ষণের তীব্রতা। কারণ, সেই দিব্য-মঞ্চে অতিমানস

অবতীর্ণ হয়েছেন পৃথিবীর দিকে, সেই আকর্ষণ নিম্নাভিমুখী হয়ে প্রকৃতির লীলাকে অমৃতের স্পর্শ দিয়েছে। অতিরিন্দ্রিয়ের আবির্ভাব ইন্দ্রিয়ের অধিকারী মানুষকে প্রজ্ঞাবান করেছে। কোন এক অমোঘ এবং অদৃশ্য নির্দেশে একই সঙ্গে চলেছে: অতিমানসের অবতরণ, যার তীব্র আকর্ষণে প্রকৃতি উর্ধ্বমুখী হয়েছে, এবং সৃষ্টির লীলায় নিবর্তন এবং উত্তরণের প্রবণতা।" (৪৪)

চরৈবেতি। ১৯৬৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি নির্মাণমুক্তি-যজ্ঞের যুগোপযোগী বেদীর উদ্‌বোধন করলেন শ্রীমা—ইউনেস্কোর আন্তরিক সহযোগিতায় মূর্ত হোলো আগতপ্রায় দিব্য-জীবনের এক অভিনব প্রাণকেন্দ্র অরোভিল (AUROVILLE)। অরোভিল মহানগরী—নিসর্গ মাধুরী ভরা মর্ত্যের বৈকুণ্ঠলোক। এর উপর অধিকার থাকবে সমগ্র বিশ্বের দিব্য-জীবনের অভিযাত্রীদের। এর মধ্যে থাকবে সেই সব সম্পদ যা অতীতের ঐশ্বর্যে বর্তমানকে সমৃদ্ধ করবে ভাবী প্রগতির পথে এগিয়ে যাবার জন্যে, একান্তভাবে আর্য পন্থায়:

"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।"

১৯৬৯ সালের প্রথম দিনের প্রথম উষা আবির্ভূতা হলেন পরা-চেতনার ধারাস্নানে পবিত্র হয়ে। জগদ্ধাত্রী প্রতিমার তপঃ প্রভাবে ১লা জানুয়ারির উষার প্রাক্কালে অধিমানসের দিব্য-মঞ্চে অতিমানসের প্রভাব অধিষ্ঠিত হোলো। শ্রীমা বলেছেন এই অধিষ্ঠান ক্ষণস্থায়ী নয়—"but it is established there and is fully operating"

বিংশ শতাব্দীর বর্তমান দশকে পরা-চেতনা এমনি এক স্তরে নেমে এসেছে যেখানে গুরু বল থাকলে মানুষী চেতনা উঠতে পারে। তাই ১৯৭০ সালের নববর্ষের বাণীতে শ্রীমা বললেন: "The world is preparing for a big change, will you help?"—হে বিশ্ববাসী, অমৃতের পুত্রগণ তোমরা সহায়ক হও, প্রতিবন্ধক হয়ো না। তিনি যেন বললেন, তোমরা অন্তরে আকুতি ফুটিয়ে তোলো—"তত্র মাম্ অমৃতম্ কৃধি"—তা না হলে তোমরা সেই বিরাট পরিবর্তনকে সম্ভব

করে তোলার কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে কি করে। দিব্য-জীবনকে পৃথিবীতে মূর্ত করবার অদৃশ্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিজ্ঞানময় পুরুষ যে অনাগত ঊষাকে বন্দনা করে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গেছলেন—"ঊষা আসবে"—সেই ঊষা এসেছে। এই সময়েই "অহংশূন্য" দল বা সংঘ দিব্য-জীবনের প্রতিষ্ঠায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে—বলে গেছেন দিব্য জীবনের দিশারী শ্রীঅরবিন্দ। বিশ্বজনের সামনে আসছে শ্রীমার যুগোপযোগী বাণী ঃ "Divine Power alone can help India. If you can build faith and cohesion in the country it is much more powerful than any man-made power." এই নতুন ঋক্ মন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হয়েছে সেই অতীত ঋক্ মন্ত্রের পবিত্র সুর ঃ "সমানী বা আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ যথা বঃ সুসহাসতি ॥" বিশ্বমুক্তিযজ্ঞের যজ্ঞমণ্ডপে যাঁরা বিশ্বকল্যাণের ব্রত নিয়ে নিষ্কামচিত্তে সমবেত হবেন তাঁদের সমধর্মী মনে হৃদয়ে একই আকুতি ভরে থাকবে। তবেই তাঁরা সুসংবদ্ধ হতে পারবেন—অভীষ্ট সিদ্ধির কারণে।

অনেকের দলে কিছু ভাগ্যবানের মধ্যে দিব্য-জীবনের স্পন্দন অনুভব করে দিব্য-হর্ষে স্থিতাবস্থায় ১৯৭১ সালের আশীর্বাণীতে শ্রীমা বললেন ঃ "Blessed are those who take a leap towards the Future."। Future কথা ব্যবহার করে এখানে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন 'Future'-এর বা সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত দিব্য-জীবনের বিধিলিপি নির্দেশিত ভবিতব্যের।

আজ বিশ্ববাসীর মনে ঝঙ্কৃত হোক মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দের গায়ত্রীমন্ত্র ঃ "তৎ সবিতুর্বরং রূপ জ্যোতিঃ পরস্য ধীমহি। যন্নঃ সত্যেন দীপ্যয়েৎ ॥"

আজ বিশ্বের দিকে দিগন্তে ধ্বনিত হোক সেই প্রার্থনার বাণী যা শ্রীমা জানিয়েছেন মনস্পতির আবির্ভাব শতবর্ষ পূর্তির প্রাক্কালে ঃ "হে পরম পিতা, সনাতন সত্য, আমরা যেন একমাত্র তোমারই

আজ্ঞাধীন হই এবং আমাদের জীবন যেন সত্যাশ্রয়ী হয়ে থাকে।" (৪৫)।

মা বলেছেন ঃ

> "শ্রীঅরবিন্দ অতীতের সম্পদ নন্—তিনি কালজয়ী পুরুষ। শ্রীঅরবিন্দ উত্তরণের পথে চলমান এক আশ্চর্য প্রগতি। আমাদের প্রগতির কারণে আমরা সেই অক্ষয় যৌবনের আশ্রয় গ্রহণ করবো যাতে আমরা সমান তালে চলতে পারি, পথ চলায় পিছিয়ে না পড়ি।" (৪৫)।

মা-র আশীর্বাদে দিব্য-অভিযানে এগিয়ে যাবার পরিবেশ, প্রস্তুতি, এবং শক্তি বিশ্ববাসী পাচ্ছে—তারা এগিয়ে চলেছে এবং চলবেও। তারা চলবে ততদিন, যতদিন না মনস্পতির মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

চরৈবেতি॥ চরৈবেতি॥ চরৈবেতি॥

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ
পূর্ণং ভবতু তৎসর্বং তৎ প্রসাদাৎ মনস্পতি।

পরিশিষ্ট

অলাত চক্র : চক্রাকার অগ্নি ; জ্বলন্ত শলাকা সজোরে চক্রাকারে ঘোরাতে থাকলে যে অগ্নিময় চক্র সৃষ্টি হয় সেই চক্র।

আজানদেব : বৃহদারণ্যকের মতে দেবত্ব-লাভ কর্মের দ্বারা যেমন সম্ভব, তেমনি জন্মসিদ্ধ দেবত্ব-লাভও স্বীকৃত। যাঁরা কর্মদ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন তাঁরা কর্মদেব ; আর যাঁরা জন্মসিদ্ধ দেবতা, তাঁরা আজানদেব।

জীবন্মুক্তি : কঠোপনিষদের ২।৩।১০-১১ সূত্র অনুযায়ী "যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি নিশ্চল হবে, সেই অপ্রমত্ত অবস্থায় যোগী পরমা-গতি প্রাপ্ত হন।" এই অবস্থায় মুণ্ডকোপনিষদের ২।২।৪ সূত্র অনুযায়ী অপ্রমত্ত যোগী ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য ভেদ করতে সমর্থ হন। এই লক্ষ্য ভেদে তিনি স্বীয় আত্মারূপ শরদ্বারা ব্রহ্ম লক্ষ্য ভেদ করেন। এই সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন : "সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ"। এই অবস্থাকে সমাধি আখ্যা দেওয়া হয়। এই 'যুক্ত সমাধি'তে জীব নিজের শুদ্ধ-বুদ্ধি-স্বরূপ উপলব্ধি করেন এবং তিনি পাশমুক্ত হয়ে মোক্ষ লাভ করেন। বৃহদারণ্যকের ৪।৪।৭ শ্লোক অনুযায়ী ইহলোকে ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারা এই মুক্তি লাভের পারি-ভাষিক নাম "জীবন্মুক্তি"।

যিনি ব্রহ্মকে বিজ্ঞাত হয়ে জীবন্মুক্ত হয়েছেন তিনিই **বিজ্ঞানময় পুরুষ**।

ডুমা (Duma) : রুশীয় পার্লিয়ামেণ্ট ১৯০৬-১৭। জার শাসিত রাশিয়ার প্রধান আইন পরিষদ্।

প্রবৃত্ত কর্ম : মনুস্মৃতি (২৩।৮৯) দুই প্রকার কর্মের উল্লেখ করেছেন—আসক্ত বুদ্ধিতে কৃত কর্ম বা প্রবৃত্ত কর্ম এবং আসক্তি ব্যতীত নিষ্কাম কর্ম বা নিবৃত্ত কর্ম। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নিজের বুদ্ধিকে নির্বিষয়, শান্ত, সর্বভূতে নির্বৈর ও সম রেখে এক অনন্যপূর্ব নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেশ, কাল ও অবস্থা অনুসারে কর্তব্য পালনের উপদেশ দেন। নিজের নিষ্কাম কর্তব্যাচরণ দ্বারা আদর্শের সৃষ্টি করে যথাসম্ভব শান্তভাবে অথচ উৎসাহ সহকারে সকলকে উন্নতির পথে আনেন। স্বয়ং ভগবান অবতাররূপে পৃথিবীতে এসে এই কাজই করে থাকেন। —এই কাজ নিবৃত্ত কর্ম। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্বে যাবতীয় কর্মকে প্রবৃত্ত কর্ম বলা যায়।

বিজ্ঞানময় পুরুষ : (জীবন্মুক্তি দ্রষ্টব্য)।

বিদেহ-কৈবল্য : যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী বা জীবন্মুক্ত তিনি নির্মাণমুক্তির পথে না গিয়ে যদি নির্বাণমুক্তির পথকে বেছে নেন—তাহলে দেহপাতের পর তিনি বিদেহ-কৈবল্য লাভ করেন। সেই অবস্থায় বিজ্ঞানময় আত্মা সেই অব্যয় পরমাত্মায় একীভূত হন (Unity নয়, Identity)। নদী যেমন স্বীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সমুদ্রে মিশে যায়, ঠিক সেই রকম জীবন্মুক্ত নামরূপ থেকে বিমুক্ত হয়ে সেই দিব্য পরমপুরুষে একীভূত হন। এই অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞানী অকল্ক (অকলঙ্ক) অমৃত হন।

বি-প্লু-ব : বিপরীতমুখী গতি। বি (বিপরীতমুখী), প্লু (গমন করা, দূর হইতে আগত আহ্বানের উদ্দেশ্যে), অ (অল্-ভাবে)।

ব্রহ্মসাযুজ্য : প্রণালীশুদ্ধ সাধনা দ্বারা, জীবের মধ্যে অব্যক্ত সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব সুব্যক্ত করতে পারলে জীব বলতে পারবে, 'সোঽহং', 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং'। তখন সে যজুর্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে বলতে পারবে—"যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহম্ অস্মি"। এই অবস্থায় জীব শিব হয়, একেই বলা হয় ব্রহ্মসাযুজ্য।

মনস্পতি : (স্বারাজ্য-সিদ্ধি দ্রষ্টব্য)।

লোকসংগ্রহ : "লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি।" (গীতা ৩।২০)। মানুষকে অসৎ পথ থেকে নিবৃত্ত করা এবং সৎ পথে বা স্বধর্মে প্রবৃত্ত করাই লোকসংগ্রহ। লোকসংগ্রহের অধিকার একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। কর্মযোগের সমর্থনে অর্জুনকে বাসুদেবের এইটাই শেষ কথা। লোকসংগ্রহের অর্থ মানুষদের এক জায়গায় জমা করা নয়। তাদের একত্র করা, সমবেতভাবে কাজ করতে শেখান, নিষ্কাম কর্মের দীক্ষা দেওয়া এবং তাদের সাধারণ বিবর্তনের সীমা অতিক্রম করে অতিমানসের সঙ্গে সংযুক্ত হতে সাহায্য করা।

শঙ্করভাষ্যে লোকসংগ্রহের অর্থ ভগবানের সৃষ্ট সমস্ত লোক—অর্থাৎ ভূলোক, পিতৃলোক, দেবলোক প্রভৃতি—এই সমস্ত লোকেরও কল্যাণের কথা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে চিন্তা করতে হবে। সংক্ষেপে, সমস্ত জগতের সংধারণে ভগবানের যে অধিকার নির্মাণমুক্তিকামী জীবন্মুক্ত স্বীয় তপোবলে সেই অধিকার অর্জন করেন।

সংধারণ : সৃষ্টির সংধারণের উদ্দেশ্যেই ধর্ম—যার উৎপত্তি ধৃ ধাতু থেকে। এই প্রসঙ্গে মহাভারতে শান্তিপর্বে উক্ত আছে—

"সর্বেষাম্ যঃ সুহৃন্নিত্যম্ সর্বেষাম চ হিতে রতাঃ
কর্মনা মনসা বাচা স ধর্মং বেদ জাজলে।"—শান্তি, ২৬১।৯

সম্ভোগকায় : (স্বারাজ্য-সিদ্ধি দ্রষ্টব্য)।

স্বারাজ্য-সিদ্ধি : জীবন্মুক্ত পুরুষ নির্বাণের পথে না গিয়ে বিশ্বের হিতের জন্য নির্মাণের পথ অবলম্বন করেন, এবং ক্রমশঃ সাধারণ বিবর্তনের পরিধি অতিক্রম করে' অসাধারণ বিবর্তনের তুঙ্গ ভূমিতে আরোহণ করেন—এই অবস্থায় তিনি স্বরাট্ হন, বিরাট্ হন, অতিরাট্ হন। এই স্বরাটত্ব লাভই স্বারাজ্য-সিদ্ধি। বৌদ্ধেরা এই অবস্থা প্রাপ্তিকে বলেন '**সম্ভোগকায়**'। যিনি সম্ভোগকায়ী তিনি স্বরাট্। তিনি ইচ্ছাগতি প্রাপ্ত হন, এবং দেবতারা তাঁর সঙ্কল্প অনুযায়ী উপকরণ সংগ্রহ করে দেন। তিনি ইচ্ছামত অন্য দেহ অবলম্বনে পৃথিবীতে অবস্থান করতে পারেন অথবা সূক্ষ্ম দেহে নিজ কার্য সমাধা করতে পারেন। তিনি সর্বত্রই রাজত্ব করতে পারেন। তিনি সব বিষয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন।

শ্রীঅরবিন্দের '**স্বরাজ**' বা '**পূর্ণস্বরাজ**'-এর কল্পনায় এই গুহ্য ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল—যার মধ্যে রাজনৈতিক সর্বস্বতা আনলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। শ্রীঅরবিন্দের আর্যধর্ম-বিজ্ঞানের আলোয় '**স্বরাজ**' ও '**পূর্ণ স্বরাজ**'-কে উপলব্ধি করতে হবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষায়—"আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসঃ পতিম্"। যিনি স্বরাট্, তিনিই '**মনস্পতি**'।

গ্রন্থ-পঞ্জী

(সংক্ষেপিত)

উৎস গ্রন্থের নাম।	উক্ত গ্রন্থ হইতে যে সকল উদ্ধৃতি গৃহীত উহাদের নির্দেশাঙ্ক
শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলা রচনাবলী, ২য় খণ্ড,— (শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, পণ্ডিচেরী)	২, ৩, ৫, ৯-১৭, ২১, ৩০, ৩১
শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্তিকা (অগস্ট ১৯৫১)—	৪৩
গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র : অবিস্মরণীয়—	৩৫
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : তিলকের কর্মযোগ শাস্ত্র (বঙ্গানুবাদ)—	৩৩
দীনেন্দ্রকুমার রায় : শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গ—	৪
শ্রীনলিনী কিশোর গুহ : বাংলায় বিপ্লববাদ—	৬
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় : সম্পাদিত গল্পভারতী (শ্রীঅরবিন্দ সংখ্যা) ১৯৫০—	৪০
পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : সমসাময়িকের চোখে শ্রীঅরবিন্দ (জিজ্ঞাসা, কলিকাতা)—	১৯
মণিবিষ্ণু চৌধুরী : শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী উপাখ্যান—	৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)	৭
ঐ প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৫	৩২
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী : স্মৃতি কথা—	২২
Amrita Bazar Patrika, 20th August 1947 (বঙ্গানুবাদ)	৩৮
Arya, Vol. II	২৯
Sri Aurobindo : Life Divine (Sri Aurobindo Ashram, Pondichary)	১, ২৩ ২৫
Sri Aurobindo : The Yoga and Its objects (Arya Publishing House)	২৬
Sri Aurobindo's Action (Special Issue 15th August, 1971)	৪৫
Babu B. K. Bose : The Alipore Bomb Trial	১৮
Prof. J C. Ghosh : Life and Work of Sri Aurobindo (Samabaya Press, Calcutta)	২০

নামসূচী

॥ সুকুমার বসু ॥

উত্তর কলিকাতার (বাগবাজার) বসু পরিবারে ১৯৩১ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি শ্রীযুক্ত বসুর জন্ম। মনোবিজ্ঞানের উপর গবেষণা কার্যের জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগে অন্যতম অধ্যাপকরূপে কর্মরত। শ্রীযুক্ত বসু ১৯৫০ সালে শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ লাভ করেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ফলিত যোগ' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুধী সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে। দৈনিক লোক-সেবক পত্রিকার 'স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান' বিভাগটি কিছুদিন শ্রীযুক্ত বসু পরিচালনা করেন। আনন্দবাজার পত্রিকার 'কৃষি, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান' বিভাগেও তাঁর একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত Your Health মাসিক পত্রিকায় ১৯৫৪-৫৮ সাল পর্যন্ত নিয়মিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। অমৃতবাজার পত্রিকা এবং অমৃত (সাপ্তাহিক) পত্রিকায় সাম্প্রতিক কালে তাঁর কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। মনোবিজ্ঞান বিষয়ক ভারতের বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকায় তিনি তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধগুলি প্রকাশ করে থাকেন।

॥ সুহৃদ্‌গোপাল দত্ত ॥

চব্বিশ পরগণা জেলার মজিলপুর গ্রামের দত্ত বংশের সন্তান শ্রীযুক্ত দত্ত মাতুলালয়ে (২, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩) ১৯১৭ সালের ২১শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে অসহযোগ আন্দোলনে কারাবরণ করেন। পরে স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সম্পাদকরূপে নেতাজীর সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁরই আহ্বানে কংগ্রেসে যোগ দেন। এই সময়ে তিনি চব্বিশ পরগণা জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সহ-সভাপতি এবং আলিপুর মহকুমার ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সালে শ্রীযুক্ত দত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ইউনিয়নের সাধারণ

সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে এ্যাড্ভোকেটশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শ্রীযুক্ত দত্ত কলিকাতা হাইকোর্টে আইনজ্ঞ হিসাবে যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে রাজ্যসভার আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৫৮ সালে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে সমাজ ও সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করেন। এঁর লেখা 'Fight for the Cause of Truth' এবং 'অখণ্ড ভারত' ১৯৬৬ সাল থেকে শ্রীঅরবিন্দের বাণীর গূঢ় ইঙ্গিতকে জনসাধারণের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। বর্তমানে শ্রীযুক্ত দত্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক এবং বহু সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক।

●

MANASPATI SRI AUROBINDO

By

SUKUMAR BASU - SUHRIDGOPAL DUTTA

Rs. 12·00

অভিমত ঃ

'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত "মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ" রচনাটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। লেখাটি শুধু চিত্তাকর্ষক হয়েছে তাই নয়, এতে অনেক নতুন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। পূর্বে অনেক খবর টুকরো টুকরো ছড়ানো ছিল; সেগুলি এই রচনায় গ্রথিত হওয়ায় পাঠকগণ একটি সুলিখিত বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন।

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত
উপাচার্য, বিশ্বভারতী,
শান্তিনিকেতন।

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ
সুকুমার বসু
ও
সুহৃদ্‌গোপাল দত্ত
রূপা
দাম ঃ বারো টাকা

